জান্নাতুন নাঈম প্রীতি

নালন্দা

অনলাইনে অর্ডার করতে
http://nalonda.com.bd

কলকাতায় পরিবেশক
বইবাংলা
স্টল ১৭, ব্লক ২, সূর্য সেন স্ট্রিট
কলেজ স্কোয়ার দক্ষিণ, কলকাতা ৭০০০১২
ফোন : +৯১৭৯০৮০৭১৭৬৫ (কলকাতা)

জন্ম ও যোনির ইতিহাস	জান্নাতুন নাঈম প্রীতি
প্রকাশক	রেদওয়ানুর রহমান জুয়েল নালন্দা ৩৮/৪ বাংলাবাজার (মান্নান মার্কেট) তৃতীয় তলা, ঢাকা ১১০০
স্বত্ব	লেখক
প্রচ্ছদ	জান্নাতুন নাঈম প্রীতি
প্রথম প্রকাশ	ফেব্রুয়ারি ২০২৩
মুদ্রণ	শামীম প্রিন্টিং প্রেস
বর্ণবিন্যাস	নালন্দা কম্পিউটার বিভাগ
মূল্য	৫০০.০০ টাকা
যুক্তরাষ্ট্র পরিবেশক	মুক্তধারা জ্যাকসন হাইট নিউ ইয়র্ক

©	Jannatun Nayeem Prity
Jonmo O Jonir Itihas	
(A Biography By)	Jannatun Nayeem Prity
Cover Design	Jannatun Nayeem Prity
First Pubished	February 2023
Publisher	Redwanur Rahman Jewel Nalonda 38/4 Banglabazar (Mannan Market) 2nd Floor, Dhaka 1100
Price	500.00 Tk only
ISBN	978-984-96992-9-3
E-mail	nalonda71 @gmail.com

উৎসর্গ

সত্য কথা লেখা, বলা ও প্রকাশ করার দায়ে অভিযুক্ত প্রতিটি মানবাধিকার কর্মীকে, যারা না থাকলে মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ে নতুন করে ভাবা হতো না আমাদের। যারা না থাকলে দুনিয়ার কারাগারগুলো জানতেই পারত না মত প্রকাশের অপরাধে একজন মানুষ হত্যাকারী আর একজন নিরীহ লেখক একই জায়গায় থাকার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে!

এবং

সব ধর্মের ঈশ্বরকে— যারা কেবল আমাদের যোনির ওপর খবরদারি করতে জন্মেছিলেন!

I conquer the world with words,
Conquer the mother tongue,
Verbs, nouns, syntax.
I sweep away the beginning of things
And with a new language
That has the music of water the message of fire
I light the coming age
And stop time in your eyes
And wipe away the line
That separates
Time from this single moment

–Nizar Qabbani (Syrian poet, who died in exile)

ভূ মি কা

আমি এই পুরো বইটি লিখেছি একজন ভাসমান মানুষকে মনে রেখে। মানুষটির নাম জান্নাতুন নাঈম প্রীতি। মানুষটির সবচেয়ে বড় অপরাধ এই যে– সে তার সমাজে চলতে থাকা নানা অপরাধ আর অন্যায়ের কথা সবাইকে জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। এই অপরাধে তাকে এই পুরো বইটাই লিখতে হয়েছে নির্বাসনে নিজের দেশ থেকে হাজার মাইল দূরে অন্য মহাদেশে বসে যেখানে নিজের দেশের সরকার বা মৌলবাদী তার নাগাল পাবে না!

আবার সে নিজেও নাগাল পাবে না তার সমাজের, যেখানে তার একদিন অনেক কিছু ছিল। এমনকি সেখানে হয়তো আছে তার না থাকাটুকুও!

আর এই অদ্ভুত টানাটানির সম্পর্কের একটা দলিল এই বই। দেশে থাকলে সম্ভবত এই বইই তার জীবনের শেষ বই হতো। কারণ এটা লেখার পর হয় তাকে হয়তো সরকারের প্ররোচনায় জীবন্ত কুপিয়ে মারা হতো, কিংবা মধ্যরাতে বাসা থেকে সাদা পোশাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হতো কোনো নাম না জানা বধ্যভূমি বা টর্চার সেলে অথবা সবচেয়ে সম্মানজনক হতো জেলে নিয়ে গিয়ে শরীরের স্পর্শকাতর জায়গাগুলোতে ইলেকট্রিক শক দেওয়া অথবা পুলিশের দ্বারা ধর্ষণ!

এই বই লেখা শেষে তাই আমি কৃতজ্ঞ তাদের প্রতি– যারা আমাকে নির্ভয়ে লেখার সাহসটুকু দিয়েছেন, পাশে দাঁড়িয়েছেন, বাংলাদেশ নামক জেলখানা থেকে উদ্ধার করে আমাকে নতুন এক পৃথিবীর সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। যেখানে আমার পরিচয়, মত প্রকাশের স্বাধীনতার পক্ষে লেখালেখি করা একজন লেখক হিসেবে। যে নাম না জানা ভূখণ্ডে আমার কাঁধে হাত রাখার এত বন্ধু জুটে গেছে কাজের সুবাদেই!

বিশেষ ধন্যবাদ বিবলিওসিটির ডিরেক্টর স্টেফানিকে। আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না, কিন্তু মাঝে মাঝে যেসব কারণে বিশ্বাস করার সাধ হয়, সেসবের একটা অন্যতম উপলক্ষ্য সে। প্রিয় স্টেফানি, জেনে রাখো– প্যারিস আমাকে অকাতরে যেসব চমৎকার মানুষের সাথে পরিচয় করিয়ে

দিয়েছে, তুমি তাদের একজন। আমি জানি তুমি এইটুকু অংশ পড়েই একটা মিষ্টি হাসি দেবে। এই হাসির দাম আমার কাছে বাংলাদেশকে এক ঝলক দেখার আকুতির মতো!

বিশেষ কৃতজ্ঞতা আমার সবসময়ের সহযাত্রীকে। সে না থাকলে আমি পুরুষদের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলতাম অনেক আগেই। যতদিন সে আমাকে এমন অকৃপণভাবে ভালোবাসবে, সবসময় বিপদের বন্ধুর এত পাশে থাকবে, ততদিন এই কৃতজ্ঞতা লিখে বোঝানো যাবে না।

কৃতজ্ঞতা আমাকে নতুন জীবন দেওয়া আইকর্ন সেক্রেটারিয়েটের প্রতিটি সদস্য– ম্যারিয়ান, এলিজাবেথ ডেইভিক, হেলজ লন্ড আর প্যারিস নামের শহরটির সাথে আমার প্রথম যোগাযোগ– ম্যাগুলন, ইসাবেল সহ প্যারিসের মেয়র এন হিডেল্গো, ডেপুটি মেয়র জ লুক রোমেরো মিশেলকে, যারা এই শহরের পক্ষ থেকে আমাকে নিরাপদে লেখালিখি করার ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

আমার রেসিডেন্সি প্রোগ্রাম সিটি ইন্টারন্যাশনাল দেজ আর্টের ডিরেক্টর বেনেডিক্ট এলিয়ট, তুমি যতই মুখ গম্ভীর করে রাখো, আমি জানি তুমি আমাকে অনেক পছন্দ করো!

অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফিসের লরা, ভেরোনিক, ভিনসেন্ট, নাতাশা, এলিক্স, ম্যাথিউ আর আন্দ্রেই– আমি জানি এই অসমান্য থাকার জায়গাটা আমাকে ছেড়ে যেতে হবে, কিন্তু তোমাদের হৃদয় থেকে সরানো যাবে না।

আমার প্যালেস্টাইনের বন্ধু তাকি, ইমরানি, ক্রোয়েশিয়ার মিষ্টি মেয়ে নিভেস, মেসিডোনিয়ার ভিভেকা, জার্মানির নিনা, ইস্তাম্বুলের দিদেম, ইরান, ইরাক, আফগানিস্তানের ফাতিমাসহ দুনিয়ার সব প্রান্তের যে অসংখ্য বন্ধুর দেখা আমি এই বই লেখাকালে পেয়েছি তা ভুলবার নয়। ভোলার না– সারা দুনিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রগুলো এড়িয়েও এমন এক চমৎকার জায়গায় জমায়েত হয়ে বলা 'ভিভে লা লিবার্তে ডি এক্সপ্রেশন!'

বাংলাদেশে থাকা উৎস, জুবায়ের কিংবা অবনী– জেনো তোমাদেরও কখনো ভুলিনা আমি।

ভুলি না বাংলাদেশের একুশে বইমেলায় যারা অনেক দূর থেকে কষ্ট করে আসতেন আমার হাত থেকে অটোগ্রাফ পাওয়া, সামান্য কিছু বাক্য বিনিময় কিংবা একটা ছবি তোলার জন্য!

আর হ্যাঁ, এইসব প্রেরণাই আমাকে সেই প্রেরণা দেয় যার কারণে আমি বারবার বলতে চাই– বাক্‌স্বাধীনতার জয় হোক, সব যুদ্ধ থেমে গিয়ে প্রতিটি দেশের সীমান্তে ফুল ফুটুক। তারা আকাশের দিকে মাথা উঁচু করে মানবসভ্যতার দিকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে দ্বিখণ্ডিত পৃথিবীর অখণ্ডিত আকাশের দিকে তাকিয়ে বারবার বলুক– আকাশের কোথাও কাঁটাতার নেই, বাক্‌স্বাধীনতা মূলত আকাশের উদার জমিনে 'স্বাধীনতা' লেখার এতই গভিড় আনন্দের!

বলতে শিখুক— বাক্স্বাধীনতা এমন এক স্বাধীনতা, যেটা না থাকলে স্বাধীনতার কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

জান্নাতুন নাঈম প্রীতি

১৬ ডিসেম্বর ২০২২
দোতলার রিডিং রুম
শেক্সপিয়ার অ্যান্ড কোম্পানি
প্যারিস

লেখকের কথা

এটা হতে পারত একজন সাধারণ মানুষের ডায়েরি, এমন এক ডায়েরি যেখানে মানুষটি নিজের মতো নিজের জীবন কাটাতে পারে, নিজের মতো করে ভালোবাসতে পারে, কথা বলতে পারে স্বাধীনভাবে।

এমনকি এটা হতে পারত একটা রূপকথা, যেখানে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর শহরটিতে (বেশিরভাগ লেখক আর শিল্পীদের ভাষায়) এসে পৃথিবীর অন্য এক দেশের অন্য এক ভাষার লেখক আবিষ্কার করতে পারত। নিজেকে ল্যুভর মিউজিয়ামের মর্মর মূর্তিগুলোর মতো, দুষতে পারত। কেমন করে আমাদের অখণ্ড ভারতবর্ষ থেকে আনা জিনিসপত্র এইসব বড় জাদুঘরে হাজার বছর পরে বিরাজ করছে, সাম্রাজ্যবাদের পালে হাওয়া দিতে গিয়ে। আগের শতাব্দীতে আমার সবচেয়ে প্রিয় লেখক আর্নেস্ট হেমিংওয়ের মতো করে বলতে পারত– প্রত্যেক শিল্পীরই দুটি দেশ, একটি তার জন্মস্থান, অন্যটি প্যারিস!

কিন্তু এটি তা নয়। এটা এমন এক জীবনের ইতিহাস যে জীবনের জন্য লড়তে হয়, যে জীবনের জন্য ছেড়ে আসতে হয়, যে জীবনের জন্য মাশুল দিতে হয় প্রতি পদে। কারণ যে মানুষটির কথা আমি বলছি সেই মানুষটির আরেকটি পরিচয় সে নারী। প্রকৃতির দেওয়া এই নারীত্বে তার ভূমিকা নেই, কিন্তু কেবলমাত্র নারী হওয়ায় প্রতিটি পদে পদে ভূমিকা আছে যুদ্ধ করার। এই যুদ্ধগুলোর জন্ম ঠিক তখনই হয়েছে যখন সেই মানুষটি কেবল 'সে' হয়ে উঠতে চেয়েছে!

সে অন্যদের কারও মতো হতে চায়নি, চেয়েছে কেবল নিজের মতো হতে! কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যেকোনো সমাজেই অন্যের মতো হয়ে জীবন কাটিয়ে দেওয়া সহজ আর নিজের মতো করে জীবন কাটানো কঠিন! অবশ্য কঠিনকে ভালোবাসা যায়, যদি তাতে সততা থাকে।

আর নিজের মতো হয়ে ওঠার সেই লড়াইয়ে দাঁড়িয়েও তাই মাঝেমধ্যে মনে হয়, আমি এসেছি মূলত তিনটা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে। প্রথম যুদ্ধটা একজন নারীবাদী নারী হিসেবে একটা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সাথে, দ্বিতীয় যুদ্ধটা একজন নাস্তিক হিসেবে এর আগামাথা না বোঝা একটা সমাজ আর রাষ্ট্রের সাথে, সর্বশেষ যুদ্ধটা একটা দুর্নীতিবাজ অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা যেমন করে তিলে তিলে ধ্বংস করে সবকিছুকে– তার সাথে।

ছাব্বিশ বছর বয়সে পৃথিবীর যে রূপ আমি দেখেছি, সেই রূপ আমাকে বুঝতে শিখিয়েছে– ন্যায়ের পক্ষে লেখালিখি করা একজন লেখকের আসলে কোনো দেশ নেই। শুধুমাত্র একটা ফেসবুক পোস্টের জন্য আমাকে প্রাণের ভয়ে আত্মগোপনে থাকতে হয়েছে চার মাস, আদালতে দাঁড়িয়ে শুনতে হয়েছে– আমি কেন লিখলাম? কেন আমি দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করলাম?

অথচ আমি সাজানো নাটকের মতো সেই আদালতকে জিজ্ঞেস করার সুযোগ পাইনি– একটা দেশ কি কখনো তার একজন লেখককে লেখার জন্য আদালতে দাঁড় করাতে পারে?

কিংবা সরকারি দলের লোকেরা, তারা কখনো দেশপ্রেমের ধুনো তুলে রাষ্ট্রবিরোধী আখ্যা দিয়ে জনসম্মুখে আমাকে ধর্ষণ করার, আমার যোনি ধারালো ব্লেড দিয়ে কুচিকুচি করে ফেলতে চাওয়ার আকুতি জানাতে পারে?

আমার আরেক যুদ্ধ মৌলবাদের সাথে। মূলত ধর্মের নামে চলা হত্যাকাণ্ড আর মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে। যে মৌলবাদ শুধুমাত্র ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে লেখার জন্য জঙ্গিদের মন্ত্রণা দেয় একে একে মুক্তচিন্তার মানুষদের খুন করতে, মেয়েদের ঘরে বন্দি করার ফতোয়া জারি করতে, মেয়েদের যোনি আর মস্তিষ্কের ওপর কর্তৃত্ব করতে।

আমি খুব ভালো করে খেয়াল করেছি একটা নড়বড়ে পুরুষতান্ত্রিক রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবারের সাথে যুদ্ধ করতে পারাটা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। কারণ এই যুদ্ধ তরবারির সাথে মস্তিষ্কের, যুক্তির সাথে পেশিশক্তির, মুক্তবুদ্ধির চর্চার সাথে অন্ধত্বের, নারী হিসেবে রাষ্ট্র, সমাজ আর পরিবারের সাথে। এই অসম যুদ্ধে আমি আগ্রহী ছিলাম না। কিন্তু এই যুদ্ধে দাঁড়াতে আমি বাধ্য হয়েছি কেবল নিজের অস্তিত্বের জন্য। আর যারা এই যুদ্ধে আমাকে দাঁড় করিয়েছে তাদের নেতা মূলত অজ্ঞতায় ভরা জনপদ আর সেই জনপদের গালভরা শাসক। আমার কষ্ট নেই, কিন্তু অভিমান আছে। আমার বিদ্বেষ নেই, কিন্তু বিতৃষ্ণা আছে তাদের প্রতি।

একজন লেখক হিসেবে আমি আদালতে দাঁড় করাতে চাই সেই সমাজব্যবস্থাকে– যে সমাজ ডানা কেটে দিয়ে উড়তে বলার প্রতারণা করে, যে সমাজ অন্যায় করে বুক ফুলিয়ে চলে, যে সমাজ মেয়েদের আধা মানুষ হিসেবে বিবেচনা করে, যে সমাজ ধর্ষককে ছেড়ে দিয়ে ধর্ষিতার কাপড়ের দৈর্ঘ্য মাপে, যে সমাজ ধর্ষককে ছেড়ে দিয়ে ধর্ষিতার গায়ের চামড়ায় মহামূল্যবান সম্মানের তুলাদণ্ড রাখে সুনিপুণ তামাশা করতে।

আমি বিশ্বাস করি– ইতিহাস বলে যা লেখা হয় সেটা বিজয়ীর হাতে লেখা বাকোয়াজ। কিন্তু ইতিহাস লেখার ইতিহাস লিখতে পারেন একজন লেখক যিনি নিজেই একটা জীবন্ত দলিল। কারণ তার হৃদয়ে জমা ব্যথা, দাগ আর নির্যাতনের চিহ্নগুলোই মূলত সেই ইতিহাস যা শাসকের চোখ এড়িয়ে লিখে রাখে মহাকাল। সেটাই মানবাধিকারের পক্ষে একমাত্র মানুষের সংগ্রামের ইতিহাস।

তাই যেকোনো পুরুষতান্ত্রিক সমাজের মেয়েদের মতো আমি আমার সম্মান আমার পোশাকে, চামড়ায় বা যোনিতে রাখিনি। যদি সম্মান কাউকে করতেই হয়, তবে সে সেটা পাবে তার বিদ্যা, বুদ্ধি, সাহস আর সৃজনশীলতার জন্য।

লেখক এবং শিল্পী হিসেবে বাংলাদেশের মতো প্রতিটি পুরুষতান্ত্রিক দেশের পতাকা হিসেবে আমি দেখি নারীর যোনিকে, মূলত হাইমেনকে যার ওপর কর্তৃত্ব করতেই ধর্মগুলোর জন্ম, যার একটা রাষ্ট্রীয় কাঠামো বানাতেই দুনিয়ার প্রায় সমস্ত সংবিধানেরই প্রাণান্তকর চেষ্টা!

প্রিয় পাঠক, সেইসব পুরুষতান্ত্রিক সমাজ এবং ধর্মের শিকার, কাঁটাতার আর দেশের হাতবদল হওয়ার পরেও ভাগ্যের রদবদল না হওয়া একজন নারীর পক্ষ থেকে ইতিহাস লেখার ইতিহাসের মঞ্চে আপনাকে স্বাগতম!

ওয়েলকাম টু প্যারিস!

একইসাথে পূর্ণতা আর শূন্যতার বোধ মানুষের হয়। মানুষের বুকের ভেতরটা এমনই এক বিচিত্র জটিল গোলকধাঁধা। এই গোলকধাঁধায় কখনো কখনো মানুষের মনে হতে পারে সে মেরুবিন্দুতে দাঁড়ানো এক পরাজিত না হয়েও ক্লান্ত ও বিষণ্ণ মানুষ। যুদ্ধে লড়াই করে জেতার পরে যে টের পেয়েছে তার প্রচুর বিশ্রাম প্রয়োজন, যেন পুরো শতাব্দী তাকে ঘিরে ঘুরছে আর সে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। যুদ্ধে জিতে সে অনুভব করছে সহযোদ্ধাকে হারানোর কষ্ট। বুকের মধ্যে জয়ের আনন্দ আর হারানোর আর্তনাদ মিলেমিশে গেলে এমন হয় হয়তো। তাই আক্ষরিক অর্থেই দেশকে হারানোর কষ্ট আর স্বপ্নকে জেতার আনন্দ মিলেমিশে একাকার হওয়ার অদ্ভুত এক রসহ্যময় অনুভূতি। আর দিব্যদৃষ্টিতে বিশাল দুই বোচকা ভরা পঞ্চাশ কেজির কাছাকাছি ওজনের মালপত্র সমেত আমি এসে দাঁড়ালাম শার্ল দ্য গল এয়ারপোর্টে। ৬ ডিসেম্বর, ২০২১ ইউরোপীয় টাইমজোনের হিসাবে মাঝরাতে।

বৃষ্টিভেজা রানওয়েতে বিমান নামার পরে মনে হলো— একী! বাংলাদেশের আকাশ আমার সঙ্গে করে চলে এসেছে নাকি?

বাংলাদেশ থেকে যখন মধ্যপ্রাচ্যগামী বিমানে উঠেছিলাম, তখন দেখেছিলাম ঠিক একইভাবে আকাশ কাঁদছে। যেন সজল চোখে বিদায় জানাচ্ছে আমাকে, বলছে— অন্য দেশে গিয়ে কিন্তু ভুলে যেও না আমাকে! আক্ষরিক অর্থেই তখন কয়েক মিনিটের জন্য আমার মনে হয়েছিল, বিমান থেকে নেমে আমার পরিবারের সদস্যদের হাত ধরে বলি— চলো, বাড়ি যাই!

কিন্তু দুনিয়ায় যেকোনো আবেগতাড়িত ইচ্ছাকে যেমন লাগাম দিতে হয়, সেরকম সজল চোখে ইচ্ছের পায়ে শেকল পরিয়ে আমি ভাবতে চেষ্টা করলাম নতুন দেশ কেমন হবে, কেমন লাগবে সেই জনপদ!

এদিকে তার কিছুক্ষণ আগেই মধ্যপ্রাচ্যগামী শ্রমিকদের একজনকে আবিষ্কার করেছিলাম যে কি না প্লেনের সময় ভুল করেছে। তার জন্য এত খারাপ লাগছিল!

মধ্যপ্রাচ্যে সবচেয়ে সস্তায় কাজ করে বাংলাদেশের শ্রমিক। এরা কয়টা টাকার জন্য জীবনের ঝুঁকি নেয়, অনেকে কাজের সন্ধানে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ইউরোপে যেতে গিয়ে ডুবে মরে, কেউ ধরা পড়ে অন্যদেশের কোস্টগার্ডের হাতে। অথচ দেশে এরা কী পায়? বিমানবন্দরের লোকদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য আর জঘন্য ব্যবহার। অথচ বাংলাদেশের অর্থনীতির একটা বড় অংশ নির্ভর করে এদের ওপর। বাংলাদেশের মন্ত্রীরা বিভিন্ন দেশে, দেশের যে টাকা পাচার, করে বিদেশে দেশের টাকায় বাড়িঘর কেনে সেগুলো মূলত এদের অবদান।

সৌদি আরবে কাজের জন্য যে মেয়েরা যায়, তারা দুটো টাকার জন্য দিনে রাতে ধর্ষিত হয় সৌদি পুরুষদের হাতে। কেউ কেউ ফেরে বাচ্চা নিয়ে, কেউ কেউ ফেরে লাশ হয়ে। কিন্তু থেমে নেই ওদের যাওয়া। কারণ ওরা যে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে, সেই আল্লাহ অসহায়। কিন্তু যে আল্লাহর কাছে ওরা নিজেদের সমর্পণ করে, সেই আল্লাহর নাম টাকা!

তাই এয়ারপোর্টে দাঁড়ানো সস্তার শ্রমিক লোকটা যখন এসে গ্রাম্য উচ্চারণে জিজ্ঞেস করেছিল– আপা, পিলেন ধরতে কোনদিকে যাইতে হবে? আমি তার জন্য অভয় হতে চেয়েছিলাম। হাত বাড়িয়ে টিকিট চাইতেই সে দিল দোমড়ানো এক টুকরো কাগজ। টিকিটের প্রিন্ট করা এই কাগজটায় দেখি তার প্লেন আরও এক ঘণ্টা আগে চলে গেছে। কাউন্টার দেখিয়ে দিলাম তার এয়ারলাইন্সের। কিন্তু এত মন খারাপ হয়ে গেল!

হয়তো জমি বিক্রি করে দিয়ে টিকিট কেটেছে ভাগ্যের সন্ধানে, গ্রামে থাকা পুরো পরিবারের দায়িত্ব কাঁধে, ঋণের দায়ে জর্জরিত বলে অবশিষ্ট সম্পত্তি বন্ধক রেখে কেবল মাত্র সামান্য লেখাপড়া করেই তুলে নিতে হয়েছে সবকিছুর ভার। এর মধ্যে প্লেন ভাড়ার টাকা থেকে গচ্ছা গেলে কেমন লাগে? সেটাও তো অকিঞ্চিৎকর না!

যা-ই হোক, টানা প্রায় ষোলো ঘণ্টা আকাশে ওড়াওড়ির পর প্যারিসে নামার পর শাটল ট্রেনবিশিষ্ট এয়ারপোর্ট দেখে গ্রামের চাচাতো বোন যে কি না শহরে এসে বিমোহিত হয়ে গেছে। কিংবা ওয়ান্ডারল্যান্ডে এসে পড়া এলিস, তেমন করেই প্যারিসের প্রথম ঝলক চাকচিক্য দেখতে দেখতে ইমিগ্রেশনের ঝামেলা পার করে আবিষ্কার করলাম দূরে কাচের দেয়ালের

ওপাশে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে এতক্ষণ মিটিমিটি হাসি দিচ্ছিল খয়েরি চুলের যে রূপবতী নারীটি সে এগিয়ে এসে আমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বলছে– আই কুড নট বিলিভ দ্যাট ইউ উড বি অ্যাবল টু কাম হেয়ার, ওয়েলকাম টু প্যারিস! (আমি বিশ্বাস করতে পারিনি তুমি আসতে পারবে, প্যারিসে স্বাগতম!)

আরে! এ তাহলে সেই ম্যাগুলন ক্যাথালা!

যার সাথে আমি দিনের পর দিন ই–মেইল চালাচালি করেছি, ভেবেছি খটমটে চেহারার দজ্জাল ধরনের এক নারী চশমার লুকিং গ্লাসের ওপর দিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকবে, খুবই রুক্ষ স্বরে কথা বলবে আর দুরুদুরু বুকে আমি ইংরেজি গ্রামার ভাবতে ভাবতে তার কথার উত্তর দেব! কিন্তু এ তো যা ভেবেছি তার উলটো! এত আন্তরিক হাসিমুখের লোক সে!

মুহূর্তে বুকের মধ্যের সব ব্যথা আর অবসাদ কেন যেন দূর হয়ে গেল আর আমি নিজেই নিজেকে বললাম– কাম অন প্রীতি, ওয়েলকাম টু প্যারিস!

বলে রাখি– আমি যখন প্যারিসে পা দিই তখন একবিংশ শতাব্দীর এখন পর্যন্ত সবচেয়ে কঠিন মহামারিটির তিন নম্বর পর্যায় চলছে, নানানরকম হেলথ রেস্ট্রিকশন চলছে ইউরোপে, চব্বিশ ঘণ্টা আর ছয় ঘণ্টা আগে নাকের মধ্যে লম্বা নল গুঁজে ভাইরাস টেস্ট করিয়ে সেই রিপোর্টের কাগজে সিল মারার নানান দুর্ভোগ চলছে, আমার দেশ বাংলাদেশের নরকতুল্য এয়ারপোর্টে তারচেয়েও চূড়ান্ত অব্যবস্থাপনার মহড়া চলছে। সবমিলিয়ে আমার আসাই একরকম অনিশ্চিত ছিল। অথচ সেখানে আমি কি না এই সমস্ত ফ্যাকড়া পাড়ি দিয়ে 'পারি' নামের যে স্বপ্নলোকের কথা বইতে পড়েছি, মুজতবা আলীর সাথে তাল মিলিয়ে বলেছি 'অর্ধেক নগরি তুমি, অর্ধেক কল্পনা', যে শহরের স্বর্গতুল্য তার কথা পড়ে আফসোস করেছি– সেই জায়গায় এসে শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়েছি ছাব্বিশটি বসন্ত পার করে!

আসার আগে ইউটিউব নামের অন্ধের যষ্টি ঘেঁটে ফরাসি ভাষার প্রাথমিকেরও প্রাথমিক পর্যায় বিষয়ক নানান মহড়া দিলেও রাস্তায় বেমালুম ভুলে গিয়েছি ফ্রেঞ্চ ভাষায় সাহায্য চাইবার উপায়। ফলে যারপরনাই ইতস্তত হুল ফোটানো ঠান্ডা বাতাসের ঝাপটার তোড়ে কালবিলম্ব না করে অদ্ভুত ভাঙা উচ্চারণে জিজ্ঞেস করলাম একজনকে– পারলে ভু অংলে? এর মানে হলো– তুমি কি ইংরেজি পারো?

সে আমাকে বলল– উই উই! (হ্যাঁ হ্যাঁ)

আমি আক্ষরিক অর্থেই কুকুরের মতো কুঁইকুঁই করে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলাম– তুমি কি বলতে পারো, বের হওয়ার রাস্তাটা কোনদিকে?

সে হাত–পা নেড়ে নেড়ে বলল– মানুষের এই লম্বা সারিকে অনুসরণ করলেই পেয়ে যাবে!

আমি মনে মনে বলছি– আরে ব্যাটা, এই পরামর্শই যদি দিবি, তাহলে জিজ্ঞেস করলাম কেন? আমি তো লোকদের অন্ধ অনুসরণই করছি এতক্ষণ!

কিন্তু বিনয়ে গলে যাওয়ার ভান করে বললাম ফ্রেঞ্চ ভাষায় আমার শেখা দ্বিতীয় শব্দ– মার্সি বকু! (তোমাকে অনেক ধন্যবাদ!)

কিন্তু যাকে ধন্যবাদ দিলাম তার পরামর্শে এত মানুষের সারির দিকে তাকাব কী! ততক্ষণে দেয়াল জুড়ে দেখি সারি সারি গ্রেট মাস্টারদের আঁকা ছবিময় পোস্টার আঁটা আর মিউজিয়ামগুলোর নাম লেখা!

মন কেবল এদিক–ওদিক তাকিয়ে বাবার হাত ধরে মেলায় নতুন নতুন খেলনার পসরা দেখা ছোট বাচ্চার মতন বলছে– ওই যে ল্যুভর মিউজিয়ামের ইজিপশিয়ান কালেকশন, ওই যে ডি'ওরসে মিউজিয়ামের ইম্প্রেশনিস্টদের আঁকা ছবির আলাদা বিজ্ঞাপন! চতুর্দিকে এত বিশাল সেসব পোস্টার যে মূল ছবি দেখছি বলেই ভ্রম হয়! চলমান রাস্তায় দাঁড়িয়ে আমি এই লেখাই গিলব, ছবিই দেখব নাকি লোকের মাথা ধরে সাঁইসাঁই বেগে এগোব?

দেশে থাকতে দামি দামি দুষ্প্রাপ্য ছবির বইতে ছোট করে ছাপা পোস্টকার্ডের মতো ছবি ছাড়া কখনো চর্মচক্ষুতে গ্রেট মাস্টারদের একজনেরও আঁকা ছবি নিজের চোখে দেখিনি, এমনকি রাজধানী ঢাকার সবেধন নীলমণি শাহবাগের জাতীয় যাদুঘর, সেও এক রেপ্লিকার সমাহার! সেরকম না দেখা চোখের লোককে যে এরা নিরাপদে আঁকা আর লেখার জন্য বছর দুয়েকের আমন্ত্রণ জানিয়েছে, এ তো প্রথমে দেশে বসে বিশ্বাস হচ্ছিল না আমার! আর তাছাড়া ওইসব প্রিন্টের ছবি দেখে কি মন ভরে?

ব্রাশের স্ট্রোক কোনটা কোথায় গেছে কেমন করে বুঝব?

এমন অনেক বিখ্যাত ছবি আছে যেগুলোর সাদাকালো ফটোগ্রাফ ছাড়া রঙিন ছবি দেখিইনি কোথাও! এমন দীনহীন আর ক্ষীণ লোককে নিয়ে এসে এরা কী করবে?

এইসব ভেবে শীতে কাঁপতে কাঁপতে জবুথবু হতে হতেই খুঁজে পেলাম কোথা থেকে ব্যাগ–বোঁচকা বুঝে পেতে হয়, কোথায় গেলে গোমড়ামুখো অনুসন্ধিৎসু চোখের পুলিশ সদস্য বলে দেয়– অনেক সয়েছি, এখন তুমি পথ দেখো বাপু!

অবশ্য হাতে ট্যালেন্ট পাসপোর্ট নামের ভিসা থাকায় তুলনামূলকভাবে লাইনে দাঁড়ানো যাত্রীদের চেয়ে কম সময়ে কাজ হওয়ায় সেই মুহূর্তে আগেকার দিনে কত প্রকার ঝক্কি পোহাতে হতো তা ভেবে প্রমাদ

শুনেছিলাম। অথচ সেই ঝক্কি যেমন নেই তেমনই এখনকার দিনের প্রতিটি এয়ারপোর্টে থাকা ওয়াইফাই নামক ইন্টারনেটভিত্তিক জাদুর প্রযুক্তি জানিয়ে দেয়– এই শতাব্দীতে মানুষ কেবল একে অন্যের ওপর বোমাই ফেলছে না, বরং মানুষ মানুষকে একে অন্যের কাছাকাছি পৌঁছেও দিচ্ছে!

নইলে মোবাইল নামের জাদুর বাক্সের ওপর এক আঙুলি হেলনে মানুষ কেমন করে পৌঁছে যাচ্ছে এত দ্রুত একে অপরের কাছে?

যেমন রাস্তার মধ্যে বিমান দাঁড়িয়েছিল দুবাইয়ের শারজাহতে।

তখনও এইসব ভাবতে ভাবতেই সমস্ত বিজ্ঞানী আর গবেষককে ধন্য ধন্য করতে করতে মরুর দেশ দুবাইয়ের এয়ারপোর্ট থেকে যাত্রাবিরতির সময়ে বিমানবালার দেখানো পথে দৌড়ে উঠেছিলাম ফ্রান্সের বিমানে। বিমান থেকে পাখির চোখে দেখে নিয়েছিলাম রৌদ্রময় উঠান ঘেরা একই ধাঁচের খড়রঙা সারি সারি বাড়ি, খেজুর গাছের সারি, চমৎকার খেলনার মতো গাড়িগুলোর দোতলা–তেতলা রাস্তা ধরে সাঁইসাঁই করে চলা। এদিকে বিমানের মধ্যের এক বিদেশিনী ক্যামেরা বের করে কটাস কটাস ছবি তুলছে দেখে আমি পাখির চোখে আবিষ্কার করলাম বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু দালানগুলোর একটা বুর্জ খলিফার পেটমোটা অবয়ব। খুব রুচিশীল ঠেকল না অবশ্য। অথবা এ নিছকই আমার মনের সমস্যা।

যেকোনো 'অতি টাকাওয়ালা' বিষয়েই আমার বিবমিষা পুরাতন। মধ্যপ্রাচ্যের যে তেল বিক্রির টাকার তেলতেলে পুঁজিতান্ত্রিক অবয়ব, তাতে এ যেন নিজেকেই বুদ্ধের বাণীসমেত বলা– অতি অর্থে সর্বনাশ!

যা-ই হোক, আমার সর্বনাশের শুরু হয়েছিল বই পড়ার হাতেখড়ি কিংবা চোখেখড়ি থেকেই! বই পড়ার কারণেই অল্প বয়স থেকেই আমার স্বপ্ন ছিল বিশ্ব ভ্রমণের। কিন্তু গরিব দেশের গরিব এক কমবয়সি মেয়ে চাইলেই দেশ–বিদেশ ঘুরতে পারবে কীভাবে?

আমি বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত এক পরিবারের ছোট সন্তান। তার ওপর মেয়ে। সাধ ও সাধ্যের টানাটানির মধ্যিখানে আমি পেন্ডুলামের মতো দুলেছি, আধুনিক মন নিয়ে পশ্চাৎপদ সমাজে বেড়ে ওঠার কণ্টক ও নুড়ি বিছানো পথে আমি হেঁটেছি, হোঁচট খেয়েছি। কিন্তু সেই পথ তো কখনোই ভ্রমণের প্রয়োজনে চলিনি, বরং জীবনের প্রয়োজনে পথ খুঁজে নিয়েছি। অথচ বিমানের জানালার কাচে নিজের চোখের প্রতিফলনে যে জীবনের নতুন রূপ আমি দেখলাম, তাতে সম্মোহিত হয়ে গেলাম খানিকক্ষণের জন্য। এই যে নতুন আরেক জীবন আমাকে তার সমস্ত রহস্য আর অ্যাডভেঞ্চারের ডালা খুলে হাতছানি দিয়ে ডেকেছে, আমি তাকে ফেলি কী করে?

অবশ্য অতি নাদান বয়সে স্কুলে যাওয়ার আগে থেকে যে গল্পের বই নামের জাদুর পাটির দেখা আমি পেয়েছিলাম। তাতে চড়ে ঘুরে বেড়িয়েছি মধ্য এশিয়া থেকে শুরু করে আফ্রিকা মহাদেশ, লাতিন আমেরিকা থেকে শুরু করে ইউরোপ, বসফরাস অথবা জিব্রাল্টার প্রণালির মাঝ বরাবর। মিশর নিয়ে অতি আগ্রহ থাকায় অনেক কষ্টে উদ্ধার করতে শিখেছিলাম হায়ারোগ্লিফিক নামে মিশরের প্রাচীন চিত্রভাষার সামান্য অংশ।

মনে আছে কোনো এক সুহৃদ ব্রিটিশ মিউজিয়ামের হায়ারোগ্লিফিক শেখার বই এনে দেওয়ায় বর্তে গিয়েছিলাম! এরপর অতি উৎসাহে ইউরোপের কোন মিউজিয়ামে কী কী চিত্রকর্ম আছে, কোন দেশের কোন শহর কীসের জন্য বিখ্যাত, কোন শহরে কী খনিজ আর প্রাকৃতিক সম্পদ আছে, কোথায় গেলে মিলবে দুনিয়ার সবচেয়ে মূল্যবান হীরের খণ্ড তা বইয়ের প্রতি বুভুক্ষু থাকার কারণে সবই আমার নখদর্পণে। কেউ বিদেশ থেকে এলে আমি এমন গল্প করতে জানি যে পিকাসো আমার বাড়ির পাশের আত্মীয় আর ভ্যান গগ আমার মায়ের দিকের আত্মীয়দের মধ্যের এক নিষ্কর্মা গরিব এক ভবঘুরে। এরকম একজন মানুষ টাকার অভাবে কোথাও যায়নি, তাইই বা কে বলবে?

কৈশোরে বাড়ন্ত শরীর আর উড়ন্ত মনে তাই প্রতিদিন টিভিতে দেখা সাবানের ফেনায় মাখা নারীদের দেখতে দেখতে অভ্যস্ত চোখে আর কৌতূহলী মনের মিশ্রণে বাথরুমের পানির কল খুলে আমি কখনো মিশরের রানি ক্লিওপেট্রা, কখনো দিল্লির সিংহাসনের প্রথম সম্রাজ্ঞী নারী সুলতানা রাজিয়া, কখনো নূরজাহান নামের সেই পারস্য সুন্দরী। এরকম একজন বুভুক্ষু কিশোরী দেশের গণ্ডি পেরিয়ে হয়তো সর্বোচ্চ ভারত পর্যন্ত যেতে পারে, কিন্তু সমুদ্র পাড়ি দিয়ে একলা নারীর বাউন্ডুলেপনার কুসংস্কারকে স্বাচ্ছন্দ্যে নিজের ঘাড়ে তুলে নিতে জানবে একদিন, বিদ্রোহ করবে নিজের রাষ্ট্রের সাথে, যুদ্ধ করবে চরিত্র নিয়ে ছিনিমিনি খেলা এক অদ্ভুত ট্যাবুতে ভরা সমাজের সাথে তাইই বা কে জানত?

আমি জানতাম না। শুধু কম বয়সে লেখালিখি করে সামান্য নাম আর বই বাবদ কিছু টাকা কামানোর বহু আগে থেকেই আমার মনে হয়েছিল– এবার লেখা যাক সমাজের কথা, দেশের কথা! কিন্তু কখনো সেই লেখা দিনে দিনে প্রিয় থেকে বিতর্কিত, বিতর্কিত থেকে অতি বিতর্কিত হয়ে উঠবে তাইই বা কে ভেবেছিল?

আমি ভাবিনি। আমার ধারণা কোনো লেখকই ভাবে না সে বিতর্কিত হয়ে উঠবে। অথচ আজকাল খুব মনে হয়, জগতে বিতর্কিত না হয়ে ওঠাই

সবচেয়ে বিতর্কিত ব্যাপার হওয়া উচিত ছিল। কারণ বিতর্কিত মানুষ ছাড়া আজ পর্যন্ত জগতের কিচ্ছু উদ্ধার হয়নি।

যেহেতু বিতর্কিত হতে চাইনি (কিংবা কে জানে, হয়তো অবচেতনে চেয়েছিলাম)। আমি কেবল ভেবেছিলাম– লেখকের একটা দায় আছে, সেই দায়টা সময়ের কাছে, সময়ের প্রয়োজনের কাছে। যে দায় আমাকে সাহস দিয়েছিল কাউকে তোয়াক্কা না করে সত্য বলতে, কাউকে পাত্তা না দিয়ে নিজের ভাবনা বলতে। এই যে তোয়াক্কা না করার বিষয়টা এখানে আমার মায়ের একটা গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে। তিনি শিখিয়েছিলেন– কেবল পেটে ভাত জোটাই ক্ষুধা মেটা না। আত্মাকেও খাবার দিতে হয়। তিনি শিখিয়েছিলেন– মানুষ ততদিনই বেঁচে থাকে যতদিন তার আত্মা বেঁচে থাকে! আর আত্মাকে বাঁচিয়ে রাখতে হয় ছবি এঁকে, বই পড়ে, গল্প লিখে। কবিদের ভাষায়– সুন্দরের চর্চা করে! অবশ্য সেই চর্চাটা, সেই লেখালেখিটাও একদিনে জন্মায় না, তার জন্য জানতে হয়, বুঝতে হয়, অনুধাবন করতে হয় নিজের ক্ষুদ্রতা আর দুনিয়ার বিশালতাকে।

কম বয়সে যে রক্ত গরম থাকে তা তো সকলেরই জানা। কিন্তু মানুষ জানে না সেই গরম রক্ত সত্যের স্পর্শ পেলে হয়ে ওঠে পরশপাথর, যে পরশপাথরের ট্র্যাজেডি হলো– তাতে করে লেখক নামের অভাগাটা নানান বিপদে পড়ে, কিন্তু সর্বক্ষণ মাথার ভেতর থেকে কেউ সর্বনাশ জেনেও সত্য বলতে মন্ত্রণা দেয়, বারবার বলে বিপদের তোয়াক্কা না করতে। ফলে আমার এত লোকরা বিপদে পড়ে, কেউ কেউ ভাগ্যবান না হাওয়াতক লেগে থাকে, কেউ কেউ জীবনের মাঝ সমুদ্রে এসে ডুবে যায় টাইটানিক জাহাজের হতভাগ্য যাত্রীদের মতো।

জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে কী ঘটবে তা না জানা যেমন স্নায়ুর ওপর চাপ ফেলে, তেমনই জেনেশুনে বিপদে পড়তে পারা জীবন শেষতক শূন্যে মিলিয়ে যাবে জেনেও জীবনকে জীবনের মতো করে যাপন করার বাসনা মানুষকে ঘুমাতে দেয় না। আর আধা ঘুম আর জাগরণে ভরা জীবনের কাছে এজন্য মৃত্যু সম্পর্কে কিছু না জানা মানুষরা মাথা নত করে। মাথা নত করে বলেই তারও অনেক সময় রবীন্দ্রনাথের মতো করে বলতে মন চায়–

জীবন যখন ছিল ফুলের মতো
পাপড়ি তাহার ছিল শত শত
বসন্তে সে হতো যখন দাতা

ঝরিয়ে দিতো দু চারটি তার পাতা,
তবু যে তার বাকি রইতো কত!

বাকির হিসেব পেরিয়ে তাইই মূলত আমি আমার ভুলেভরা ফুলের মতোন জীবনটি আবার নতুন করে শুরু করলাম শার্ল দ্য গল এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে প্রচণ্ড বৃষ্টিভেজা ডিসেম্বরের কনকনে শীতের কাঁপুনিতে হাতে থাকা ছোট্ট ব্যাগ থেকে আমার একমাত্র জ্যাকেটটি বের করতে করতে। জ্যাকেটের সাথে বেরিয়ে এলো জ্যাকেট দিয়ে মুড়িয়ে রাখা অতি প্রিয় বাঙালি লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ছবির দেশে কবিতার দেশে' বইটি। আমি নিজেই নিজেকে সেই ঠান্ডায় আমার জন্য পার্ক করে রাখা চকচকে কালো গাড়িতে উঠতে উঠতে বললাম– প্রীতি, ছবির দেশে কবিতার দেশের নতুন করে পুরনো মদের মতো জীবনটির নতুন বোতলে তোমাকে স্বাগতম!

ঘর

জীবন যে কখনোই ফুলের মতো ছিল না আমার জন্য, তা বুঝতে শুরু করেছিলাম যেদিন থেকে সেদিন থেকেই বুঝেছিলাম– জীবন বলে যা জানি, তা মূলত সংগ্রাম। এই যে আমার ঘর ছেড়ে প্যারিসে আসা, এখানেও আছে বহু ব্যক্তিগত ত্যাগ আর সংগ্রামের গল্প। সেই সংগ্রামটা মূলত বাংলাদেশ নামক তৃতীয় বিশ্বের এক দেশ থেকে দুনিয়ার আরেক প্রান্তের বিলাসবহুল এক শহরে এসে পড়ার মধ্যবর্তী সময়ের গল্প।

বলে রাখা ভালো যে প্যারিসে আমি এসেছি আইকর্ন প্রোগ্রামের একজন লেখক ও শিল্পী হিসেবে। আইকর্ন (ইন্টারন্যাশনাল সিটিজ অফ রিভিউজি নেটওয়ার্ক) হলো দুনিয়ার প্রায় ১২০টার মতো শহরের একটা নেটওয়ার্ক। এও বলে রাখা ভালো, আইকর্ন দুনিয়ার সমস্ত মানবাধিকার সংগঠনগুলোরও একটা যারা রাজনৈতিক বা ধর্মীয় প্রতিহিংসার শিকার হওয়া এবং বিপদে পড়া লেখক ও শিল্পীদের বৃত্তি দিয়ে থাকে। দেশ থেকে আমি একাই কেবল আসিনি, বরং নানান সময়ে বাংলাদেশে নানান প্রতিহিংসার শিকার কিছুসংখ্যক ব্লগার, অ্যাক্টিভিস্টও এই বৃত্তি পেয়েছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন শহরে। কিন্তু প্যারিসে আমিই প্রথম বাংলাদেশি। এমনকি 'ভয়েসেস ফ্রম চেরনোবিল' বইয়ের জন্য দুই হাজার পনেরো সালে সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ বিজয়ী বেলারুশের সভেতলানা আলেক্সিভিচ নামের বিখ্যাত লেখকও এই বৃত্তি পেয়েছিলেন, নেদারল্যান্ডসের আমস্টারডামে প্রায় তিন বছর তিনি ছিলেন নিজ দেশ থেকে নির্বাসনে।

আমি যখন এই বৃত্তির জন্য আবেদন করি তখন এক ভয়ংকর সময় যাচ্ছে আমার জীবনে। একদিকে হাইকোর্টে আত্মসমর্পণ করে আগাম জামিন পেয়েছি ছয় সপ্তাহের জন্য। অন্যদিকে আদালতে আমার নামে মামলা চলছে রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার দায়ে। বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতের দুর্নীতি নিয়ে এক লেখার কারণেই মোটামুটি তুর্কি নাচন নেচে আমাকে নিয়মিত আদালতে দাঁড়াতে হচ্ছে, পেটমোটা দুর্নীতিবাজ পুলিশ অফিসাররা দাঁত বের করে টাকা

চাইছে ঘুষের, অনলাইনে চলা বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ বর্ষের শেষ পরীক্ষাটিও দিতে হচ্ছে।

সেসময় আমি আদালতে দাঁড়ানোর গ্লানিতে জর্জরিত হবো নাকি পরীক্ষা দিতে দিতে সেই গ্লানি ভুলে থাকব তা ঠাহর করতে পারি না। মাঝেমধ্যে দুঃস্বপ্ন দেখি, সেগুলোও অবর্ণনীয়। আমি দেখি জীবন্ত অবস্থায় আমাকে লাশকাটা ঘরে নিয়ে গিয়ে হাত–পা কাটা হচ্ছে। জ্যান্ত অবস্থায় বুক কেটে হৃৎপিণ্ড বের করা হচ্ছে!

এই ভয়াবহ সমস্যার কথা তখন একজনকেই বলি, সে হলো আমার অভাজন প্রেমিক। ফোনে দীর্ঘক্ষণ কথা বলে কাঁদি, হাসি তার সাথেই। পরিবারের সদস্যরা আমাকে নিয়ে নানান ভয়ে আছে। সেইসময় তারা সেইসব ভয়গুলো প্রকাশ করেছে আমাকে বকা দিয়ে, বিপর্যয়ের মাঝেই আরেকটুখানি বিপর্যয়ের হাতছানি দেখিয়ে। যেমন– কী দরকার ছিল ওইসব কথা লেখার? লিখে কী উদ্ধার হয়েছে?

আগে হলে বার্ট্রান্ড রাসেলের বাণী শোনাতাম ওদের যে 'এক মিলিয়ন বেকুব একটা মিথ্যাকে সমর্থন করে গেলেই সেটা তারপরও সত্য হয়ে যায় না' এরকম কিছু। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। আমি দেখেছি আমাকে ধর্ষণ করতে চাওয়া লোকদের মন জুগিয়ে কথা বলছে আমার ভাইবোন, তাদের ডেকে চা খাওয়াচ্ছে, মাথা নত করে আজ্ঞাবহ দাসের ভূমিকায় অভিনয় করছে যেন তারা আমাকে ধর্ষণ না করে, যেন তারা দয়া করে মামলাটা প্রত্যাহার করে। আমাকে নিষ্ফল আবেগে নিরুপায় হয়ে একদম চুপ করে থাকতে হচ্ছে। এমনকি বাংলাদেশের আদালতে যখন আমি দীর্ঘ চার মাসের আত্মগোপনের পরে হাজির হই, তখন এক কাছের লোক বলেছিল– ঠিকমতো ওড়না পরতে আর হাতাকাটা জামা না পরতে। যেটুকু বিস্ময় বাকি ছিল তাতে আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম– কেন, বিচারক কি আমার শরীরের দিকে তাকিয়ে থাকবে?

জবাব এসেছিল– এটা বাংলাদেশ!

হ্যাঁ, কথাটা অবশ্য ঠিক আছে। ওটা বাংলাদেশ ছিল বলেই হয়তো একটা মত প্রকাশের জন্য কারও নামে মামলা দেওয়া যায়, আদালতে আদালতে ঘুরে তাকে বিচার নামের প্রহসন ভিক্ষা করতে বাধ্য করা যায়, একজনের পোশাকের দিকে আঙুল তোলা যায়, ইচ্ছে হলেই কেবল নারী বলে 'বেশ্যা' ট্যাগ দেওয়া যায়, পুলিশ হলে ঘুষের টাকা চাওয়া যায় হাসতে হাসতে!

মাঝে মাঝে মনে হয় ওই ভূখণ্ড ছাড়া বিশ্বের আর কোন নরকে এসব দুর্নীতিগুলো এত সুনিপুণভাবে করা যায়?

শুরুর কথা বলি– এই যে একবিংশ শতাব্দীর এই ভয়াবহ কোভিড নামের মহামারি, এটা শুরু হওয়ার পরে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করল। আমি ফিরে এলাম ঢাকা থেকে রাজশাহীতে, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে সোজা আমার ছেড়ে যাওয়া ঘরে। আমাদের দেশের রাজধানী ঢাকা দূষিত হতে হতে বিশ্বের সবচেয়ে দূষিতের তালিকায় এখনকার দিনে সারাবিশ্বে প্রথম দ্বিতীয় হয়ে কুখ্যাত থেকে কুখ্যাততর হচ্ছে কিন্তু রাজশাহী আমার প্রাণের শহর, এই শহরে আমি বেড়ে উঠেছি। এই শহরে শিশুকাল কাটিয়েছি, কাটিয়েছি কৈশোর আর তরুণ হয়ে ওঠার প্রথমার্ধ। আমার ধারণা আমি দুনিয়ার যে প্রান্তেই যাই, যে শহর আমার বুকের মধ্যে থাকবে, সেই শহরের নাম– রাজশাহী। সে দূষিত নয়, সে সবুজ। আর সবুজ বলেই আমার মন অবুঝের মতো সেই ঘ্রাণ, সেই ভেজা মাটির গন্ধ খুঁজে ফেরে এমনকি প্যারিসে বসেও।

কিন্তু মহামারির ছুটিতে সেই যে ফিরলাম, আর যাওয়া হলো না ঢাকাতে সেইভাবে।

মধ্যিখানে কেবল চরকির মতো ঘুরলাম গ্রাম থেকে মফস্‌সলে, সেখান থেকে আরেক গ্রামে। ভাগ্যের পরিহাসে বোরখা নামের যে পোশাক কখনো পরতে চাইনি, যে কাজ কখনো করতে চাইনি তার সবই করতে হলো আমাকে বাধ্য হয়ে। প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে। কখনো কখনো মনে হতো আত্মগ্লানিতে বুঝি মরেই যাব!

আবারও শুরুর কথা বলি। কোভিড মহামারি শুরুর পরে দেখলাম বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতের বেহাল দশা। মানুষ মরে যাচ্ছে, কিন্তু ওদিকে অক্সিজেন নেই, আইসিইউ নেই, করোনা ভাইরাস টেস্ট করার কীট নেই। চারদিকে 'নেই' নামের হাহাকার, মানুষ মরছে দেদারসে। ক্ষমতার আশেপাশে থাকারা যার যার এত লুঠ করছে ট্যাক্সের টাকা, সেসব দেখারও কেউ নেই।

পত্রিকার দিকে তাকানো যায় না। সেখানে কেবল খারাপ সংবাদ। ভাইরাস যেহেতু ছোঁয়াচে, সে কারণে সেটা মনের ওপরও চাপ দিতে লাগল। কারণ সারা দুনিয়ার গবেষকরা বলছেন– ঘরে থাকতে, নিয়মিত সাবান দিয়ে হাত ধুতে, চোখে হাত না দিতে, তিন–চার হাত দূর থেকে হাঁচি দিতে। কারও সর্দিজ্বরের উপসর্গ দেখা গেলেই তাকে দূরে ঠেলে দিতে, অন্য ঘরে

রাখতে, তার থেকে দূরত্ব বজায়ে রাখতে। বলছেন হাত না মেলাতে, জনসমাগম না করতে। অথচ স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর উপলক্ষ্যে তাও হলো বাংলাদেশে। আতশবাজি ফোটানো হলো অতিমারিকে ছাপিয়ে!

এদিকে আতঙ্কও আছে, আতঙ্কের আরেক কারণ হলো তখন নিয়মিত টিভিতে দেখছি আমেরিকায় লাশের মিছিল বয়ে চলেছে, ইতালিতে ত্রাহি দশা মানুষের, ইংল্যান্ডের স্বাস্থ্যকর্মীরা কাঁদছে– তাদের মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছে না, লক্ষ লক্ষ মানুষ মরছে, ডিউটি করতে করতে একেকজনের উদভ্রান্ত চেহারার দিকে কেউ তাকাতে পারছেনা। ক্লান্তিতে, অবসাদে জর্জরিত শরীরে তারা রোবটের মতো কাজ করে যাচ্ছে।

অন্যদিকে আরেকটা সমস্যা ছিল যে মানুষ এই ভাইরাসটা সম্পর্কে বেশিকিছু জানে না। কিন্তু সেই অদৃশ্য শত্রুর ভয়ে সবাই তটস্থ হয়ে আছে। বয়স্ক রোগীদের আলাদা করে রাখতে বলা হচ্ছে।

একদিন পত্রিকায় দেখলাম ঢাকায় এক ছেলে রাস্তার ধারে পড়ে আছে। গরিব রোগীদের তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে হাসপাতাল থেকে। এসব দেখে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আমি লিখতে শুরু করলাম। আগেও লিখেছি, কৈশোর থেকেই বাংলাদেশের প্রতিটা আন্দোলনেই লিখেছি। একবার নিরাপদ সড়কের দাবিতে স্কুল শিক্ষার্থীরা রাজধানীর নানান জায়গায় বিক্ষোভ করল, দেখলাম সেই স্কুলে পড়া বাচ্চাদের ওপর হেলমেট পরে সরকারের গুন্ডাবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমি বেশি বেশি করে ছাত্রদের পক্ষে লিখছিলাম বলে প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সেক্রেটারি আশরাফুল আলম খোকন আমার ছবি দিয়ে পুলিশের ভুয়া নম্বর সংযোজন করে অনলাইনে ছেড়ে দিলেন। যেখানে লেখা– এর ব্যাপারে তথ্য দিয়ে পুলিশকে সহায়তা করুন! এমন যে কত অদ্ভুত পরিস্থিতি সয়েছি!

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষে এসে দেখেছিলাম সেই একই দশা। সরকারি দলের ছাত্র সংগঠন হলের মেয়েদের ডেকে ডেকে মিছিল করে হলের মাঝেই। র‍্যাগিং নামক নির্যাতনকে এরা আদর করে ডাকে– সিটিং, এই সিটিঙে কী শেখানো হয়?

শেখানো হয়– সিনিয়র কাউকে দেখলেই কালবিলম্ব না করে সালাম দিতেই হবে, কলের পুতুলের মতো নাম আর ব্যাচের নাম বলে খাতির করতে হবে, খাবার নিতে লাইনে আগে দাঁড়ালেও সিনিয়র কাউকে দেখলে জায়গা ছেড়ে দিতে হবে, হলের রান্নাঘরে রান্না করতে গেলে কিছু না খেয়ে

থাকলে সিনিয়রকে আগে জায়গা দিতে হবে! অর্থাৎ যোগ্যতা বা সভ্যতার বালাই নেই. কেউ বয়সে বড় হলেই সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত থাকবে একটা গ্রুপের কাছে! যখন প্রতিবাদ করেছিলাম, তখন আমার বিরুদ্ধেই উলটো আন্দোলন শুরু করল সরকারি দলের ছাত্ররা। তারা স্লোগান দিচ্ছিল– এক দফা এক দাবি, প্রীতি তুই কবে যাবি?

অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ঘটনাগুলো যে আকাশ থেকে পড়েছে আসমানি কিতাবের মতোন, তাও কিন্তু না! দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা এগুলো জানেন। জেনেও না জানার না দেখার ভান করেন। আর ভান করবেনই বা না কেন? তারা নিজেরাও তো চাকরি থেকে শুরু করে পদ পেয়েছেন কেবল দালালি করেই, মেধাই যে একমাত্র যোগ্যতা না– তা বারবার প্রমাণ করেছেন। যারা শুরু থেকেই এমন মেরুদণ্ড হারিয়ে তোষামোদি করে পদ পেয়েছে, তারা কেমন করে সেই একইদলের গোলাম না হয়ে কাজ করতে পারবেন?

আর সে কারণেই এই দলান্ধ শিক্ষকদের একজন আমাদের তখনকার ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান আমাকে ডেকে গলা খাঁকারি দিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন– তুমি নাকি ফেসবুকে আমাকে মেরুদণ্ডহীন লিখেছ?

আমি তাকে অবাক হয়ে উত্তর দিয়েছিলাম– না স্যার, আমি লিখিনি। অন্য একজন লিখেছে। আপনি কী দেখবেন?

তিনি ঘটনার আকস্মিকতায় বিহ্বল হয়ে গিয়ে বললেন– না থাক, তুমি এখন যেতে পারো!

এই ঘটনা মনে পড়লে এখনও হাসি পায়।

আরও হাসি পায় তখনকার আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই সময়ের ভিসি ফারজানা ইসলাম আমাকে তার চেম্বারে ডেকে জিজ্ঞেস করেছিলেন– বিশ্ববিদ্যালয়ে যে নির্যাতনের ঘটনা ঘটে, তা আমাদের না জানিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছ কেন?

আমি তাকে উত্তর দিয়েছিলাম– কারণ আপনাদের জানিয়ে লাভ হতো না। এমন তো না যে আপনারা জানেন না!

এরপর তিনি আমাকে আর প্রশ্ন করেননি, কেবল বাবা–মাকে বলেছিলেন যে, আমি অনেক সাহসী!

অবশ্য এরপর চাপে পড়ে বিশ্ববিদ্যালয় এক তদন্ত কমিটি গঠন করেছিল, সেই তদন্ত কমিটি এখনও কোনো রিপোর্ট দেয়নি!

আরও মজার ব্যাপার হলো এরও অনেক পরে উনার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে তার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে ওঠে। কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষমতার খুব কাছের লোক হওয়ায় তিনি বেঁচে যান!

অবশ্য কে না জানে, দেশের যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হতে হলে ক্ষমতার সবচেয়ে বিশ্বস্ত আজ্ঞাবহ লোক হতে হবে। দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যেসব বরাদ্দ আর টেন্ডার হয়, তার অধিকাংশ খাওয়ার সুযোগ কেন ছাড়বে এরা?

সুতরাং এই তোষামোদের সংস্কৃতি বহাল রেখে বাংলাদেশের শিক্ষা হয়ে গেছে এক শয়তানি করার হাতিয়ার। যে যত বড় শয়তান, সে তত বেশি শিক্ষিত। তার তত বড় ডিগ্রি।

কিন্তু এসবের কথা বাদ দিলেও এই মহামারির মধ্যেকার লেখাগুলো অন্যরকম ছিল আমার। কারণ এগুলো দুরবস্থার মধ্যে বসে লেখা, এগুলো লেখা একারণেই যে– না লিখে পারা যায় না।

যেমন তখন খবরে দেখলাম এক বৃদ্ধ হাসপাতালের বারান্দায় মরে গেছেন, আরেকদিকে এক বাসায় এক পরিবারের একজন বাদে সবাই মরে গেছে! কিন্তু মানুষ তবু ভয়ে জড়সড়ো। যেন তাবেদারি করতে মুখিয়ে আছে ক্ষমতাসীনদের ছাত্র সংগঠনটি। মানুষ মরে যাচ্ছে, তাতে সমস্যা নেই। কিন্তু উন্নয়নের ভাঙা রেকর্ড তাদের যেন বাজাতেই হবে! সেসময় অনেক মন্ত্রীই দেশ থেকে পালিয়েছিল বিদেশে। অবশ্য ভাইরাসের সংক্রমণের আশঙ্কার জন্য অধিকাংশ ফ্লাইটই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

এদিকে মজার ঘটনাও ঘটছিল। বিদেশফেরত বিমানযাত্রীদের দুই সপ্তাহের কোয়ারেন্টিনে রাখার কথা। কিন্তু অনেকেই সেই জায়গা থেকে পালিয়েছিল। এই পালানো ছিল ভয়াবহ, মোটেই হাসির না। তাদের অভিযোগ ছিল কোয়ারেন্টিন সেন্টারে যা খেতে দেওয়া হচ্ছিল তা ছিল বেশিরভাগই মেয়াদোত্তীর্ণ। ওদিকে ওরকম আগাপাশতলা না জানা ভাইরাস সেই পালানোর সাথেই ছড়াচ্ছিল। আবার বিদেশে যাওয়ার জন্য মরিয়া কিছু লোক ভুয়া কাগজ বানিয়ে বিদেশে গিয়ে ভাইরাস পরীক্ষার পর ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিল আক্রান্ত প্রমাণিত হয়ে।

এর মধ্যে ঘটল এক অতি কলঙ্কজনক ঘটনা। বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তির একটা হলো গার্মেন্টস। লকডাউন দিয়ে গার্মেন্টস কলকারখানা বন্ধ থাকলে যেহেতু আর্থিকভাবে গার্মেন্টসগুলো ক্ষতির সম্মুখীন হবে তাই হাঁটিয়ে নিয়ে আসা হলো শ্রমিকদের। মাইলের পর মাইল হেঁটে

শ্রমিকরা কাজে ফিরল, কারণ লকডাউন উপলক্ষ্যে সরকারি নির্দেশনায় দূরপাল্লার যানবাহন বন্ধ থাকলেও তাদেরকে ফিরতেই হবে! অগত্যা সেই শ্রমিকরা ফিরল কাজে মধ্যযুগীয় কায়দায়।

প্রায় আড়াইশো বছর আগে টমাস হুড 'শার্টের গান' নামের যে বস্ত্রশ্রমিকদের নিয়ে কবিতাটা লিখেছিলেন, সেই কবিতার প্রতিটি লাইন যেন আমার কাছে জীবন্ত হয়ে উঠল। পিঁপড়ার সারির মতো শ্রমিকরা ফিরছে এই ছবি দেখতে দেখতে কানের মধ্যে বাজতে থাকল– স্টিচ স্টিচ স্টিচ... শুধু গার্মেন্টসই না, বকেয়া বেতনের দাবিতে পাটকল শ্রমিকরা আন্দোলন করেছিল। সেই শ্রমিকদের আন্দোলনে পুলিশ গুলো চালাল, কাকে কাকে যেন মেরে ফেলল। লকডাউনের কারণে গুটিকয় লোক ছাড়া কৃতদাস জনগণ টুঁ শব্দটি করল না শ্রমিকদের পক্ষে! সমাজের মধ্যম কিংবা ওপরতলার লোকরা শ্রমিকদের পক্ষে কেন যাবে যখন পেটে ভাত আছে?

ওদিকে সরকারের কাছ থেকে প্রণোদনা আদায় করে নিল গার্মেন্টস মালিকরা। আর কে না জানে, সরকারের সিংহভাগ লোকদের হাতেই গার্মেন্টসগুলোর ভার– তারাই মালিক, তারাই রাজা। ফলে তারা নিজেরাই টাকাগুলো লুটেপুটে খাচ্ছে নিজেদের মধ্যে। শ্রমিক মরছে? মরুক না! তাতে কী?

আসলে বাংলাদেশে বস্ত্রশিল্প পুঁজির বিকাশ ঘটাতে গিয়ে বিকাশ ঘটিয়েছে শোষণের, নিপীড়নের, তৈরি করেছে শ্রমবাজার নামের কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প। অনলাইন ডেলিভারি সার্ভিসে কাজ করা হতদরিদ্র তরুণ কিংবা গার্মেন্টস শ্রমিক, এরা মূলত এই শোষণেরই বাই প্রডাক্ট। এই শোষণ শ্রমিককে শ্রমিক হওয়ার গৌরব দেয়নি, দিয়েছে আধুনিককালের কৃতদাসের মর্যাদা। যেভাবে একগাদা গার্মেন্টস কারখানায় আগুন লাগলেও তার বিচার হয়নি, রানা প্লাজা ভেঙে পড়লেও শ্রমিকদের পুনর্বাসনের জন্য অনুদানের টাকা পর্যন্ত হাপিস হয়ে গেছে, পুড়ে মরেছে শত শত শ্রমিক, যার একটিরও বিচার হয়নি!

যে পোশাককে এককালে লোকে সভ্যতার নিদর্শন হিসেবে উল্লেখ করেছে, বাংলাদেশের সেই পোশাকশিল্প সেটিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে হয়ে উঠেছে মূলত সভ্যতার মুখোশ তৈরির কারখানা। করোনার মধ্যে তাই পোশাক শ্রমিকদের হাঁটানোর কাজটি সুচারুভাবে সম্পন্ন হলো।

আর বস্ত্রশিল্পের পশ্চিমা ক্রেতারা? তারা নানান নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে শুধুমাত্র মালিকদের ওপর। কিন্তু শ্রমিকদের সাথে কী ঘটে তা কি ওরা দেখে?

দেখে না বলেই ওদের কাছেও শ্রমের মূল্য কম। কম বলেই কি না ওরা বেশি লাভের আশায় কম দামে পোশাক কেনে বাংলাদেশের কাছ থেকে, মাঝেমধ্যে লোক দেখানোর জন্য গার্মেন্টস মালিকদের বকে দেওয়ার ভান করে, আর অন্যদিকে দারুণ লাভে বিক্রি করে ইউরোপের দোকানগুলোতে। আমি নিশ্চিত, পোশাক শ্রমিকদের ওপর রানা প্লাজা ভেঙে না পড়ে যদি তালেবান বা আল কায়েদা রানা প্লাজার ওপর হামলা করত, তাহলে পশ্চিমা মিডিয়া তিনগুণ উৎসাহে সেই নিউজ ছড়িয়ে দিত চাপা পড়ে মরা শ্রমিকদের খবর দিগ্‌বিদিক! দেখাত ঠিক কতটা দুঃখে আছে আমাদের শ্রমিকরা।

হায়রে হতভাগা শ্রমিক! না পেল মিডিয়ার প্রচার কিংবা সাহায্য, না পেল জীবনের ন্যূনতম দাম।

সে যা-ই হোক, এমনই এক তথৈবচ অবস্থার মধ্যেই একদিন দেখলাম বাংলাদেশের এক কালের স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম মারা গেছেন। জানতাম মারা যাওয়ার আগে তার বিরুদ্ধে উঠেছে দুর্নীতির অভিযোগ। মরার আগেও পেয়েছেন সর্বাধুনিক চিকিৎসা। অথচ দেখলাম, ক্ষমতাসীন দলের লোকদের কী আহাজারি! মনে হচ্ছিল যেন ইসলাম ধর্মের মূল নবি মোহাম্মদ নতুন করে মারা গেছে!

অবশ্য এদেরই বা দোষ দেই কেমন করে?

এই যে মানসিক অন্ধত্ব, এ এমনই এক ব্যাধি যা অশিক্ষা আর জাতীয়তাবাদের ভ্রান্ত আবেগের পালে হাওয়া দেয়, ভাবতে শেখায়– আমরা এক মহান জাতি, আমাদের জাতি শ্রেষ্ঠ! শতাব্দীর পর শতাব্দী জাতীয়তাবাদ এভাবেই ধর্মান্ধতার মতো টিকে থাকে অন্ধত্বকে পুঁজি করে, যাতে শ্রেষ্ঠত্বই মূল দাবি। এই দাবিগুলোতে ভর করে দুর্নীতিবাজ দেশগুলোর নেতারা টিকে থাকে, আশার বাণী শোনায়, শুনিয়ে বশীভূত করে রাখে মানুষকে।

শুধু কি দুর্নীতিবাজ দেশ? যে মহান বলে প্রচারিত দেশগুলোকে আমরা উন্নত সভ্যতার নিদর্শন হিসেবে দেখি সেইসব জাতিগুলোরও একটা অংশ আছে যারা জাতীয়তাবাদের অন্ধ মোহে আচ্ছন্ন। অথচ এদেরও হাতে লেগে আছে মানুষের রক্ত। দুনিয়ার মূল ইতিহাসই যদি দেখি তাহলে সেটা দখলদারি আধিপত্য আর রক্তপাতেরই ইতিহাস। এই যে ফ্রেঞ্চ জাতি এত গর্ব করে নেপোলিয়ন বোনাপার্টকে নিয়ে, সেই বোনাপার্টও এককালে ধর্মকে পুঁজি করেছিল জাতীয়তাবাদ কায়েমের অস্ত্র হিসেবে। মিশর জয় করে নিজের নাম দিয়েছিল– সুলতান এল কেবির। এমনকি নামাজও পড়েছে মুসলমানদের তুষ্ট করতে! যেমন ইংল্যান্ডের রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ গিয়ে ঘানার প্রেসিডেন্টের হাত ধরে নেচে প্রশংসা কুড়িয়েছিল 'কম্যুনিস্ট' হিসেবে!

ধর্ম ব্যবহার করেনি এমন নেতা জগতে খুবই বিরল। এমনকি এককালে সোভিয়েত রাশিয়া যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সমাজতন্ত্রকে পুঁজি করে, তারাও ধর্মকে সরাতে ধর্মীয় স্থাপনা ভেঙে দিতে শুরু করেছিল। সেটাও ছিল আরেক হঠকারী সিদ্ধান্ত। ধুম করে একদিন মসজিদ ও মন্দির বন্ধ করে দিলেই কি দুনিয়া থেকে ধর্ম উচ্ছেদ হয়ে যাবে?

মানুষের মাথায় যে শতসহস্র বছরের কুসংস্কার তা কি একদিনে মুছে দেওয়া যায়?

যায় না। ধর্ম বিষ হোক আর অমৃত– ওটা ছাড়া দুনিয়ার জন্য দুনিয়ার সব মানুষ এখনও প্রস্তুত না। পশ্চিমে এসে দেখি, এরা ধর্মকে অত গুরুত্বপূর্ণ কিছু ভাবে না। কিন্তু কট্টর ধর্মান্ধরা চিরকালই কট্টর আর অন্ধ। এদেরও একটা অংশ আছে যারা 'হোয়াইট সুপ্রিমেসি'র অদ্ভুত মোহে আচ্ছন্ন। এরা ভাবে সাদা মানুষরাই সভ্য। অথচ এই ধারণার আর আচরণের সাথে ধর্মান্ধদের মতো নিজের ধর্ম ছাড়া অন্য ধর্মকে ছোট করার ধারণার ফারাক নেই। ধর্ম হোক বা অধর্ম হোক, চাপিয়ে দেওয়া যেকোনো ব্যাপারই গা ঘিনঘিনে আর মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা বিরোধী।

এক মেয়েকে পেয়েছিলাম, যার বাবা আলজিরিয়ান আর মা ফ্রেঞ্চ, সে আমাকে বলেছিল মা আর বাবার মিশ্রণে যে সূর্যের মতো গায়ের রঙ আর কোঁকড়া কালো চুল ও পেয়েছে, সেই চুল ও গায়ের রঙের বদৌলতে ওকেও নগ্ন বর্ণবাদের শিকার হতে হয়েছে এই ফ্রান্সেই। বিশেষ করে স্কুলে থাকতে সে দেখেছে সহপাঠীদেরই অন্যরূপ।

আমার নিজের চোখেই দেখা– হোয়াইট ক্রিশ্চিয়ান পুরুষ যারা, এদের অনেকেই সুপ্রিমেসি বা শ্রেষ্ঠত্বের মোহে আচ্ছন্ন। এদের কয়েকজনকে দেখেছি যৌন লিপ্সায় এরা কাতর কেবল মস্তিষ্কের ওই প্রভুত্বের কারণে। যে প্রভুত্ব ওকে কালো বা বাদামি মেয়েদের সাথে শুলে কেমন অভিজ্ঞতা হবে– সেটা ভেবে যৌনতাড়না অনুভব করায়। আমি নিজের চোখেই দেখেছি। মাত্র এক ঘন্টার পরিচয়ে সুযোগ পেয়েই আমার হাত নিজের হাতে তুলে নিয়েছে, বয়ফ্রেন্ড আর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ প্রেমের সম্পর্কে আছি জেনেও আবেগের ফুলঝুড়ি বইয়ে দিয়েছে একটু ছোঁয়ার আশায়! সুন্দর করে কথা বলায় ভেবেছে– পটিয়ে শুইয়ে ফেলা যায়!

যা-ই হোক, মূল কথায় ফিরি। এই মহামারির মধ্যেই আমি ফেসবুকে লিখেছিলাম যে, বাংলাদেশের মোহাম্মদ নাসিম নামের দুর্নীতিবাজ মন্ত্রীটি

এককালে মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন, দেশের জন্য অস্ত্র ধরেছেন এটা যেমন সত্য, সেরকম সত্য হলো— তার যুদ্ধ করার গৌরবের চেয়ে দুর্নীতির সৌরভ বেশি। রাগেই তুলনা করেছিলাম দুই মানবতাবিরোধী অপরাধীর সাথে। স্বাস্থ্যখাতে এমন দুর্নীতি করেছেন যাতে তার দুর্নীতিবাজ রূপটাই মূল রূপ হিসেবে ধরা পড়েছে, বাকি সব শূন্য। তিনি মারা গিয়েছিলেন বলে আমি আরও লিখেছিলাম— স্বাস্থ্যখাতে দুর্নীতি করলেও বিনা চিকিৎসায় মারা যাননি। জনগণের টাকায় তার চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছে।

সোশ্যাল মিডিয়া ফেসবুকে এই লেখাটা মুহূর্তেই ভাইরাল হয়ে গেল। সরকারি দলের অনেক কর্মীই আমাকে প্রকাশ্যে ধর্ষণ করার হুমকি দিতে শুরু করল। কেউ কেউ লিখল— তারা আমাকে ধর্ষণ করার পর ব্লেড দিয়ে আমার যৌনাঙ্গ কাটতে চায়!

অতীতে লেখার জন্য আমি হত্যার হুমকি পেয়েছি জঙ্গি ভাবাপন্ন, নারীর সকল স্বাধীনতার বিরুদ্ধের লোকদের কাছে। কিন্তু এদের কেউই এত অবলীলায় এবং এত তেজের সাথে প্রকাশ্যে হুমকি দেয়নি। এমনকি বাংলাদেশের ২০১৮ সালের নির্বাচনের আগে যখন আমি নিয়মিত অপরিচিত সাদা পোশাকের লোকদের দ্বারা অনুসরণের শিকার ছিলাম, পাঁচ মাসের জন্য রিপোর্ট করে আমার ফেসবুক আইডি ডিজেবল করে দেওয়া হয়েছিল, আমার ফোনে অদ্ভুত সব সার্ভার থেকে যখন ফিশিং বা স্প্যাম লিংক পাঠানো হইয়েছিল, তখনও এত প্রকাশ্যে বা জোর গলায় কেউ আমাকে এতসব ভয়ংকর হুমকি দিতে পারেনি।

এবার তারচেয়ে অনেক বেশি হলো। তথাকথিত স্বাধীনতার পক্ষের ও প্রগতিশীল বলে প্রচারিত শক্তির ওরা আমার নামে ফেসবুকে ভুয়া পেজ খুলে মিথ্যা সব নোংরা পোস্ট দিতে শুরু করল। এক ভুঁইফোড় সংগঠন আমার নামে একাধিক মামলা করার ঘোষণা দিল। আদতে মৌলবাদী থেকে প্রগতিশীল নামের তথাকথিত লোকরা কতটা স্বাধীনতায় বিশ্বাসী তার প্রমাণও হয়ে গেল!

এদিকে এই লেখার পরদিন সরকার দলেরই সমর্থক এক বড়ভাই নিঝুম মজুমদার লন্ডন থেকে কল দিয়ে জানালেন— আপা, আপনার নামে একটা মামলা হতে যাচ্ছে। আপনি জানেন কিছু?

আমি জিজ্ঞেস করলাম— আমার অপরাধ কী? তিনি বললেন— আপনি নাকি অনুভূতিতে আঘাত দিয়েছেন। আপনি বিগত স্বাস্থ্যমন্ত্রী মারা যাওয়ার পরে তার নামে যা লিখেছেন তাতে তার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে! এইসব

লিখবে ওরা মামলার এজাহারে। আপনি সম্ভব হলে বাড়ি থেকে অন্য কোথাও যান। এই মহামারির মধ্যে ধরা পড়লে আপনি জামিনও পাবেন না, কারণ কোর্ট বন্ধ অনির্দিষ্টকালের জন্য! এর মধ্যে একবার জেলে গেলে ছাড়া পাওয়া কষ্টকর হয়ে যাবে। আমি বোঝালাম– আমার এই লেখা ব্যক্তিগত প্রতিহিংসার না, স্বাস্থ্যখাতের দুর্নীতি নিয়ে সমালোচনার। একটা দেশ নিজেকে গণতান্ত্রিক দাবি করে, কিন্তু তারা সমালোচনা কেন সইতে পারবে না তাদের রাষ্ট্রীয় দুর্নীতির?

বলে রাখা ভালো নিঝুম মজুমদার আমাকে মামলার ব্যাপারে জানিয়ে সাহায্য যেমন করেছেন, মামলায় জামিন পাওয়ার পরেও নানাক্ষেত্রে সাহায্য করেছেন দেশের বাইরে আমার স্কলারশিপের বিষয়ে, অভয় দিয়েছেন। কিন্তু পরবর্তীতে ক্ষমতার সাথে নিবিড় যোগাযোগের কথা ওঠায় তার সাথে সজ্ঞানেই আমি যোগাযোগ রাখিনি নিজের নিরাপত্তার কথা ভেবে, আড়াল করেছি ঘরপোড়া গরুর সিঁদুরে মেঘ দেখে ভয় পাওয়ার রোগেই। কিন্তু তার আগে সেসময় তিনি যে সাহায্য করেছেন তা অতুলনীয়, সে আমি ভুলব না কখনো।

ওই সময় ওই মুহূর্তে আমি যোগাযোগ করলাম সুইডেনে থাকা বাংলাদেশি সাংবাদিক তাসনিম খলিলের সাথে। তিনিও একই পরামর্শ দিলেন, বললেন– পালিয়ে থাকেন আপাতত। তার কাছে আমানত হিসেবে একটা ভিডিও ফুটেজ দিয়ে রাখলাম যেখানে আমি বললাম– আমি দেশের সচেতন মানুষের সাহায্য চাইছি, যেন আমার বিরুদ্ধে বাক্স্বাধীনতা বিরোধী মামলার খবরে তারা আমার পাশে থাকেন! কারণ, কে না জানে, বাংলাদেশের আবহমানকালের ঐতিহ্যের মতোই এও সত্য– যে খবর নিয়ে আলোচনা হয় না, সেই খবর চাপা পড়ে যায় শত শত খবরের নিচে। তাসনীমের কাছে বলা ছিল– আমি যদি ধরা পড়ি তখন সে এটা ব্যবহার করবে। যদিও সেই ফুটেজ ব্যবহারের দরকারই পড়েনি।

অবশ্য তখনই তাসনীমের কাছ থেকে পরামর্শ পাই মামলার ব্যাপারে নিশ্চিত হলে ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়ার সাথে কথা বলার।

যোগাযোগ করলাম মুক্তিযুদ্ধ গবেষক আরিফ রহমানের সাথে, আরিফের সহানুভূতি বাড়তি রসদ জোগালো মনে। কথা বললাম সুইডেনে থাকা মৌলবাদীদেরই হুমকিতে থাকা নির্বাসিত ব্লগার ক্যামেলিয়া আপার সাথে। সে রাগী স্বরে বলল– দেশে বসে এইসব লিখলেতো এমন হবেই!

যেন সবাই জানত আমি বিপদে পড়ব, কিন্তু সবাই চুপ করে ছিল এক অদ্ভুত নীরবতায়।

কিন্তু সব ছাপিয়ে তখন একটাই ভাবনা– এই যে বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার পরামর্শ পেলাম, এখন কোথায় যাব?

প্রথমে গেলাম আপু মানে আমার বড়বোনের বাসায়। সে আমাকে জিজ্ঞেস করল– এত বাঘ সেজে সাহসের সাথে লেখালেখি করলি, এখন আবার ভয় পাচ্ছিস কেন?

লজ্জার মাথা খেয়ে বললাম– আমি যা লিখেছি তা মিথ্যা না। কিন্তু আমার সাথে যা হচ্ছে তা অন্যায়। এটুকু বুঝতে না পারলে আবার বুঝতে চেষ্টা করো। আমি ভয় পাচ্ছি না, কিন্তু ভয় না পেয়ে এখানে অন্য কিছু করার নেই।

সে রাগী স্বরে আর কী কী বলল তা এক কান দিয়ে ঢুকে আরেক কান দিয়ে বেরিয়ে গেল। বিপদের সময় লজ্জা–শরমেরও সম্ভবত কানে তালা লাগে!

কেবল আড়ালে ফিসফাস শুনলাম আমার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক দুলাভাই বলছে– তার বাবার নাক কাটা যাবে আমি ওই বাসায় থেকে ধরা পড়লে!

বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী ও লেখকদের মধ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ মানুষ হাসান আজিজুল হক, আমার সম্পর্কে তালই ওরফে আমার দুলাভাই ইমতিয়াজ হাসানের বাবা। তাকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'ছোটগল্পের রাজপুত্র' নামে ডাকা হয়। তার নাক কাটা যাবে সত্য কথা লেখার দায়ে অন্য একজন লেখক তার বাসা থেকে বাক্‌স্বাধীনতা বিরোধী আইনে হওয়া মামলার কারণে ধরা পড়লে?

আহা, বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের পরিবারের লোকদের মেরুদণ্ড!

আমার আফসোস হলো আমার বোনের জন্য। আফসোস হলো কারণ এমন নাক কাটা যাওয়ায় বিশ্বাসী লোকের সাথে থাকা আমার কাছে অভিশাপের মতো। কিন্তু আমি নিরুপায়। তাই কিছু বললাম না, শুনে গেলাম আর হজম করলাম। মনে মনে বললাম– একদিন নিশ্চয়ই এইসব কথার উত্তর আমি দেব!

প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি– হাসান আজিজুল হক আমার তালই, আমার বড়বোনের শ্বশুর। ব্যক্তিত্ববান মানুষ। জন্মেছেন ভারতের পশ্চিমবঙ্গে। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ রাজের সেই উপনিবেশিক কলোনির শাসন শেষে দেশভাগের সময় সপরিবারে মুসলমান হওয়ায় চলে আসতে বাধ্য হয়েছেন পুরো পরিবারের সাথে। ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের দগদগে ক্ষত জোয়ালের

মতো টেনেছেন তিনি সারাকাল। এজন্যই দেশভাগ নিয়ে তাঁর লেখাগুলো হৃদয়ে আঁচড় কাটে, চোখ ঝাপসা করে দেয়। তার সমস্ত লেখাই বুকের মধ্যে আঘাত করে, ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ যে কী জঘন্য সিদ্ধান্ত ছিল তা ভাবলে হাহাকার জাগে। তিনি তখনও জীবিত।

কিন্তু তিনি ব্যক্তিত্ববান মানুষ হলেও তাঁর মধ্যেও সমূহ দ্বিচারিতা ছিল। বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক সমালোচনা তিনি করেছেন এবং সেটা করাটা লেখক হিসেবে তাঁর গণতান্ত্রিক অধিকার। কিন্তু যেই সরকারি কিছু পুরস্কার পেলেন, সেই থেকে তাঁর মুখ বন্ধ হয়ে গেল ওই ব্যাপারে। এরপর যখন আবার নির্বাচন এলো, তিনি সমর্থন দিলেন এদের।

কেন? কারণ দলটি পরিচিত 'স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি' বলে। এই 'পক্ষের শক্তি' যে শেষ পর্যন্ত একনায়কে রূপ নেবে তা অবশ্য প্রথমদিকে আমরাও ঠাহর করতে পারিনি।

সে কথা থাক। আপুর বাসায় দুদিনের বেশি থাকা হলো না। কারণ খবর পেলাম আপুর কলোনির দারোয়ান থেকে শুরু করে আশেপাশের বাড়ির লোকেরা সবাই জানে আমি ওই বাসায় আছি। যেখানে সবাই জানে আপনি কোথায়, এমন জায়গায় কি লুকিয়ে থাকা যায়?

তাই আবারও মিনিট দশেকের রাস্তা পেরিয়ে পরদিন সত্যিই বাড়ি ছাড়লাম, পেছনে পড়ে রইল আমার জমানো হাজার হাজার বই, শখের জিনিস। আমার মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ সব। কারণ এই মোবাইল আর ল্যাপটপ ধরেই খুঁজে বের করে ফেলা যাবে আমি কোথায় আছি, কী করছি।

আপু যতই রেগে থাকুক, আমার এই বিপর্যয়ে সহানুভূতির কমতি তার ছিল না। হয়তো আমি আদরের ছোটবোন বলেই।

তখন বোধহয় সে ছয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা। দুইটা বাটন ফোন কিনে আনার পর, আপুর বাসা থেকে আমি বেরিয়ে এলাম। আমার মাকে জড়িয়ে ধরলাম। ইয়ার্কি করে বললাম— যদি পুলিশে ধরে, তাহলে বই ছাড়া জব্দ করার কিছু পাবে না! আমার মা আমার মশকরায় হেসে ফেললেন। কিন্তু সেই হাসি দিয়ে যে দুশ্চিন্তায় দিন পার করছেন তা গোপন করতে পারলেন না।

মেয়েরা বোধ করি অতি বিচিত্র। এই বিচিত্রতায় ভর দিয়েই আমার ঘর ছাড়ার স্মৃতির বেদনাময় মধুর একটা উপলক্ষ্য খুঁজে পেলাম! আমার ঘর ছাড়ার স্মৃতির রোমান্টিক দিক এই যে মহামারিতে আক্রান্ত জনপদে মাস্কের আড়ালে আমার চেহারা কেউ দেখবে না জেনেও আমি মোটা করে কাজল

পরলাম, ঠোঁটে লাল টকটকে লিপস্টিক দিলাম। আমার মুখ ঢেকে গেল ফেসমাস্ক নামের নীলসাদা মুখোশে। আমি অবচেতনে ওই অবস্থায় কল্পনা করলাম যদি ইতোমধ্যেই পুলিশ এসে আমার ঘরের দরজায় দাঁড়ায় তাহলে দেখবে প্রথম অভিসারে যাওয়ার আগে লাজুক প্রেমিকার বেশে কাজল আর লিপস্টিক পরা আসামী উপস্থিত!

কিন্তু তখনও প্রত্যেক সত্য বলা অহংকারী লোকের মতো আমার বিশ্বাস আমার হৃদয় থেকে ঠিকরে বের হওয়া আলো রুখতে পারার ক্ষমতা ওই মাস্কের কখনোই ছিল না!

প্রথমে যখন ঘর ছেড়েছিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যাওয়ার জন্য, রাজশাহী নামের মফস্‌সল ছেড়ে ঢাকার বাসে উঠেছিলাম, তখন জানতাম– আর ঘরে ফেরা হবে না ঠিকভাবে। কিন্তু মহামারিতে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনির্দিষ্টকালের ছুটিতে আসার পর দ্বিতীয়বার সেই যে আমি ঘর ছাড়লাম, আর ঘরে ফেরা হলো না। আমি জানলাম– দুনিয়ার ঘরছাড়া মানুষের পক্ষে যাকে লিখতে হয়, তাকেও তার ঘর ছেড়েই বঞ্চিতের কাতারে দাঁড়াতে হয়। ঘরহীন আমি চললাম নিরুদ্দেশের পথে, অন্য আরেক আশ্রয় খুঁজতে। জানলাম ঘর বলে যা আমরা জানি, একটা ঘর বানাতে মধ্যবিত্ত লোকরা যে পরিশ্রম করি, এ সব যে গর্ব করি তা আসলে এতই ঠুনকো যে, সামান্য একটা প্রতিবাদের লেখার পর সেটা হারিয়ে ফেলা যায় নিমেষেই, চিরতরে!

দেশ–কাল–পাত্র

ফ্রেঞ্চ ভাষায় আমার শেখা প্রথম শব্দ– লিবার্তে। লিবার্তে শব্দের অর্থ স্বাধীনতা। ফ্রান্সের বিখ্যাত কবি পল এলুয়ারের কবিতা লিবার্তে। ওই কবিতার প্রতিটি লাইনই আমার বুকের মধ্যে বাজে। ফ্রান্সে বসে কিছুটা অনুবাদও করেছি বাংলায়। সেই লাইনগুলোও ক্ষণে ক্ষণেই মনের মধ্যে শিহরন জাগায়, আঁচড় কাটে হৃদয়ে–

এবং একটি শব্দের জন্য,
আমি আবার শুরু করেছি আমার জীবন
তোমাকে জানার জন্যই আমার জন্ম
তোমাকে সম্বোধন করতে– হে স্বাধীনতা!
(And for the power of a word
I restart my life
I was born to know you,
To call you– Freedom!)

মজার ব্যাপার হলো– ফ্রেঞ্চ ভাষায় 'লিবার্তে' শব্দটা আমি শিখি বাংলাদেশে বসে। দেশে থাকতে ২০১৯ সালের দিকে যে ফ্রেঞ্চ আলজিরিয়ান ছেলের সাথে সামান্য সখ্যতা গড়ে উঠেছিল ইন্টারনেটের সুবাদে, জেনেছিলাম তার আলজিরিয়ান বাবা তাকে আদর করে ডাকতেন– লিবার্তে!

যদিও তার সেই নাম নিয়ে সে বিন্দুমাত্র আগ্রহী ছিল না। বরং আগ্রহী ছিল সে আমাকে নিয়ে কবে ন্যুড বিচে যাবে, কবে সাঁতারের জন্য পিংক কালারের বিকিনি কিনে দেবে, নীল রঙের কাজল আমার শ্যামলা চোখে কেমন দেখাবে!

আমি তো ভাবতাম– মজা করছে, ইন্টারনেটের জামানায় এমন মনোহর কথা অনেকেই বলে থাকে। এসব ফ্যান্টাসি, বাস্তব না।

কিন্তু না, আমাকে চমকে দিয়ে সে একদিন সোনারগাঁও হোটেলের স্যুট বুক করে ফেলল! আর আমি ভাবলাম– এই রে, সেরেছে! এরপর সে আমাকে জিজ্ঞেস করল আমার বাবা–মাকে দামি উপহার দিলে তারা খুশি হবে কি না!

এই চমৎকার ফাজলামো আর ইয়ার্কির সম্পর্কের সমাপ্তি ঘটল যখন সে আমাকে বিয়ে করতে চাইল এবং দুবাইয়ে তার দামি বাড়ি, দামি স্পোর্টস কারের ছবি দেখিয়ে আমাকে বশীভূত করতে চাইল। কিছু কথাবার্তা শেষে আমি বুঝলাম– যাকে হালকা এক নিছক ইয়ার্কিময় বন্ধুত্ব ভেবেছি, সে একে অনেকদূর অবধি ভেবেছে। ভাবা দোষের না। কিন্তু এরপর এক ঘটনায় আমার চোখ খুলে গেল। যদিও সে ঘটনা সামান্যই।

একদিন সে জানাল– আরেকটি নতুন গাড়ি কিনেছে। আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম– এ তবে তোমার নতুন প্রেমিকা!

আজও আমি জানি না সে এমন রেগেছিল কেন। কিন্তু সে বারবার বলতে থাকল– সাতাশ বছর বয়সে যখন সে তার প্রথম স্ত্রীকে বিয়ে করেছিল তখন সেও নাকি এমন কথাই বলেছিল। সে নাকি ওকে টাকার লোভেই বিয়ে করেছিল... ইত্যাদি। আমি বোবা হয়ে গেলাম এহেন কথায় আর হঠাৎ রাগের আকস্মিকতায়।

অনেক কষ্টে শান্ত করলাম তাকে মনোহর সব কথা বলে। কিন্তু যখন জিজ্ঞেস করলাম– আচ্ছা, বিয়ে না হয় করলে, কিন্তু এরপর আমি কী করব?

সে বলল– তোমাকে কিচ্ছু করতে হবে না!

–কেন?

–কারণ আমার এত টাকা আছে যে তুমি গুনে শেষ করতে পারবেনা।

–কিন্তু আমি যে লেখাপড়া করছি, সেই পড়ালেখার কী হবে?

–তুমি আমার সাথে দুনিয়াজোড়া ঘুরবে, নানান শহর দেখবে। তুমি না বলেছ তুমি ঘুরতে ভালোবাস?

–আমি বললাম, বাসি, কিন্তু সেখানে ঘোরাঘুরিতে আমার কন্ট্রিবিউশান থাকতে হবে। থাকতে হবে সমান অধিকার।

সে বলল– কাম অন্! সবখানে ফেমিনিজম দেখালে হবে? আমাকে সঙ্গ দেওয়াই হবে তোমার কন্ট্রিবিউশান!

আহা! সে যদি বুঝত– এমন হতচ্ছাড়া কন্ট্রিবিউশানের জীবন আমি বোধবুদ্ধি হওয়ার পর থেকে কেমন ঘেন্না করি!

আর কয়দিনের কথা বলায় আমার কাছে যা স্পষ্ট হয়ে উঠল তা হলো– সে মূলত ভাবছে বাংলাদেশ নামের একটা গরিব দেশের মেয়ে তার সাথে

এমন সুন্দর করে কথা বলছে কারণ ওরা গরিব, ওদের জন্য ইউরোপ–আমেরিকা মানে বিশাল ঘটনা! আর তার আছে টাকা। ফলে খুব সহজেই বশীভূত করা যাবে! কিন্তু তার মিথ্যা ধারণাকে ভেঙে দিয়ে বিদায় জানালাম তাকে। সে হতবিহ্বল হয়ে কী করবে তা বুঝতে না পেরে ক্ষান্ত দিল।

কিন্তু সেকথা থাক। মূল কথায় ফিরি। ২০২০ সালের ১৩ জুন বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতের দুর্নীতি নিয়ে লেখায় ১৭ জুন আমার নামে মামলা দায়ের করলেন আওয়ামী লীগ নামের ক্ষমতাসীন দলের এক সদস্য, যার নাম– জোবায়ের রুবন। সে তখন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সহকারী। জানলাম আমার বিরুদ্ধে যেসব ধারায় মামলা হয়েছে সেগুলো হলো– অনুভূতিতে আঘাত, রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করা, জনমনে বিভ্রান্তি চালানোর চেষ্টা করা।

এই লোকটির সাথে আমার পরবর্তীতে আদালতে যখন দেখা হয়েছিল তখন কেমন একটা করুণা মিশ্রিত অবজ্ঞা টের পেয়েছিলাম এই লোকটির প্রতি। এই ধরনের বায়াসড লোকদের ঘৃণা করাও যায় না। এত ছোট গণ্ডিবদ্ধ চিন্তার মানুষ, যে এদের ওপর রাগা আর একখানা বই পড়ে নিজেকে মহাজ্ঞানী ভাবা লোকদের ওপর রাগাটা প্রায় একই। যার হাতে পড়েছে ক্ষমতা নামক হাতিয়ার। একটা ক্ষমতাকেন্দ্রিক ব্যবস্থা মূলত এভাবেই টিকে থাকে। যারা দ্বিমত হচ্ছে তাদের ভয় দেখিয়ে, মামলা দিয়ে কিংবা উধাও করে দিয়ে!

দেশে গুম হওয়া অসংখ্য লোককে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি, তাদের একটিই মিল, তারা সবাই বিরুদ্ধে ছিল কিংবা তারা নিজেদের মতামত দিতে গিয়েছিল।

অবশ্য এরই মধ্যে ততদিনে এই লোকটি আমার পরিবারের কয়েক সদস্যের কাছে মামলা তুলে নেবে এই শর্তে আমার কথা ও লেখা প্রত্যাহার করে নিচ্ছি এমন 'মুচলেকা' দিতে বাধ্য করেছে আমার পরিবারের সদস্যদের। আমার পরিবারের সদস্যরা আমার প্রাণের ভয়ে (আমার সাথে খারাপ কিছু ঘটতে পারে আশঙ্কায়) এই লোকটি যা বলেছে সেটাই শুনেছে, সহজ কথায় আপস করেছে। কারণ ওখানে এই মুহূর্তে আপস ছাড়া আর কোনো রাস্তা খোলা নেই।

আর এদিকে আমি কাটাচ্ছিলাম সম্পূর্ণ ভিন্ন পলাতক আসামি জীবন। সেইযে মামলা হয়েছে জেনে বের হলাম নিরুদ্দেশের যাত্রায়, এরপর একে একে ঘুরলাম আমার গ্রামের আত্মীয়দের বাড়ি। কোথাও এক মাস, কোথাও দুই মাস করে কেটে গেল চার চারটি পলাতক থাকার মাস। এরই মধ্যে

একদিন আমার গ্রামের আত্মীয়ের বাড়িতে বসেই তার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে আবিষ্কার করেছিলাম ক্ষমা চাওয়ার মুচলেকাটি পোস্ট করা হয়েছে আমার প্রোফাইল থেকে।

সেই মুহূর্তে মনে হলো– আমার মেরুদণ্ডটা কেউ একজন খুলে নিয়েছে নিজের হাতে। সারারাত কাঁদলাম আর চোখের পানি মুছলাম। আমার দূর সম্পর্কের বোনের ছোট মেয়েটি আমার চোখের পানি মুছিয়ে দিতে দিতে বলল– কাইন্দো না খালামণি, একদিন এর বিচার তুমি পাবাই!

আহা, এই গ্রামের প্যাঁচ–ঘোঁজ না বোঝা সরল কিশোরী যদি জানত– যারা আমার বিচার করবে, তাদের রূপটা কেমন! আমার বুক থেকে গভীর গভীর দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো।

সেদিনই ওর মা, আমার মফস্‌সলী চাচাতো বোন বাজার থেকে কাপড় কিনে এনে বোরখা বানিয়ে দিল। আর করোনার কারণে বোরখার সাথে থাকা মুখ ঢেকে রাখার নিকাবের বদলে মাস্ক পরলেই চলে। সে বলে– সাবধানের মাইর নাই, কেউ যদি চিন্যা ফালায়?

আসলেই তো! রাষ্ট্রের চোখে আমি বিশাল অপরাধী। আমার ঘাড়ে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ। কেউ বুঝতে পারে না বোরখার আড়ালে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের একজন দেশদ্রোহী লেখক ঘুরে বেড়াচ্ছে মামলার কারণে গ্রেপ্তার এড়াতে!

এদিকে বোরখা পরে আমি নিজেকে চিনতে পারি না। অপমানে আমার মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছা করে।

এই পোশাক যে রাজনৈতিক চরিত্র বহন করে চলেছে, যে কারণে গ্রামেগঞ্জে ফতোয়া দেওয়া ভণ্ড হুজুর আর ধর্মবিক্রেতারা ব্যাঙের ছাতার মতো ওয়াজ মহফিলে নারীর শরীরকে বারবার অপবিত্র জ্ঞান করে ফতোয়া দিচ্ছে, নারীর শরীরকে নিষিদ্ধ, নারীশিক্ষাকে হারাম বলে ঘোষণা করছে, সেই পোশাক পরতে হচ্ছে আমাকে? হায়রে কপাল! হায়রে দেশ! হায়রে সমাজ!

আমি যে কার ব্যাপারে কী বলব তা ঠাহর করতে পারি না। যেন আমি চিরকালের মতো বোবা হয়ে গিয়েছি!

এদিকে সেসময় রাতে ঘুমাতে পারি না।

মনে হয় মাথার পেছনে দাঁড়িয়ে কেউ একজন গরম নিঃশ্বাস ফেলছে। মাঝেমধ্যে মনে হয় মাটি ফাঁক হয়ে যাক আর আমি টুপ করে কবরের এত এক প্রকোষ্ঠে ঢুকে পড়ি চিরকালের জন্য! আমার নিজেকে অচ্ছুত লাগে, বিতৃষ্ণা হয়। আমার মন আঁকুপাঁকু করে আমার এই কষ্টের কথা লিখে পৃথিবীবাসীকে জানিয়ে দিতে। কিন্তু সেই সুযোগ কই?

পৃথিবী তখন আমার কাছে ভীষণ সংকুচিত। সেই পৃথিবীতে এই আমি আয়নার সামনে দাঁড়ালে তখন দেখি আপস করার পাপোশের ওপর দাঁড়ানো একজন মেয়েকে। এই মেয়ে মরমে মরে যায়, শরমে পড়ে যায়। এই মেয়ে মাঝে মাঝে আত্মহত্যার উপায়গুলো ভাবার চেষ্টা করে, এই মেয়ে ভাবার চেষ্টা করে মরে যাওয়াটা কেমন হবে তার জন্য! নিজেকে তার জীবন্ত লাশ মনে হয়।

একে একে মনে পড়ে অনেকের কথা। যেসব ধর্ষণের শিকার ধর্ষিতার সাথে পরিচিত হয়েছিলাম, যাদের আশ্বাস আর সাহস দিয়েছিলাম, যাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলাম– মনে হয় আমি তাদের চেয়ে দশগুণ ধর্ষিত, তাদের চেয়ে তিনগুণ মৃত, পাঁচগুণ উদ্বাস্তু। নিজেকে সাহস দিতে ব্যাগে করে আনা বইগুলো খুলে খুলে পড়ি– পড়ি বাংলা ভাষায় লেখা হুমায়ুন আজাদের লেখা 'মানুষ হিসেবে আমার অপরাধ সমূহ' নামের উপন্যাস, পড়ি সাদাত হাসান মান্টোর লেখা জাভেদ হুসেনের অনুবাদ করা 'কালো সীমানা', পড়ি দস্তয়ভস্কির লেখা 'নোটস ফরম আন্ডারগ্রাউন্ড'। আমার নিজেকে প্রায়ই দেশভাগের পরে দেশ ছাড়তে বাধ্য হওয়া মান্টো, রসহ্যজনকভাবে জার্মানিতে লেখার টেবিলের ওপর মৃত হুমায়ুন আজাদ বা ফায়ারিং স্কোয়াডে দাঁড় করিয়ে রাখা দস্তয়ভস্কি বলে মনে হয় তখন।

আমার প্রিয় লেখক ফিওদর দস্তয়ভস্কিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তাঁর নিজের প্রিয় দার্শনিক মিখাইল পেট্রসেভাস্কির বাসা থেকে। এদের সবার বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগ ছিল এই যে– এরা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হোক বলে চেয়েছিল। দস্তয়ভস্কিকে আটকে রাখা হয় সেন্ট পিটার্সবার্গের পিটার অ্যান্ড পলস দুর্গে। আর তিনি 'ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও যে ধান ভানে', সেই কথা রাখতেই এই চরম দশায় লিখে ফেলেন উপন্যাস 'এ লিটল হিরো'।

রাশিয়ার তখনকার রাজতন্ত্র আর জারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অপরাধে ওই বছরই ডিসেম্বর মাসে বাইশ তারিখে তাঁকে বেঁধে ফেলা হয়। কিন্তু ফায়ার করার কিছুক্ষণ আগে জানা যায় স্বয়ং জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার মৃত্যুদণ্ড বাতিল করে এর পরিবর্তে সাইবেরিয়াতে নির্বাসন দিয়েছে তাঁকে! দস্তয়ভস্কি এই নির্বাসন নিয়ে লিখেছেন– এই নির্বাসন ছিল একটা কফিনের মধ্যে ভরে জীবন্ত কবর দেওয়ার মতো!

দস্তয়ভস্কির মতোন আমারও পালিয়ে থাকাকালে প্রায় প্রতিদিনই মনে হতো– আমাকেও কেউ জীবন্ত কবর দিয়েছে! মায়ের সাথে, প্রেমিকের সাথে যোগাযোগ করলে পুলিশের নজরদারির কারণে লোকেশন ধরা পড়বে বলে কলও দিতে পারতাম না কাউকে। কিন্তু নিজের সাথে নিজে কতক্ষণ কথা বলা যায়?

তাই ওই অবস্থায়ই লিখতে শুরু করি বাংলাদেশে বসে আমার লেখা শেষ বই– পাপ বিষয়ক পাপেট শো। এই গল্পগুলো লিখতে গিয়ে কান্না পায়, দম বন্ধ লাগে। কান্না গিলে শক্ত হওয়ার চেষ্টা করি, গিয়ে জানালার পাশের গাছগুলোকে দেখি। মনে হয়– গাছেদেরও সঙ্গী আছে, এরা নিজেদের সাথে কথা বলে! কিন্তু আমার বুঝি পুরো দুনিয়ায়ই কেউ নেই!

এই আতঙ্ক ও অনিদ্রায় মাখামাখি হয়ে এর মধ্যেই জানতে পারি, বাংলাদেশের আরেক কার্টুনিস্ট কিশোর আর লেখক মোশতাক আহমেদকে সরকার বিরোধী কার্টুন আঁকায় আর ফেসবুকে শেয়ার করায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মাঝে মাঝে যাদের বাড়িতে আছি, তাদের কাছ থেকে উড়ো খবর পাই যে ওরা তখনও জেলে দিন কাটাচ্ছে। তখন আমার এই পলাতক দশাকে অভিশাপ বলে মনে হয়, মনে হয়– আমারও তো জেলে থাকার কথা!

জেলের বাইরে থাকাই তখন আমার কাছে অপরাধ বলে মনে হতে থাকে।

অথচ সেই ২০১৩ সালে শাহবাগ আন্দোলনের সময় কি আমরা জানতাম– এই দিন আমাদের দেখতে হবে?

বাংলাদেশে যে দুটি প্রধান দল, সে দুটির একটি আওয়ামী লীগ এবং অন্যটি বিএনপি। তুলনামূলক সেকুলার দল ছিল আওয়ামী লীগ। আর বিএনপি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়কার কুখ্যাত যুদ্ধাপরাধীদের সাথে জোট বেধে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়কার রাজাকার–আলবদর যারা কি না সরাসরি ধর্ষণ, হত্যা, লুণ্ঠনে যুক্ত ছিল তাদেরই মন্ত্রী বানিয়েছিল। ২০০৮ সালের নির্বাচনে তাই আওয়ামী লীগ সরকারের নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি ছিল তারা মুক্তিযুদ্ধের সময়কার মানবতাবিরোধী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করবে।

কিন্তু ২০১৩ সালেই দেখা গেল বিচার করার কথা বলে প্রথম যে রায় হলো সেখানে যুদ্ধাপরাধী কাদের মোল্লা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা পেল। এই সাজা পাওয়ার পর কাদের মোল্লা নিজের সর্বনাশ অবশ্য নিজেই করল। কারণ প্রথম আলো পত্রিকায় সেই রায়ের সংবাদের পাশে কাদের মোল্লার ভিক্টরি চিহ্নিত আঙুল সহ হাসিমুখের ছবি ছাপা হলো। সারাদেশের যে তরুণরা ভোটের সময় আওয়ামীলীগকে সমর্থন করেছিল তারা ক্ষোভে ফেটে পড়ল, কারণ কাদের মোল্লার আঙুলের 'ভিক্টরি সাইন' প্রমাণ করে তার সাজা হবে না। সে জানে পরের সরকার হিসেবে বিএনপি দেশের ক্ষমতায় এলেই সে হয়ে উঠবে বিএনপির শীর্ষস্থানীয় নেতা, মন্ত্রী বা এমপি। বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি এমনই জঘন্য আর চরিত্রহীন।

ফলে অসংখ্য তরুণ আবার নতুন করে বিচারের রায়ের জন্য রাস্তায় নেমে এলো। আর তাছাড়া বাংলাদেশে যেকোনো অপরাধীর সর্বোচ্চ সাজা মৃত্যুদণ্ড। এমনকি এই মৃত্যুদণ্ড আমি একসময় সমর্থন করতাম বলে এখন লজ্জিত হই। কিন্তু তখন হতাম না। তবে এখনও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে 'যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা' পাওয়া মানে মূলত ছাড়া পাওয়া। আর তখন একাত্তরের যুদ্ধে মানবতাবিরোধী রাজাকারদের ফাঁসির দাবিই বড় দাবি। সেই আন্দোলনে আমিও শামিল হই।

তবে এখন আমার ভাবনা বদলেছে মৃত্যুদণ্ডের ব্যাপারে। আমার মতে মৃত্যুদণ্ড মূলত ভয়ংকর অপরাধীকে বাঁচিয়ে দেওয়া। মৃত্যু কার্যকর হতে যে তিন–চার মিনিট লাগবে, সেই সময়ে কি এই ভয়ংকর মানবতাবিরোধী অপরাধীরা কেউ বুঝতে পারবে– কী জঘন্য অপরাধ তারা করেছে? তারা অনুশোচনায় ভুগবে?

অবশ্য অপরাধ আর সাজার পুরো ব্যাপারটাই আমার অদ্ভুত লাগে। যেমন ধরা যাক যখন দুশো বছর আগে অবিভক্ত ভারতবর্ষে একজন বিদ্রোহীকে সাজা দেওয়া হয়েছিল, সেও খুব হিরো হয়ে গিয়েছিল। ব্রিটিশদের কলোনিবিরোধী সেই বিপ্লবীর নাম ছিল ক্ষুদিরাম বসু। ক্ষুদিরামের বিচার শেষে মৃত্যুদণ্ডের আগে তার শেষ ইচ্ছা জানতে চাওয়ার পরে সে বলেছিল– ভারতবাসীকে সে বোমা বানানোর উপায় শিখিয়ে দিতে চায়! এই ক্ষুদিরাম যা চেয়েছিল, সেটাই কি মানবতার পক্ষের?

উত্তরটা অস্বস্তিকর হলেও– না! কিন্তু আবার এও সত্য, নৈরাজ্যবাদ ছাড়া শান্তি প্রতিষ্ঠার উপায় জগতে এখনও আবিষ্কার হয়নি!

এখনও যেকোনো ফ্যাসিস্ট কলোনিয়াল রাষ্ট্রের কাছে যেহেতু ভিন্নমতের মানুষরা শত্রু, সেহেতু যুগে যুগে কালে কালে আমাদের অনেককেই দেশ ছাড়তে হয়েছে কেবল এই কারণে যে আমরা শাসকদের পায়ে ফুল দেইনি, ক্রীতদাস হয়ে যাইনি সামান্য সুযোগ–সুবিধা পেলেই! আমরা তো শেষ পর্যন্ত নৈরাজ্যই প্রতিষ্ঠা করছি!

মূল কথায় ফিরে আসি, ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রাজশাহী নামক শহরটিতে, ধর্মান্ধ মৌলবাদী দল জামাত শিবিরের ঘাঁটিতে আমরা যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে স্বাক্ষর গ্রহণ করি। জামায়াত ও শিবির দুটো মূলত একটিই দল, যেটি বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগে থেকেই একই রাজনৈতিক চরিত্র বহন করে চলেছে, এরা চেয়েছে দেশ হবে ধর্মভিত্তিক, দেশের আইনও হবে সেই ধর্মের অনুসারী। নারী মানেই হবে অচ্ছুত আর

অপবিত্র। ঠিক যেমনটা আছে পাকিস্তানে, ঠিক যেমনটা আছেন ইরাক, ইরান, সিরিয়া কিংবা আফগানিস্তানে।

যা-ই হোক, যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে এই সমাবেশে নানান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ যুদ্ধাপরাধের সুষ্ঠু বিচারের দাবিতে আসেন। সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট নামের সরকারপন্থি সংগঠনটির লোকরা যে মাইক্রোফোন এনেছিল তাতে আমি পুরো অনুষ্ঠানটির উপস্থাপনা করি। স্লোগান দেই— যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চাই, করতে হবে।

আমার ফেসবুকে, প্রকাশ্যে নামে ও বেনামে গালাগাল আসতে থাকে। আমাকে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়। মাঝেমধ্যে অকস্মাৎ অনুষ্ঠানের মধ্যে ককটেল নামক ছোট ছোট বোমা ফুটতে দেখি। অবশ্য কয়েকদিনে এসবও গা সওয়া হয়ে যায়। কারণ মনের একদম ভেতর থেকে জানি— যারা তোমাকে ভয় পায়, তারাই মূলত তোমাকে ভয় দেখাতে চায়।

এর মাঝে একদিন ঢাকা যাই। গিয়ে সেখানে শাহবাগ আন্দোলনে যোগ দেই। মাহমুদুল হক মুন্সী, ডাকনাম বাঁধন নামের এক ভাইয়ের হাত থেকে পিজি হাসপাতালের নিচ থেকে এক বস্তা লিফলেট বয়ে আনি, যেখানে লেখা আছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী চক্র জামায়াতের ফান্ড আসে কোন সব প্রতিষ্ঠান থেকে। তাদের বয়কট করার ডাক দেওয়া হয়। দেশজুড়ে আন্দোলন চলতে থাকে যুদ্ধাপরাধীদের সুষ্ঠু বিচারের দাবিতে, এই দাবির বিরোধীরাও সোচ্চার হয়। তাদেরও একটা বড় অংশের সমর্থন আছে এই বিচারের বিরোধিতায়।

এদিকে এই আন্দোলন যখন চলছে তখন মিশরের তাহরীর স্কয়ারে চলছে আরেক ফ্যাসিস্ট বিরোধী আন্দোলন। সেই আন্দোলন এই আন্দোলনকেও সাহস জোগাচ্ছে। যেন চারদিকে একটা জাগরণ চলছে ঘুম থেকে ডেকে তোলার। মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার।

জার্মানিতে ন্যুরেমবার্গ ট্রায়াল নামের যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের সময় যেমন যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হয়েছিল, তেমন একটা বিচারের জন্য আমরা তখন সবাই অধীর অপেক্ষায় বসে আছি।

প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো, বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রাম মুক্তিযুদ্ধের সময় আমার চাচারা সবাই মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। আমার বড় খালু মো. আব্দুর রাজ্জাকও মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। তিনি সরাসরি যুদ্ধের সময় ভারত থেকে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। তিনি তখন বাম দল করতেন। সেসময় তিনি

ছিলেন একটি জাতীয় পত্রিকার সাংবাদিক। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তিনি হারিয়েছেন দুই কন্যাকে। সহকর্মীদের মধ্যে হারিয়েছে সাংবাদিক মেহেরুন্নেসাকে। যুদ্ধাপরাধী রাজাকার কাদের মোল্লার সুস্পষ্ট নির্দেশে মেহেরুন্নেসাকে হত্যা করার পর সিলিংফ্যানের সাথে তার মাথা ঝুলিয়ে দেওয়া হয় সেসময়। সহযোদ্ধাদেরও হারিয়েছেন আমার খালু দেদারসে। সেইসব দুঃসহ স্মৃতি যে শুনেছে সে কেমন করে শান্ত থাকবে?

বাংলাদেশের মাটিতে যে ত্রিশ লাখ মানুষের রক্ত মিশে আছে, সেটাই বা কেমন করে ভুলে যাওয়া যায়?

পরবর্তীতে আমি আমার মায়ের যুদ্ধকালীন স্মৃতি নিয়ে লিখি আমার প্রথম শিশুতোষ গল্পের বই— বাংলাদেশ নামটি যেভাবে হলো। এই বইয়ের জন্য পরে ২০১৪ সালে ইউনিসেফ থেকে মীনা মিডিয়া এওয়ার্ডও পাই সৃজনশীল লেখা বিভাগে। ধারাবাহিকভাবে লিখি আমাদের যুদ্ধ করা নারী মুক্তিযোদ্ধাদের কথা, আমাদের যুদ্ধ শিশুদের কথা।

সেকথা থাক। এই যে শাহবাগ আন্দোলন চলছিল, এরমধ্যেই একদিন সকালে উঠে শুনি রাজীব হায়দার নামের একজন পরিচিত ব্লগার ও অ্যাক্টিভিস্টকে কুপিয়ে মারা হয়েছে। তিনি যেহেতু শাহবাগে গড়ে ওঠা এই আন্দোলনকে নানাভাবে সমর্থন জুগিয়েছিলেন তাই ইসলামের ফতোয়া দেওয়া বেশকিছু ইসলামি দল চারদিকে, মসজিদে মসজিদে লিফলেট বিলাতে থাকে— শাহবাগ আন্দোলন হলো নাস্তিকদের মঞ্চ। প্রোপাগাণ্ডা ছড়িয়ে পড়ে— যারা নাস্তিকদের হত্যা করবে তারা সরাসরি বেহেশতে যাবে!

শুক্রবার জুম্মার নামাজের সময় তাই নাস্তিকদের ব্যাপারে এইসব ফতোয়া, গালাগাল আর বিদ্বেষ ছড়ানো হতে থাকে। বাঙালি ধর্মান্ধ মুসলমানের আসল রূপ ভয়াবহ। নাস্তিকতার এইসব কথা ম্যাজিকের মতো কাজ করে। এরা বাঙালি সংস্কৃতির কথা বলবে ঠিকই, নাচ—গান করবে, কিন্তু ধর্ম আর সংস্কৃতি যখন একত্রে সামনে এসে দাঁড়াবে তখন ৯৯ ভাগই বেছে নেবে ধর্মকে। ধর্মের রূপটা যেহেতু বিশ্বাসের, সেই রূপকে টলাতে হলে যে পরিমাণ শিক্ষার চর্চার দরকার তা ওই উপমহাদেশেই কখনো ছিল না।

ফলে নাস্তিকতার অভিযোগটা খুবই কাজে লাগে। বাঙালি ধর্মান্ধ গোষ্ঠী তাদের এত করে ধর্ম রক্ষার্থে উঠেপড়ে লাগে। প্রগতিশীল অংশ যেহেতু মেজরিটি নয়, আবার প্রগতিশীল হলেও ক্ষমতার পায়ে তেল মালিশ করা একদল বড় সংখ্যক সরকারি প্রগতিশীল নামের ভাঁড় যেহেতু ভালোভাবেই ছিল, ধর্মের প্রশ্নে সেসব প্রগতিশীলরা অনেকে দোটানায় পড়ে চুপ করে

থাকে। মেজরিটির মনে আঘাত দেবে, ধর্মের প্রতিক্রিয়াশীলতা নিয়ে কথা বলবে, ওই মেরুদণ্ডই কি বেশির ভাগের আছে?

না, নেই। আর নেই বলেই শাহবাগ আন্দোলন ভেঙে যেতে থাকে। এদিকে নতুন এক ইসলামী লেবাসধারী দলের আবির্ভাব হয় বাংলাদেশে, দলটির নাম– হেফাজতে ইসলাম।

এরা নিজেদের ইসলামের হেফাজতকারী পরিচয় দেয়। এরা ৫ই মে মাদ্রাসা থেকে আনা ছাত্রদের নিয়ে এক সম্মেলন করে রাজধানীর মতিঝিলের শাপলা চত্বরে, সেই সম্মেলনের উদ্দেশ্য হলো– যেকোনো ইসলামবিরোধী কাজ তারা কঠোর হস্তে দমন করবে। ৯০ ভাগ মুসলমানের দেশ বাংলাদেশে ইসলামবিরোধী কথা কেউ বলতে পারবে না। হেফাজতের আমির শফি হুজুর মেয়েদের খাদ্যবস্তুর এত মুখে লালা জমা হওয়ার কথা বলে তেঁতুলের সাথে তুলনা করে বিবৃতি দিলে সংসদে এটা নিয়ে সমালোচনা করে ভর্ৎসনা করেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আবার অন্যদিকে মর্ডারেট মুসলমানের মতো এও বলেন– ইসলামের বিরুদ্ধে কিছু বলা যাবে না, মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেওয়া যাবে না!

না, রাজনীতিতে অপরিপক্ব তরুণেরা সেসময়কে বুঝতে শেখেনি তখনও। তাই আমরা জানতাম না, তিনিই কখনো হেফাজতের মতো নারীদের তেঁতুল ডাকা দলটির প্রধান মুখপাত্র আল্লামা শফীর সাথে যোগ দেবেন তৌহিদী ধর্মান্ধ জনগণে ভরা জনসভায়। কাওমি মাদ্রাসার জন্য বিশাল অঙ্কের টাকা বরাদ্দ দেবেন। উনার নাম হয়ে উঠবে– কাওমি জননী! এসবের কিছুরই আলামত তখন দেখা যায়নি। বরং হেফাজতের ২০১৩ সালের ৫ই মে'র এই সমাবেশে একজন নারী সাংবাদিককে লাঞ্ছনার শিকারও হতে হয়, তার নাম নাদিয়া শারমিন। তাঁর অপরাধ ছিল একটিই– মেয়ে হয়ে তিনি কেন পুরুষে ভরা সমাবেশে গেলেন!

অবশ্য মার লাঞ্ছিত ও অপমানিত হওয়ার পর তিনি সেই বছর সাংবাদিকতায় সাহসিকতার কারণে বেশকিছু আন্তর্জাতিক পুরস্কারও পান। কিন্তু ওটুকুই। ঢাকা পড়ে যায় তার সাহসিকতা। যথারীতি বেরিয়ে আসে ধর্মীয় রাজনীতির কলুষিত মুখ।

হেফাজতের এই সমাবেশে কিছু দাবিও জানানো হয়। সেই দাবিগুলো যেমন ছিল নারীবিদ্বেষী, তেমনই ভয়ংকর মধ্যযুগীয় ও বর্বর। দাবিগুলো হলো–

১. সংবিধানে আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস পুনস্থাপন এবং কোরআন ও সুন্নাহবিরোধী সকল আইন বাতিল করা।

২. ধর্মের অবমাননা এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুৎসা রোধে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের বিধান রেখে জাতীয় সংসদে আইন পাশ।
৩. কথিত শাহবাগ আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী স্বঘোষিত নাস্তিক–মুরতাদ এবং নবি হজরত মুহম্মদ (সা.)–এর নামে জঘন্য কুৎসা রটনাকারী ব্লগার ও ইসলামবিদ্বেষীদের সব অপপ্রচার বন্ধসহ কঠোর শাস্তিদানের ব্যবস্থা করা।
৪. ব্যক্তি ও বাক্স্বাধীনতার নামে সব বেহায়াপনা, ইসলামের দৃষ্টিতে অনাচার, ব্যভিচার, প্রকাশ্যে নারী–পুরুষের অবাধ বিচরণ, মোমবাতি প্রজ্বলন সহ সবধরনের সংস্কৃতিক অনুপ্রবেশ বন্ধ করা।
৫. ধর্মবিরোধী নারীনীতি, ধর্মহীন শিক্ষানীতি বাতিল করে শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে উচ্চমাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত ইসলাম শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা।
৬. সরকারিভাবে কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা করা এবং তাদের প্রচারণা ও ষড়যন্ত্রের সব অপতৎপরতা বন্ধ করা।
৭. মসজিদের নগর ঢাকাকে মূর্তির নগরে রূপান্তর এবং দেশব্যাপী রাস্তার মোড়ে ও কলেজ–বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাস্কর্য স্থাপন বন্ধ করা।
৮. জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকারমসহ দেশের সব মসজিদে মুসল্লিদের নির্বিঘ্নে নামাজ আদায়ে বাধাবিপত্তি ও প্রতিবন্ধকতা অপসারণ এবং ওয়াজ নসিহত ও ধর্মীয় কার্যকলাপে বাধাদান বন্ধ করা।
৯. রেডিও–টেলিভিশন সহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে দাঁড়ি–টুপি ও ইসলামি কৃষ্টি–কালচার নিয়ে হাসিঠাট্টা এবং নাটক–সিনেমায় নেতিবাচক চরিত্রে ধর্মীয় লেবাস–পোশাক পরিয়ে অভিনয়ের মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মের মনে ইসলামের প্রতি বিদ্বেষমূলক মনোভাব সৃষ্টির অপপ্রয়াস বন্ধ করা।
১০. পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশব্যাপী ইসলামবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত এনজিও এবং খ্রিস্টান মিশনারিগুলোর ধর্মান্তকরণসহ যাবতীয় অপতৎপরতা বন্ধ করা।
১১. রাসুল প্রেমিক প্রতিবাদী আলেম–ওয়ালা, মাদ্রাসার ছাত্র ও তৌহিদী জনতার ওপর হামলা, দমন–পীড়ন, নির্বিচারে গুলিবর্ষণ বন্ধ করা।
১২. সারাদেশের কাওমি মাদ্রাসার শিক্ষক ও ছাত্র, ওলামা–মাশায়েখ ও মসজিদের ইমাম ও খতিবকে হুমকি–ধামকি ভয়ভীতি দানসহ তাদের বিরুদ্ধে সব ষড়যন্ত্র বন্ধ করা।
১৩. অবিলম্বে গ্রেপ্তারকৃত সব আলেম–ওলামা, মাদ্রাসা ছাত্র ও তৌহিদী জনতাকে মুক্তিদান, দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার এবং আহত ও নিহত

ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণসহ দুষ্কৃতিকারীদের বিচারের আওতায় এনে কঠোর শিক্ষা দিতে হবে।

অর্থনীতিতে একটা নিয়ম আছে বহুল প্রচলিত– ফলো দ্য মানি বা টাকাকে অনুসরণ করা। আজ যখন এতদিন পরে ২০২২ সালে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের রাজনীতির দিকে তাকাই, তখন এক ধুরন্ধর ক্ষমতালোভী সিস্টেম ছাড়া আর কাউকেই দেখি না। দেখি চেতনার কথা বলে, সেকথা বারবার ব্যবহার করে ক্ষমতায় টিকে থাকার নতুন নতুন পন্থা বানানো, সংবিধান সংস্কারের নামে তত্ত্বাবধায়ক সরকার তুলে দেওয়া এক ক্ষমতার রাজনীতি।

শুধু তাইই না, হেফাজতের ধর্মকেন্দ্রিক এইসব দাবির অনেকাংশই আজ বাস্তবায়িত, যেমন বাংলাদেশের সংবিধানে বিসমিল্লাহ বহাল তবিয়তে রাখা থেকে শুরু করে অনুভূতিতে আঘাত দেওয়ার আইন। তুরস্কে এককালে চলা মূর্তিভঙ্গ আন্দোলনের মতো চলে ঢাকার এয়ারপোর্টের সামনে লালন ভাস্কর্য ভাঙার পরে হেফাজতের দাবি অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্টের সামনে আইনের দাঁড়িপাল্লার প্রতীক হাতে ন্যায়বিচারের প্রতীক নারীমূর্তি জাস্টিসিয়ার ভাস্কর্য সরানোর কাজটিও।

পাঠ্যবই থেকে অন্য ধর্মের লেখকদের লেখা সরানো, বিজ্ঞান লেখকদের বই ব্যান করা থেকে হেফাজতের প্রায় প্রতিটি দাবিই ফলেছে। দেশ ছেয়ে গেছে হিজাব–বোরখা আর ধর্ম ব্যবসায়। কারণ একচ্ছত্র ক্ষমতা প্রায় সময়ই ধর্মান্ধতাকে পুঁজি করে নিয়ন্ত্রিত হয়। তখনই জেনেছি ধর্মান্ধতায় ভরা যেকোনো দেশের ক্ষমতায় পাকাপাকিভাবে টিকে থাকতে হলে ধর্মান্ধদের রসদ জোগান দিতে হবে, সরকারি চাকুরেদের বেতন বাড়াতে হবে।

ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেওয়ার নামে ব্লগার গ্রেপ্তার করা, লেখক ব্লগার হত্যার পরে দায়সারা বিচার, যেকোনো সমালোচনা করা বই ব্যান, একুশে বইমেলায় স্টল নিষিদ্ধ করা সবই ঘটেছে বাংলাদেশে। দেশের বেশিরভাগ পোষা বুদ্ধিজীবীরা এসবের মিনমিনে প্রতিবাদ করেও কোনো সুরাহা হয়নি।

বলাই বাহুল্য 'ফলো দ্য মানি' নীতি অনুসরণ করলে বাংলাদেশে মুক্তচিন্তার লেখকদের খুন হওয়ার কারণে কিছু যদি সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়ে থাকে তবে সেটা মূলত ক্ষমতাতান্ত্রিক কাঠামো। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো– কথিত বুদ্ধিজীবীদের পকেটে পুরে ফেলা গিয়েছে ক্ষমতা কিংবা ভয়ের বদৌলতে।

এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৮ সালে আগেকার সাইবার সিকিউরিটির আইসিটি অ্যাক্টকে সংস্কার করে নাম দেওয়া হলো– ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন। এই ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন অনুযায়ী রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করলে বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দিলে সর্বোচ্চ সাত কিংবা চৌদ্দ বছরের জেল হতে পারে। শুরু হলো সরকারের বিরুদ্ধে মতপ্রকাশের বিচার, সেই বিচারকে দেওয়া হলো রাষ্ট্রদ্রোহের তকমা।

যারাই সমালোচনা করল তাদেরকে মাঝেমধ্যে পাকিস্তানের এজেন্ট, স্বাধীনতা বিরোধী ট্যাগ দেওয়া হতে থাকল।

আমি, যে কি না এতদিন মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লেখায়, গবেষণায় পুরস্কার পেয়েছিলাম, একাত্তরের যুদ্ধশিশুদের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম, ক্ষমতাসীনদের নীতির সমালোচনা করায় আমাকেও বলা হতে শুরু করল রাজাকার আর দেশদ্রোহী। দেশপ্রেম মানে প্রতিষ্ঠিত হলো ক্ষমতার পায়ে তেল মালিশ করা।

এরই মাঝে আমারসহ বেশ কয়েকজন অ্যাক্টিভিস্ট লেখকের ফেসবুক আইডি ডিজেবল করে দেওয়া হলো গণহারে রিপোর্ট করে। আমি এর মধ্যে খেয়াল করতে থাকলাম অসংখ্য অচেনা–অজানা লোককে, যারা আমাকে নিয়মিত বাসা থেকে অন্যান্য অনেক জায়গায় অনুসরণ করত। ভাইবোনকে বলার পর তারা বলল– আমি মানসিকভাবে টানাপোড়েনের কারণে ভুলভাল দেখছি, আমার দেখাশোনা নাকি সত্য না। আর যদি সত্যই হয়, তাহলে না লিখলেই মেটে! খামোখা কেন লিখছি?

আমি জানতাম, আমি যা দেখছি তার সবই সত্য। খুব কম মানুষ ছাড়া বোঝাতে পারলাম না সেই অনুভবের কথা। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বিশ্বস্ত লোক আমার মা। আর দ্বিতীয়জন মুক্তমনা ব্লগার তাহসিব ভাই। তার সাথে তখন আমার যোগাযোগ আছে। নিরুপায় হয়ে তাকে খুলে বললাম আমাকে অনুসরণের সেই ঘটনা। প্রসঙ্গক্রমে বলি– শাহবাগ আন্দোলনের সময় নাস্তিকতার অভিযোগে যাদেরকে স্বেচ্ছায় নির্বাসনে যেতে হয়েছে, তিনি তাদের একজন। তার আরেক বন্ধু ব্লগার নিলয় নীলকেও কুপিয়ে হত্যা করেছে মৌলবাদীরা, সেই হত্যাকাণ্ডের পরে তাকেই লাশ শনাক্ত করতে হয়েছিল। অন্য সবার মতোই নীলয় নীলেরও অপরাধ ছিল তিনি ধর্মের কটূক্তি করেছেন! কিন্তু বন্ধুকে হারানোর সেই ভয়ংকর দুঃসহ স্মৃতি তাহসিব ভাই ভুলবেন কেমন করে?

তিনি জানালেন আমার অনুমান ঠিক আছে। একইভাবে অজ্ঞাত পরিচয়ের একাধিক ব্যক্তি তাকেও অনুসরণ করত। তিনি আমাকে পরামর্শ

দিলেন ফ্রন্টলাইন ডিফেন্ডার্স নামের ডাবলীনভিত্তিক আইরিশ মানবাধিকার সংগঠনটির সাথে যোগাযোগ করতে। বাংলাদেশে ফ্রন্টলাইন ডিফেন্ডার্সের প্রতিনিধিকে আমি চিনতাম নিরাপদ সড়ক আন্দোলনের সময়কার আন্দোলনকারী হিসেবে সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় থেকেই।

ফলে তাকে পুরো ঘটনা খুলে বললাম, সেই ভদ্রলোক পরামর্শ দিলেন ওদের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে সাহায্য চাইতে। আমি তাও চাইলাম এবং ২০১৯ সালের শুরুতে পেলাম ফ্রন্টলাইন্স ডিফেন্ডার্সের রিলেকশান অ্যাওয়ার্ড।

এই এওয়ার্ডের টাকায় আমি ভারতে যাই কিছুদিনের নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য। কিন্তু গিয়ে দেখি যেই লাউ সেই কদু! সেখানেও আমাকে অনুসরণ করা হচ্ছে!

অগত্যা দেশেই ফিরে আসি দুদিন পরে– মরলে দেশেই মরব বলে।

বলে রাখা ভালো, ২০১৮ সালের এক দুর্ঘটনায় দুই স্কুল শিক্ষার্থীর মারা যাওয়াকে ভিত্তি করে যখন নিরাপদ সড়কের আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তখন সেই আন্দোলনেও আমি অংশ নিই। ফলে বিপদ আমার পিছু ছাড়েনি। সেই আন্দোলনের সময় লেখালেখির সুবাদে আমারসহ বেশ কয়েকজন অনলাইন অ্যাক্টিভিস্টের ছবি দিয়ে মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডা ছড়ানো হলো। তারা পুলিশের নম্বর যুক্ত করে লিখলেন– এর ব্যাপারে তথ্য দিয়ে পুলিশকে সহায়তা করুন! অন্যদিকে পুলিশের গোয়েন্দা শাখা সিআইডির ফেসবুক পেজ থেকে পোস্ট করা হলো– তারা এমন কোনো বিজ্ঞপ্তি দেয়নি!

এর মাঝে টেলিযোগাযোগ সংস্থায় কর্মরত একজন বড় ভাই ফোন করে জানালেন– আমাকে নাকি সরাসরি মনিটর করা হচ্ছে। আমি যেন মোবাইল ফোন বন্ধ করে, ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ডিঅ্যাক্টিভ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে থাকা আমাদের গ্রামের সূত্রে পরিচিত দুঃসম্পর্কের চাচার বাসায় চলে যাই। পরিস্থিতি ভালো না।

আমি সেই ভাইয়ের একটি কথাও শুনলাম না, কিন্তু হতাশ হয়ে দেখলাম ইন্টারনেটের গতি স্লো করে দেওয়া হয়েছে সারাদেশে। একটা মেসেজ পাঠাতে তিন মিনিট করে সময় লাগছে ইন্টারনেটে।

প্রখ্যাত আলোকচিত্রী শহিদুল আলমকে গ্রেপ্তার করা হলো এই আন্দোলনে আল–জাজিরায় এই আন্দোলন সম্পর্কে সাক্ষাৎকার দেওয়ায়। পরবর্তীতে ১০৭ দিন তাকে জেলে বন্দি করে রাখা হলো। রক্তমাখা পাঞ্জাবি ধুয়ে তাকে সেই পাঞ্জাবিই পরতে দেওয়া হলো। আদালতের সামনে তিনি কথা বলার চেষ্টা করলে হাত দিয়ে তার মুখ চেপে ধরা হলো।

তার সাহসিকতায় মুগ্ধ হয়ে বইমেলার আগে যে বইটি লিখছিলাম সেই 'ক্রীড়াবালিকা' আমি উৎসর্গ করেছিলাম শহিদুল আলমকে। তিনি জেল থেকে বের হওয়ার আগে মাঝেমধ্যেই তার ফেসবুক অ্যাকাউন্টে উঁকি দিয়ে চিন্তা করতাম– মানুষটা কেমন আছেন? তাকে লিখতামও ইনবক্সে। একবার ইমেইলও পাঠালাম। জেল থেকে বের হওয়ার পর তিনি আমাকে সেই ই–মেইলের উত্তর দিয়েছিলেন।

আমি জানতাম না, তার বছরখানেক পরে আমার নামেও মামলা হবে।

বাধ্য করা হবে চুপ থাকতে। কারণ ওখানে একটিই আইন অক্ষত আছে। সেই অলিখিত আইনটি হলো– বেঁচে থাকতে হলে নিজের বুদ্ধি–বিবেচনাকে গচ্চা দিতে হবে অথবা মরতে হবে, মামলার ভার বহন করতে হবে!

আমার কাছে দেশ মানে এভাবেই হয়ে উঠছিল এক অদ্ভুত জেলখানা, যেখানে মুক্ত থাকাও বন্দিদশার মতোই। যেখানে বাক্‌স্বাধীনতা মানে অপরাধ আর প্রগতিশীলতা মানে নিজের গা বাঁচিয়ে চলা!

সেক্স স্টোরি

সেই ষোলো বছর বয়সে প্রথম রাজশাহী শহরের জিরো পয়েন্ট মোড়ে দাঁড়িয়ে চুমু খেয়েছিলাম এক প্রেমিককে। আমার সেসময়ের প্রেমিকের সেই চুমু শেষে ভিড়ে মিশে যেতে সময় লাগেনি। কিন্তু আমাকে যেন সমগ্র রাস্তার চোখগুলো গিলে খাচ্ছিল! আমাকে তখন প্রেরণা দিয়েছিল হুমায়ুন আজাদের সেই বিখ্যাত কবিতার লাইন– "একটি প্রকাশ্য চুম্বনে আমরা খান খান করে ভেঙে দিতে পারি হাজার বছর বয়স্ক বাঙলার সামরিক আইন ও বিধান।"

কে না জানে, বাংলাদেশে সবচেয়ে বিকোয় যে গল্প, সেসব মূলত সংগমের গল্প। সেই গল্প এত জনপ্রিয় হওয়ার কারণ আজও সেক্স ওখানে এক ট্যাবু, প্রকাশ্যে চুমু দেওয়া বিরল। পশ্চিমে এসে দেখি ছেলেমেয়েতে মেলামেশা, সংগম খুব স্বাভাবিকভাবে দেখা হয়, কিন্তু বাংলাদেশে দেখা হয় কলঙ্ক হিসেবে। অথচ কিন্তু সেই কলঙ্কের ভার নিয়েই দক্ষিণ এশিয়ার এই ক্ষুদ্র দেশটির জনসংখ্যা ষোলো কোটি ছাড়িয়েছে সেই কবেই! যে দেশের সিনেমায় ফুলের টোকাটুকি দেখিয়ে সংগমকে আড়াল করা হয়, সে–দেশের জনসংখ্যা বায়ু পরাগায়নে ধুপ করে বেড়ে গেছে বলে মনে হতে পারে যে কারোরই! সেখানে নিজের বিবাহ বহির্ভূত সংগমের গল্প করা আর নিজের পায়ে কুড়াল মারা প্রায় একই রকম!

ফলে দীর্ঘদিন আমার সময় লেগেছিল সেই সংগমের গল্প এমনকি খুব কাছের বন্ধুকেও বলতে। পাছে সেই গল্প সে রাষ্ট্র করে দেয়!

কিন্তু অতিমাত্রায় কৌতূহলের কারণেই সম্ভবত শরীরের সাথে শরীরের অদ্ভুত যোগাযোগের ভাষা আমার কাছে ধরা দেয় যখন স্কুল শেষ করে কলেজে উঠব। সেই সময়ই আমার প্রথম গোপন প্রেমিকের সামনে আমি কাপড় খুলে দাঁড়াই। সেই দাঁড়ানোয় যত না কাম, তার চেয়ে কত বেশি কৌতূহল ছিল ভেবে আজকাল হাসি পায়! এমনকি কে বলবে এককালে আমার এমন এক প্রেমিকও ছিল যে বিয়ের আগে শারীরিক সম্পর্ককে পাপ বলে ভাবত! বাংলাদেশে এমনই ভাবা হয় কি না!

তবে এখনকার দিনে হয়তো ছেলেমেয়েরা বিদেশি ওয়েব সিরিজ আর সিনেমার কারণে সামান্য এগিয়েছে, কিন্তু ছেলেমেয়েদের বাবা–মায়েরা একই আছে। তারা এখনও মনে করে বিয়ের আগে শারীরিক মিলন অপবিত্র। সাথে না আছে ঠিকঠাক শরীর সম্পর্কে জ্ঞান, সেই জ্ঞানের শিক্ষা। সেক্স এডুকেশন কী জিনিস, খায় নাকি মাথায় দেয় তাইই জানে না অনেকে। ছেলেমেয়েতে প্রেম ছাড়াও যে সমকামী সমলিঙ্গের প্রেম হতে পারে, সেই ধারণা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের কাঠামোতেই নেই। ফলে আইনের ধারা অনুযায়ী সমকামিতাকে মানসিক বিকৃতি হিসেবে দেখা হয়, মনে করা হয় সমকামিতা অপরাধ। সমকামিতার প্রমাণ পেলে সশ্রম কারাদণ্ড হতে পারে। এদিকে আমি কি না দেখি প্যারিসের ডেপুটি মেয়র– জ লুক রোমেরো মিশেল নিজেই একজন সমকামী, বিয়ে করেছেন প্রাণপ্রিয় পুরুষ সঙ্গীকে। এলজিবিটিকিউ বা সমকামী অধিকার নিয়ে তিনি অত্যন্ত সোচ্চার। আমাদের দেশে থাকলে রাজনীতিবিদ হওয়া ভালো, তাকে থাকতে হতো জেলে। হয়তো তার ন্যাংটো ছবি চাউর হতো স্বগৌরবে!

অথচ আমি দিব্যি জানি বাংলাদেশের রাজধানীতে ধনীদের এলাকা গুলশানে 'গে ক্লাব' আছে সমকামী পুরুষদের জন্য। সেইসব পুরুষদের কয়েকজনের সাথে কথাও বলেছি আমি, তারা হয়তো বিয়ে করেছে একটি মেয়েকে, বাচ্চার জন্ম দিয়েছে পৌরুষ প্রমাণে ব্যস্ত হয়ে, কিন্তু প্রেম করছে গোপনে একটি পুরুষের সাথে। যারা এদের মধ্যে উদার, তাদের কেউ কেউ নারী সঙ্গীর সাথে চুক্তিতে গেছে যে নারী সঙ্গীটি গোপনে আরেক পুরুষের সাথে সংগম করতে পারবে এবং সেও গোপনে অন্য পুরুষের সঙ্গে মিলিত হবে! কিন্তু এই সংখ্যা খুব নগণ্য।

এ কারণেই সংগমের এত সুন্দর একটা ব্যাপার সংখ্যাগুরুর ধর্মীয় অনুভূতি, রাষ্ট্রের আইনানুভূতি আর সেক্স এডুকেশনবিহীন সমাজের যৌনানুভূতিতে ব্যাপক আঘাত করেছে। ফলে কোনো নারী পুরুষের সাথে শুয়েছে জানলেও বাঙালি সংখ্যাগুরু নারী-পুরুষ মনে করে– সে ভোগ্যপণ্য। এমনকি খোদ ইউরোপেও আমার জার্মান নারী বন্ধু লীনা জানিয়েছিল– এই ইউরোপেও ধর্ষণের অভিযোগ করতে গেলে পুলিশ প্রথমেই মেয়েটি ড্রাঙ্ক ছিল কি না তা মামলা এড়াতে খুঁজতে শুরু করে যেন আগেভাগেই এই অভিযোগ খারিজ করে দেওয়া যায়!

অথচ প্যারিসের এক ফুরফুরে দিনে আমার বন্ধু স্টেফানি বইমেলায় ঘুরে ঘুরে ওর মেয়ের পছন্দের বইটি খুঁজতে খুঁজতে জানিয়েছিল– সেক্স

এডুকেশনের প্রথম ধাপে কৈশোর না পেরোনো বালিকা কন্যা ওকে গম্ভীর গলায় বলেছিল– আমি সম্ভবত বাই সেক্সুয়াল হবো!

স্টেফানি হাসি চেপে বলেছে– তাই! কেমন করে টের পেলে?

–বারে! আমার ছেলে আর মেয়ে দুজনকেই ভালো লাগে!

স্টেফানি হাঁপ ছেড়ে বলেছে– যাক, আমরা নিশ্চিন্ত হলাম যে কেবল এক জেন্ডারের মধ্যেই তোমার ভবিষ্যতে সঙ্গী খুঁজতে হবে না!

অথচ আমি ভাবি, এই একই কথা যদি আমি বলতাম দেশে বসে তাহলে বাবা–মা কবেই না জানি ভাবত– আমার মাথায় ব্যারাম!

যেখানে বিপরীত লিঙ্গের সংগম নিষিদ্ধ গন্দম সেখানে সমলিঙ্গের সংগমে কুলোবে কেমন করে?

ফলে দেশে থাকতেই এমন অনেক তথাকথিত মুক্তমনা পুরুষ আমার দেখা হয়েছে যারা মূলত আমার কাছে আমার সংগমের গল্প শুনতে চাইত। আবার সুযোগ পেলে ছোঁয়ার চেষ্টাও করত! নিজেকে যতই দুর্লভ করে রাখি না কেন, বলতে দ্বিধা নেই– খুব বিপর্যস্ত অবস্থায় কখনো কখনো নিজের কাছে নিজেকে খুব ছোট বলে মনে হতো একটা সময়ে, মনে হতো শরীরের পবিত্রতার বুলি মেনে চলা নারী হলেই হয়তো বেশ হতো! এতে বুঝি এদের এগিয়ে আসা হাতগুলো যত্রতত্র প্রবেশের চেষ্টাকে আটকে দেওয়া যেত!

তবে আজকাল বুঝি, আসলে– আমার অচ্ছুত হওয়ার চেষ্টা না, অবাঞ্ছিত হাতগুলোকে রুখে দিতে মূলত বরং আমার অকপটে বলার অভ্যাস আর নারীবাদ আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে!

নারীবাদ নামের জাদুর কাঠি বুঝতে শিখিয়েছে এই যে সংগম নিয়ে হীনম্মন্যতায় ভুগতে থাকা– এটা মূলত এই সমাজের পুরুষদের চাপেই সৃষ্টি। ওরা চায় উন্নত বুক, আঁটসাঁট হাইমেনওয়ালা যোনি বিশিষ্ট একটি নারী নামক পণ্য ওদের কাছে আসুক, র‍্যাপিং পেপার থেকে গিফট উন্মুক্ত করার মতো ওরাও চায়, নারীটি কেবল ওর একার সাথেই থাকবে! এ এক অদ্ভুত মনস্তাত্ত্বিক অসুখ। যেমন খোদ পশ্চিমেও আমি দেখি ঠোঁটে সার্জারি করে ঠোঁট ফোলানো, বুকে সার্জারি করে বুক ফোলানো মেয়েদের! এই মেয়েরা হয়তো নিজেরা নিজেদের পণ্য ভাবে না। ভাবে নিজেদের ইচ্ছে ও নিজদের টাকায় ওরা ঠোঁট আর বুক ফোলাচ্ছে, তাতে কার কী?

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওরা চাইছে সেই সমাজের উপযোগী হয়ে উঠতে যে সমাজ বিশাল নিতম্ব, সরু কোমর, খাড়া বুক আর ফোলা ঠোঁটের পূজা করে উত্থিত শিশ্ন দিয়ে!

সে যা-ই হোক, এই যে এককালে সংগমমুখর আমার অদ্ভুত জীবন ছিল এমন নারীকে পণ্য ভাবা সংখ্যাগুরুর দেশে, সেই ধারাবাহিকতায়ই ২০১৯ সালের এক ভ্যাপসা রোদের দিন সেই জীবনে আচমকাই শিপ্রার সাথে আমার দেখা হয় এক সিনেমার পরিচালকের সাথে ডেট করতে গিয়ে।

বিখ্যাত পরিচালক, মনপুরা নামের সিনেমা বানিয়েছেন। সেই ছবি আমি দেখেছিলাম কলেজে পড়ার সময় সিনেমা হলে গিয়ে। তাছাড়া এই সিনেমার পরিচালকের প্রতি আমার আগ্রহও ছিল। ফলে যখন সোশ্যাল মিডিয়ায় পরিচিত হলাম তার সাথে তখন হুটহাট কথা হতে থাকল। তেমন কোনো আহামরি কথা নয়, নিজেদের জীবনের কথাই। কী করছি, কী আঁকছি, কী খেয়েছি– এমন সাধাসিধে কথাবার্তা।

অবশ্য এতদিনে আমি প্রেমের ব্যাপারে পুরোপুরি উদাসীন হয়েছি। আমার এখনকার সঙ্গীর সাথে তখনও দেখা হয়নি। সেই সময় পর্যন্ত আমার শেষ প্রেমিক অভীড় সাথে ব্রেকাপ করেছি। ব্রেকাপের আগে তীব্রভাবে আঘাত পেয়েছি যখন জেনেছি অভী আরেকটা প্রেম করছে, এ কারণেই তার এমন উদাসীনতা। মেনে নিতে তখনও কষ্ট হয়– যার সাথে প্রেম হয়েছিল গুলশানের বারে বসে ভদকা আর স্কচ খেতে গিয়ে প্রাক্তন প্রেমিক–প্রেমিকাদের ব্যাপারে গল্প করতে করতে, যে সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকত আমার মন জয়ের চেষ্টায়, সে–ই যখন দুর্ব্যবহার করতে শুরু করল, অহেতুক সামান্য কথায় ঝগড়া করতে শুরু করল– তখন আমি বুঝলাম আমার ওপর থেকে তার মন উঠে গেছে!

মানুষের মন বড় আশ্চর্য।

আজও মন বসতে এবং উঠে যেতে যাদের সময় লাগে না আমি তাদের ভয় পাই। পুরুষদের আমি সহজে বিশ্বাস করতে পারি না অতীতের নানান তিক্ত অভিজ্ঞতায়।

কিন্তু সে যেন কেমন করে রেস্তোরাঁর আলো–আঁধারিতে গিটার বাজিয়ে গান শুনিয়ে, কথা বলতে বলতে মন জয় করে নিয়েছিল। আমি তখনও বুঝতে পারিনি সে প্রেমে পড়েছে আমার সাথে কথা বলতে চাওয়া লোকদের লিস্ট দেখে, পত্রিকার পাতায় ছবি দেখে, টিভিতে সাক্ষাৎকার দেখে, আমার মতামত নিয়ে আর আমাকে নিয়ে আলোচনা–সমালোচনার ঝড় দেখে। এ তার প্রেম নয়, মোহো।

এই মোহো সময়ের সাথে সাথেই কেটে যাবে! ঠিক যেন দুঃখী রাজকুমারী ডায়ানার গোপন প্রেমিক হাসনাত খান! যে দূর থেকে বিদুষী আর কাছ থেকে বেশ্যা ডাকবে একইসাথে।

তবে অভীড় সাথে তখন পর্যন্ত আমার মিল এই ছিল যে, আমি যেমন তার আগে ইমতিয়াজ মাহমুদ নামের মাঝবয়সি বিবাহিত এক লোকের প্রেমে পড়েছিলাম, যে প্রেমে পড়ে নিজেকে মনে হয়েছিল অতি সৌভাগ্যবান, সেও সেরকম এক বিবাহিত মেয়ের প্রেমে পড়েছিল। ফেসবুকে সেই মেয়ের নাম তৃতীয়া তিথি, যাকে সে আদর করে ডাকত– মায়াবতী। এহেন অপূর্ব মিলের ধার ধরে সে ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলে জয় করে নিয়েছিল আমার মন।

একবার কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতে তার স্ত্রী সেজে বেড়াতেও গিয়েছি আমরা। সাগরের পাড়ে বসে থেকেছি। দেখেছি দিনের বেলা সে কেমন বেহেড মাতাল হয়ে চোখে সানগ্লাস পরে সমুদ্রে নাইতে যাচ্ছে আমার সাথে। লিবারাল বা মুক্তমনার ভাব দেখালেও আমাকে বলছে– পানিতে বেশি ভিজলে নাকি আমার শরীরের পুরোটাই দেখা যাবে! বলে আবার নিজেকে পরক্ষণেই লিবারাল প্রমাণ করতে বলেছে– দেখা গেলেই বা কী, তুমি তো এমনই!

হ্যাঁ, আমি তো এমনই।

এমন বলেই হয়তো শেষমেশ 'আমি তো আমিই' নামের স্বাধীনচেতা ওই সত্তাই ওর গলার কাঁটা হয়েছিল। তাইই হয়তো প্রায়ই বলতে শুরু করল– আমি তার পরিবারের চাহিদামতো কেউ নই। প্রস্তাব দিতে শুরু করল– বুকের ওপর ওড়নাটি টেনে ভদ্র মেয়ে হয়ে ওর মায়ের সাথে দেখা করতে যেত!

আহা অভী!

তুমি যদি বুঝতে ওই কলের পুতুল হওয়াকে আমি কত ঘেন্না করি!

তবুও আমি ভালোবাসা আর ঘেন্নার টানাপোড়েনে তাই দুলতে লাগলাম, হোঁচট খেতে লাগলাম অভীড় মানসিকতা, তার কুৎসিত চিন্তাগুলো দেখতে পেয়ে, আমার ওপর খবরদারির আর কতৃত্বের রূপ দেখতে পেয়ে জর্জরিত হতে লাগলাম গ্লানিতে। ভাবনার দোলাচল আর এই ভ্রমণের ফিরে আসার পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের থার্ড ইয়ারের পরীক্ষা শুরুর পরে একদিন আবিষ্কার করলাম সে আসলে আরেকটা প্রেম করছে! এবং যার সাথে করছে সে হলো সেই বান্ধবী যার সাথে থাকলে আমিই আনন্দিত হয়েছি একদা।

অবশ্য খুব কষ্ট হয়েছে এই ফাঁদ থেকে বের হতে। বারবার মনে হয়েছে– কেবল আমার সাথেই কি এমন ঘটে?

যখন দেখলাম আমার ধারণা একদম পুরোপুরি ঠিক তখন যা করলাম তার জন্য অবশ্য সে একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। মনে আছে তাকে ফেসবুক মেসেঞ্জারে লিখেছিলাম– গো, ফাঁক ইউরসেলফ!

আসলে রাগ না, প্রচণ্ড ঘেন্না কাজ করেছিল এই ভেবে যে– একজনের সাথে দেখা করছে, কথা বলছে, এর মধ্যে অন্য একজনকেও একই কথা বলছে গোপনে! কেমন করে সম্ভব হয় এটা? এদের মন কী দিয়ে তৈরি?

জানি না। কিন্তু তার এই ঘটনার আগেও যা জেনেছিলাম, তাও অকিঞ্চিৎকর না।

একুশ বছর বয়সে সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখালেখির সুবাদেই পরিচয় হয়েছিল আইনজীবী ইমতিয়াজ মাহমুদ নামের এক লোকের সাথে, পেশায় আইনজীবী। সে চমৎকার লিখত নারীবাদ নিয়ে, জ্বালাময়ী বক্তব্য দিত আদিবাসীদের অধিকার নিয়ে। সে অনেকেরই নমস্য ব্যক্তি ছিল। এমনকি আমারও। একদিন এই লোকটিই মেসেজ পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল– তুমি তো আমার মেয়ের বয়সিই হবে, তোমাকে 'তুমি' বলে ডাকি?

ফ্রেঞ্চ ভাষায় যেমন 'তু', বাংলায় তেমনই তুমি। আন্তরিক ডাক। আমি তাকে বলেছিলাম– অবশ্যই ডাকবেন! এভাবেই পরিচয়, আস্তে আস্তে কথাবার্তা।

কিন্তু যা কিছু কথা, সেগুলো সবই বয়সে বড় একজনের সাথে কমবয়সি একজনের আন্তরিক কথোপকথন। তখনও জানতাম না সামনে কী ঘটতে চলেছে!

ইমতিয়াজের সাথে আমার সামনাসামনি দেখা হয় যখন আমি প্রথমবারের মতো ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে যাচ্ছি সাহিত্য সম্মাননা গ্রহণ করতে। চট্টগ্রামের স্বপ্নযাত্রী নামের এক আবৃত্তি সংগঠন এই সম্মাননা দেবে আমাকে, সাথে বাংলাদেশের অন্য তিন লেখক– বিশ্বজিৎ চৌধুরী, নাসরিন জাহান আর জুয়েল দেবকেও। নাসরিন জাহান থেকে শুরু করে প্রত্যেকেই বয়সে অনেক বড়, আমার বয়স তখন বাইশ বছর হবে হবে!

এর মধ্যে আমি লিখেছি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সবচেয়ে কম বয়সে লেখা আমার আত্মজীবনী 'উনিশ বসন্ত'। লিখেছি দুটো উপন্যাস, বাচ্চাদের জন্য লেখা দুটি বই, একটা গল্পগ্রন্থ। 'উনিশ বসন্ত' নিয়ে প্রচুর আলোচনা সমালোচনা হচ্ছে তখনও, এমনকি এখনও। এত কম বয়সে আত্মজীবনী লেখার দরকার কী? কী এমন করেছি?

তখনও যেমন উত্তর দিতাম এখনও তেমনই উত্তর দিই। এখনও বলি– উনিশ বসন্তের একটি মেয়ে যদি আত্মজীবনী লেখার কাজে হাত দেয়, তখন স্বাভাবিক মস্তিষ্কের মানুষও সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকায়। এ তো জীবন সম্পর্কে মোহো, নিজেকে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভাবার ফসল! তাও আমি যদি তাদের

বোঝানোর চেষ্টা করি উনিশ বসন্ত মানে দুশো আটাশটি পূর্ণিমা, একশো চৌদ্দটি ঋতু, কয়েক লক্ষ ঘণ্টা এবং কোটিখানেক মিনিট। তবু অনেকে উচ্চমার্গীয় কথা শুনিয়ে দেয়– মাথা থেকে এসব ভূত নামাও, অতীত নিয়ে না ভেবে ভবিষ্যতে কী করবে সেটা ভাবো!

এখন মনে হয় লোকের মন পরিবর্তন হয়েছে। যেহেতু লেখক হিসেবে সামান্য পরিচিতি পেয়েছি, সেহেতু ছাব্বিশ বছর বয়সে নিজের এইসব অভিজ্ঞতা লেখাকে হয়তো দেশের লোক আর অতটা খারাপ বলে ভাববে না। কিংবা ভাবলেই বা কী?

আমরা যে অনিশ্চয়তার মধ্যে বাস করি সেখানে এমনও হতে পারে যে এই লেখাটা লিখতে লিখতেই মরে পড়ে রইলাম এই টেবিলের পাশে। দুই-চারদিন বাদে গন্ধ ছড়ানোর পর কেউ এসে আবিষ্কার করল– প্রীতি নামের মেয়েটা মারা গেছে! কতভাবেই তো মানুষের মৃত্যু হয়! কেন আমরা ধরে নিই, একই উপায়েই সবাই মারা যাবে?

আমার প্রিয় লেখক আর্নেস্ট হেমিংওয়ে মারা গিয়েছিলেন নিজের মাথায় নিজের পিস্তল ঠেকিয়ে। এমনও তো হতে পারে, একদিন আমারও নিজের মাথায় পিস্তল ঠেকাতে ইচ্ছে করল!

সে যা-ই হোক, ইমতিয়াজ আমাকে লেখক হিসেবেই সম্মান করে বলে জানতাম। কিংবা তার আচরণে সেটা ভাবতে বাধ্যই হয়েছিলাম আর কি। ঘটনাক্রমে চট্টগ্রামের সেই সাহিত্য সভায় যাওয়ার আগেরদিন একটা অনলাইন পোর্টালে আমার নামে একটা মিথ্যা খবর বের হয়। খবরটা ঠিক আমার নামেও না। এক ভুঁইফোড় অনলাইন পোর্টাল লেখে– ঢাকায় জনপ্রিয় হচ্ছে দেহব্যবসা। পাশে আমার ছবি! আমার সাথে দেহব্যবসার সম্পর্ক কী?

অতি বিরক্ত হয়ে আমি ইমতিয়াজকে মেসেজ পাঠাই– আমার একটা সাহায্য দরকার, আপনি ফ্রি হলে আর এই বার্তা পেলে উত্তর দিয়েন।

পরদিন সাতসকালে যখন ঢাকা এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে বসে ঢুলুঢুলু চোখে রাস্তায় প্রচুর ট্র্যাফিক জ্যাম থাকবে ভেবে অতিরিক্ত বেশি সময় আগে আগে প্লেন ধরতে আসায় নিজেকে যখন গাল দিচ্ছি মনে মনে তখনই দেখি তিনি উত্তর দিয়েছেন– এই যে উত্তর দিলাম তোমাকে। খুব ব্যস্ত আমি, এখন এয়ারপোর্টে যাচ্ছি।

আমি লিখলাম– আরে, আমিও তো এয়ারপোর্টে!

তিনি জিজ্ঞেস করলেন– কোথায় যাচ্ছ?

আমি লিখতাম– চট্টগ্রাম। আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

তিনি লিখলেন– আমিও সেখানেই যাচ্ছি!

এরপর একে একে আবিষ্কার হতে থাকল তিনি যে বিমানে করে যখন রওনা দেবেন সেই একই বিমানের যাত্রী আমিও! তিনি ফোন নম্বর দিলেন, জানালেন তিনি এসে পৌঁছবেন আর কিছুক্ষণ পরেই। আমি যেন অবশ্যই তাকে কল করি। যখন বোর্ডিং পাশ নেওয়ার জন্য লাইনে দাঁড়িয়েছি, তখন টের পেলাম এক মধ্যবয়সি কাঁচাপাকা চুলের হ্যান্ডসাম লোক লাইনের একদম শেষ মাথায় দাঁড়িয়েছে এবং এই লোকটিই ইমতিয়াজ মাহমুদ।

অস্বীকার করব না, গল্প–উপন্যাসে পড়া তুলনামূলক বড় বয়সের পুরুষদের ব্যাপারে অতি কৌতূহলী আমার তার ব্যাপারে প্রথম মনে হওয়া শব্দটি হলো– সুদর্শন!

যদিও আমি ভাব দেখালাম তাকে দেখতে পাইনি। ফোনেও কল দিলাম না। লোকের লম্বা লাইন আরেকটু এগোক, তারপর দেওয়া যাবে– ভেবে ফেসবুকের পাতায় কে কী লিখেছে সেদিকে মন দিলাম। কতক্ষণ কেটেছে জানি না। হঠাৎ টের পেলাম আমার পাশে এসে একজন দাঁড়িয়েছে এবং আমার দিকে হাত বাড়িয়ে সে বলছে– গুড মর্নিং ইয়াং লেডি, শেষ পর্যন্ত আমাদের দেখাটা তাহলে হয়েই গেল!

আমি হাত বাড়ালাম হ্যান্ডশেক করতে। হাত ধরলাম তার। তিনি আন্তরিক ভঙ্গিতে আমার হাতটা আলতো ঝাঁকিয়ে আমার পাশে বসতে বসতে বললেন– কখন এসেছ?

এইসব হালকা কথাবার্তা হতে হতেই জানলাম আমাদের বিমান ছাড়তে আরও আধা ঘন্টা দেরি হবে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন– সকালের নাশতা করেছ? কফি খাবে তুমি?

আমি সামান্য মাথা নেড়ে বললাম– কফি মনে হয় খাওয়াই যায়!

তিনি হালকা চালে কফি নিয়ে এলেন একটা ট্রেতে। সাথে 'দুটি দেহ এক প্রাণ'–এর মতো দুই কাপ কফি একটি কেক। আমার পাশে বসতে বসতে বললেন– এসো, আমরা ভাগ করে খাই!

তারপর আমার গোল গোল চোখের বিস্ময় বাড়িয়ে দিয়ে বললেন– এবার এটা কফিতে ডুবিয়ে ডুবিয়ে খাও, ভালো লাগবে!

এমন কোনো আহামরি কথা নয়, কিন্তু কেমন যেন অদ্ভুত ঠেকল! হয়তো, যেকোনো কমবয়সি মেয়েই অমন অদ্ভুত অনুভূতি অনুভব করে খুব বয়স্ক কেউ অমন অযাচিত আন্তরিকতা দেখালে। কে জানে!

এসব তখন জানি না। তবে জানি যখন গিয়ে আমাদের ফ্লাইট গন্তব্যে পৌঁছে গেল, তখনও তার আন্তরিকতা ফুরায়নি! প্রায় আধা ঘন্টা পরে আমি

নিজের ব্যাগ সংগ্রহ করে ফাঁকা এয়ারপোর্টে দাঁড়ানোর পর আমার প্রকাশককে দেখার পরপরই আবারও দেখলাম তাকে! চার–পাঁচ ফুট দূরে দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছেন! আমি দূর থেকেই সামান্য গলার স্বর বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলাম– এখনও যাননি?

তিনি বললেন– ভাবলাম সিগারেটটা খেয়েই যাই!

অবশ্য আমাদের প্রেম হওয়ার পর জেনেছিলাম, তিনি প্রায় দশটা সিগারেট ফুঁকে ঠায় দাঁড়িয়েছিলেন এক কমবয়সি বোকা মেয়েকে মুগ্ধ করতে। দুঃখের বিষয়– সেই মেয়েটি আমিই! এবং অতি দুঃখের বিষয় এই কারণ যে প্রেমের স্বপ্ন ইমতিয়াজ আমাকে দেখিয়েছিল সেই প্রেমে সে কখনো পড়েনি। এ কেবল তার চালবাজি, মিথ্যে কথার জাদু।

এই মিথ্যা কথা শুরু হয়েছিল বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়লোকদের পাঁচতারকা হোটেল সোনারগাঁওয়ে 'প্রিয় লেখককে একবেলা খাওয়াতে চাই' বলে ব্যুফে টেবিল রিজার্ভ করা, মার্গারিটা খেতে খেতে স্ত্রী'র সাথে সম্পর্কের সুতো কেটে যাওয়ার, আমাকে ভালো লাগার সরল স্বীকারোক্তি দেওয়ার ভান, সময়ে–অসময়ে আমার সাথে দেখা করা আর মিষ্টি কথা বলে আইসক্রিম খেতে গিয়ে লাম্পট্য চরিতার্থ করা।

আমি তার কামনা, প্রেম না– একথা বুঝতে আমার লেগেছিল প্রায় চার মাস। এই চার মাস মূলত প্রেমের নামে কানামাছি খেলা। যে খেলা শেষ হয়ে গিয়েছিল যখন আমি তার স্ত্রী জেনিফা জাব্বারকে কল দিয়েছিলাম।

এতদিন মিথ্যে সংসার আর তার সেই সংসারের লাল–নীল স্বপ্ন দুমড়ে–মুচড়ে যখন সে আমার সজল চোখ উপেক্ষা করে বলেছিল– আমার স্ত্রীকে তুমি যা বলেছ এরপর আমাদের মধ্যে আর কিছুর সম্ভাবনা নেই, তখন বুঝেছিলাম– মিথ্যে বিয়ে, মিথ্যে সংসারের মতো ওই প্রেমটাও মিথ্যা।

আমি ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করেছিলাম– তোমার সবকিছু পাওয়া শেষ?

সে বলেছিল– তবে কি আমি সবকিছু ফেলে তোমার হাত ধরে বেরিয়ে যাব? আমার স্ত্রী আমাকে আস্ত রাখবে?

ইমতিয়াজ যত জোর দিয়ে 'আমার স্ত্রী' শব্দ দুটো উচ্চারণ করেছিল, তাতে বুঝেছিলাম ও মূলত পুরুষতান্ত্রিক সভ্যতার সেই দাস যে দাসের কাছে স্ত্রী মানে সেই সংগম করার বন্দোবস্তে স্বাক্ষর করা নারী, যার কাছে নারীটিও সমান দাস!

সংবিৎ ফেরার পর একটু খোঁজখবরের পর ক্রমেই জেনেছিলাম কেবল আমি একা নই, আমার মতো আরও অনেক মেয়ে আছে ইমতিয়াজের জীবনে

যারা চায় না তাদের পরিচয় প্রকাশিত হোক, কিন্তু যারা চায় ওইসব মিথ্যে প্রলোভন আর প্রেমের ধোঁকার কথা সবিস্তারে লেখা হোক। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম কেউ লিখুক বা না লিখুক, আমি লিখব!

তাই তাদের বোঝা কমিয়ে দিলাম। ইমতিয়াজ আসলে আমার সাথে কী করেছে তা জানিয়ে। লিখলাম সেই কমবয়সি প্রীতি নামের মেয়েটার কথা যে মেয়েটা সেই ঘটনার পরেই বড় হয়ে গেল এক নিমেষে। ফেসবুকের নিউজফিড ভরতি হয়ে গেল আমারই চরিত্রের বয়ানে। দেশের নারীবাদী নামের সুবিধাবাদীদের একটা বড় অংশ ইমতিয়াজকে, ইমতিয়াজের মতো এক বিশিষ্ট ভদ্রলোককে আমি কেমন করে প্রলুব্ধ করলাম তার রগরগে বর্ণনা দিতে লাগল!

এদের বক্তব্য হলো যেহেতু আমার বয়স আঠারো বছরের কম নয়, ফলে যা কিছু ঘটেছে তার কিছুই ইমতিয়াজের প্রতারণা নয়। এদের মধ্যে সুপ্রীতি ধর, শারমিন শামস, সাদিয়া নাসরিন, নাদিয়া ইসলাম আর শাশ্বতী বিপ্লবের নাম মনে করতে পারি। এখন অবশ্য হাসি আসে বাংলাদেশের মুমূর্ষু নারীবাদী নামের আগাগোড়া সুবিধাবাদীদের কথা ভাবলে। সুপ্রীতি ধরত ভিক্টিম হিসেবে যেসব স্ক্রিনশট দেখিয়েছিলাম ওকে, সেগুলোর মধ্যে যেখানে যেখানে আমার ইমতিয়াজের প্রতি দুর্বলতার কথা প্রকাশ পায়, সেগুলো তুলে দিয়েছিল ইমতিয়াজের আরেক সাফাই গাওয়া তথাকথিত নারীবাদী শাশ্বতী বিপ্লবকে।

অদ্ভুত আয়রনি হলেও সত্য হিসেবে আমার কাছে জমা রইল এই যে– নারীবাদী নাম ধরে সমতায় বা অধিকারে বিশ্বাস না করারাও নিজেদের নারীবাদী হিসেবে পরিচিত করতে পারে। অনেকটা পুরুষতান্ত্রিক সমাজে 'বোরখা' বা 'হিজাব' পরা মেয়েরা ভালো মেয়ে– তেমনই একটা সাইনবোর্ডের মতো। অথচ পুরুষতান্ত্রিক সভ্যতার এই দাসরা জানে না কেউ প্রতারিত হলে, নিজেকে প্রতারিত অনুভব করলে সেই প্রতারণাও একটা অপরাধ। একসময় খোদ উপমহাদেশেই আঠারো বছর কমবয়সি মেয়েদের বিয়ে দেওয়া আইনের চোখে অপরাধ ছিল না। অপরাধ ছিল না সতীদাহের মতো স্বামীকে প্রভু জ্ঞান করার সাথে তার মৃত্যুর পর একইভাবে জীবন্ত পুড়িয়ে মারাও, ছিল ধর্মীয় বিধান। এমনকি বাংলাদেশে এখনও লিভ টুগেদার বৈধ নয়, সমকামিতার বিরুদ্ধে আইন আছে। অথচ পশ্চিমে এসে আমার জার্মান বন্ধু টিমো আর তার প্রেমিককে দেখেছি প্রকাশ্যে চুমু খেতে, একই লিঙ্গের মানুষ হয়ে ভালোবাসায় হাত ধরতে। সেই ভালোবাসা কি অপরাধ?

না, ভালোবাসা অপরাধ না।

জীবজগতের প্রায় ১০% সমকামী। এই স্বাভাবিক সেক্সুয়াল অরিয়েন্টেশানকে মেনে নিতে না পারা দেশ ও জনপদের একদল নারীবাদী নাম ধারণ করা পুরুষতন্ত্রের দাস কেমন করে বুঝবে মিথ্যে কথা বলে প্রেম করা, মিথ্যে আশ্বাস দেওয়ার স্বপ্ন দেখিয়ে সম্পর্ক করাও প্রতারণা হতে পারে?

দিনের পর দিন প্রেমের মিথ্যে কথা বলে প্রতিদিন একজনের আবেগ নিয়ে খেলাও জঘন্য পুরুষতান্ত্রিক আচরণ হতে পারে?

তাই আমার এক সাবেক মিশরীয় বন্ধুকে যখন বলেছিলাম– আমি চেয়েছি প্রতারকটার শাস্তি হোক, আমি চেয়েছি মানুষ জানুক ও মিথ্যে বলে, স্ত্রীর নামে কুৎসা রটিয়ে মেয়েদের অনুগ্রহ চায়, তখন আমার মিশরীয় বন্ধুও বাংলাদেশের তথাকথিত নারীবাদীদের মতো আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলেছিল– আমি মনে করি না ওর আচরণ জনসম্মুখে বলে তোমার কোনো লাভ হয়েছে। জনসম্মুখে প্রতারণার কথা বলা কি এমন লোকের শাস্তি হতে পারে?

আমি ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলেছিলাম– পারে, অবশ্যই পারে!

এরপর তাকে লিখেছিলাম– We don't have any law right now that doesn't mean it's not a crime. We didn't have laws against slavery and child marrige. But now we have. That's my fucking point that the lawsuit still is so patriarchal. I suffered a lot by that man as I could commit suicide that time.

If I commit suicide, that time this fucking legal system would punish him as he was the influencer behind it. Just because I survived, that doesn't mean– it wasn't a crime or it's just an immoral 'Wrong'. Understand?

আমার মিশরীয় বন্ধু মাথা ঝাঁকিয়ে বলল– ইয়েস, আই ডু!

আমার বন্ধুকে বলা হলো না– একশো বছরেরও কম সময় আগে যে সমাজ ধর্মীয় বিধানের নামে স্বামী মারা যাওয়ার পর স্ত্রী নামের জ্যান্ত নারীটিকে চিতায় আগুন দিয়ে পোড়াত, যে সমাজ আর যে আইন আমাদের মরে যাওয়ার প্রেরণা দেয়, প্রতারণার পরে প্রবল ডিপ্রেশনেও শক্ত হাতে হাল ধরে না মরে প্রতিবাদ করলে চরিত্রের প্রশ্ন তোলে, সেই চরিত্রহীন সমাজকে ও বিচারব্যবস্থাকে আমি আমার চরিত্রের ভার দিইনি! সেই সমাজ আমাকে ত্যাজ্য করার আগে, আমি ওই সমাজকে ত্যাজ্য করেছি এবং বেশ করেছি। আমার ভার আমিই বইতে জানি, সেই ভার অমন সমাজের হাতে দেওয়ার মতো অক্ষম যেন কখনো না হই!

মালিকানা

তুমি একজন নারীবাদী!

এই কথাটা যে জীবনে আমাকে প্রথমবারের মতো বলেছিল সে আমার বহু প্রাক্তনদের মধ্যে একজন। একবার আমি সব বিষয়ে মত দিচ্ছিলাম এবং দুর্ভাগ্যবশত আমার কোনো উত্তরই তার পছন্দ হচ্ছিল না। দেখা গেল আমার পছন্দের খাবার, পোশাক, চলাফেরা কোনো বিষয়েই সে সুখী না। ফলে একদিন সে বলে বসল— তুমি আসলে নারীবাদী!

বাংলাদেশের যেকোনো মেয়ের থেকে কিছুটা আলাদা জীবন কাটাতাম আমি। তবুও নারীবাদী শব্দটা শুনে কেন খাবি খেয়েছিলাম তা ভাবতে গেলে এখনও খাবি খাই। কারণ সম্ভবত 'নারীবাদী' শব্দটা শুনে আমরা যে অভ্যস্ত নই, তা নয়। সমস্যা হচ্ছে— শব্দটা একটা না—বাচক শব্দ আমি যে সমাজ থেকে এসেছি সেখানে। অর্থাৎ এটা যে কোনো ভালো শব্দ নয়, সেটা আমি জেনে গিয়েছিলাম সমাজের বদৌলতে। কারোর বিয়ে না টিকলে, কেউ রাত করে বাড়ি ফিরলে, কারোর বন্ধুদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা একাধিক হলে সমাজে সেই মেয়েকে ডাকা হয়— নারীবাদী। শব্দটা প্রশংসাসূচক কিছু না।

শব্দটা শুনে মনে হয়, বলছে— তুমি একজন জঙ্গি!

অবশ্য আমি আমার সেই প্রাক্তন প্রেমিককে সাধুবাদ জানাই যে আমি একজন নারীবাদী কি না সেটা সংক্রান্ত আমার নিজের যত বিভ্রান্তি ছিল সেসব দূর করতে সে বিরাট ভূমিকা রেখেছে। যদিও আজকাল আমি প্রায়ই ইয়ার্কি করি— আমাদের রুচির উন্নতি কতটা হলো সেটা বোঝা যায় আমাদের প্রাক্তন প্রেমিকদের তালিকা দেখলে!

যা-ই হোক, আমার অন্যতম এই প্রাক্তনটির ধারণা ছিল যারা মূলত মেয়ে হয়ে ছেলে সাজতে চায় তারা হলো নারীবাদী। অর্থাৎ একটা পেশিবহুল

চরিত্র হলো– নারীবাদী। তার মতে– যার জীবনে দুঃখের শেষ নেই এবং সুখ হলো মরীচিকা এবং যার অবাধ যৌনক্ষুধা, যে শরীরের স্বাধীনতা চায়– সে–ই হলো নারীবাদী।

'শরীরের স্বাধীনতা' বলতে সে বুঝত– যে মেয়ে চাহিবামাত্র ব্রায়ের হুক আর প্যান্টি খুলে দেবে যেকোনো পুরুষকে! অথচ তার বোঝার কথা ছিল উলটোটা, বোঝার কথা ছিল– যে মেয়ে 'হ্যাঁ' ও 'না' বলার অধিকার চাইছে সে–ই নারীবাদী।

অবশ্য এই অবেলায় তাকে দোষ না দিই।

তার মতো আমাদের দেশের ছেলেরা বেশিরভাগই 'হ্যাঁ' এবং 'না'–এর পার্থক্য বোঝে না। প্রেমের জন্য ছ্যাঁচড়ামি করে, নায়িকার বাড়ির সামনে প্রতিদিন এসে ছ্যাবলামি করে বিরক্ত করে যাওয়া বাঙালির নাটক–সিনেমার আদর্শ প্রেমের উদাহরণ! আমার সাথে প্রেমের মধুর সম্পর্কের মাঝে সমস্যার সূচনার সময়ে তা–ই হয়তো তার প্রধান বাণী ছিল– নারীবাদ আমাদের সংস্কৃতি নয়, পশ্চিমা সংস্কৃতি!

আজকাল তাই প্রায়ই আমার তাকে ডেকে বলতে ইচ্ছা করে– আমাদের সংস্কৃতি কি তাহলে ধর্ষণ করা? নাকি বউ পিটানো?

কারণ এক প্রতিবেদনে দেখেছিলাম বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারের সূত্র মতে ২০০১ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত ধর্ষণ ও নির্যাতনের শিকার হয়ে চিকিৎসা নিতে আসেন ২২,৩৮৬ জন নারী, এর মধ্যে মামলা হয় ৫০০৩টি ঘটনায়, রায় হয় ৮০২টি ঘটনায়, শাস্তি পেয়েছে ১০১ জন। রায় ঘোষণার হার ৩.৬৬ ভাগ, শাস্তির হার ০.৪৫ শতাংশ। অর্থাৎ ২২২ জন ধর্ষকের মধ্যে একজনের সাজা হয়। ফলে যারা ধর্ষণ করে তারা জানে, ধর্ষণ বাংলাদেশের আবহমানকালের সংস্কৃতি, তারা জানে– তাদের বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা ৫০%–এর বেশি!

আবার বাংলাদেশের আরেক জাতীয় দৈনিক ডেইলি স্টার বলছে দেশের ছেলেরা সেক্সে অস্বীকৃতি জানানোয় বউ পিটায় ৬৪ ভাগ। অন্যদিকে বাল্যবিবাহ আর বাল্যবিবাহের ফলে রক্তাক্ত যোনি নিয়ে ডাক্তারের কাছে আসার ঘটনার তো পরিসংখ্যানও নেই! কিংবা পাবলিক বাসের মধ্যে যে মেয়েদের গায়ে হাত দেওয়া হয় যত্রতত্র, তাদের হিসাবই বা কে রেখেছে?

যা-ই হোক, বলছিলাম– আমার এই 'নারীবাদ আমাদের সংস্কৃতি না' বলা প্রাক্তন প্রেমিকটির চরিত্রের একটি মজার দিক হলো– সে অর্থনৈতিকভাবে আমার ওপর নির্ভর করতে কখনো কসুর করত না। শতকরা

নব্বই ভাগ সময় রেস্টুরেন্টে দুজনে খাওয়ার পর যে বিল দেওয়ার ওয়ালেট এগিয়ে দিত, সেটা সে নিজের হাতে এগিয়ে দিত। অথচ টাকাগুলো যেত আমার পকেট থেকে!

আর বাংলাদেশের রেস্টুরেন্টের ওয়েটারগুলো এমনই গাড়ল যে তারা ভাবত যেহেতু একটা ছেলে আর মেয়ে খেতে এসেছে তাহলে টাকাটা ছেলেটার পকেট থেকেই আসে!

এরই মাঝে যেদিন আমি আমার প্রেমিককে বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করি— লোকটা সবসময় বিলের জন্য তোমার দিকে হাত বাড়ায় কেন? সে রুক্ষ গলায় বলে ওঠে— তুমি নারীবাদীদের মতো কথা বলছ!

আমি আবারও অবুঝের গলায় বলি— টাকাটা তো আমি দিচ্ছি, ও কেন তোমার দিকে তাকায়? আমার প্রাক্তন আচমকাই খেঁকিয়ে ওঠে— তুমি কি আমাকে খোঁটা দিচ্ছ? টাকার খোঁটা?

অর্থাৎ, আমি আশ্চর্য হয়েই নিশ্চিত হলাম— টাকাগুলো তার না, তারপরও অন্যের টাকা অর্থাৎ আমার টাকা নিজের হাতে এগিয়ে দিতে সে ভালোবাসে! এই টাকাগুলো তার না, সে উপার্জন করেনি, কিন্তু তার কর্তৃত্ব দেখানো চাই! এর কারণ কী?

এর কারণ হচ্ছে— সে সেই কর্তৃত্ববাদী লোক যে তার পেশিশক্তি এবং লিঙ্গের কারণে নিজেকে মালিক বা কর্তৃপক্ষ বলে ভাবে। ভাবে— টাকাগুলো যার পকেট থেকেই যাক, সে জেন্ডারগতভাবে মালিক। এবং মালিকানার এই মানসিকতাকেই আমরা আজকাল আদর করে ডাকি— পুরুষতান্ত্রিকতা।

আবার ধরেন সেই ওয়েটারের কথা, যে আমার প্রাক্তনের দিকে টাকার জন্য ওয়ালেট এগিয়ে দিত, কারণ সে ধরেই নিয়েছিল— নারী বলে টাকাটা আমি দেব না, দেবে আমার পুরুষ বন্ধুটি!

একইসাথে এও সত্য— রেস্টুরেন্টের বিল দেওয়া থেকে শুরু করে যাবতীয় বিল সংক্রান্ত ব্যাপার আমাদের দেশে পুরুষই বেশিরভাগ সময় বহন করে এবং নারীরা এতেই অভ্যস্ত। পিতৃতান্ত্রিক এই ব্যয়ভার তুলে দেওয়ার মানসিকতা এবং ব্যয় বহনের মানসিকতা, সবই পুরুষতান্ত্রিক সভ্যতার মহান উপহার।

এমনকি পশ্চিমে এসে আমি দেখি— এইসব দেশে 'সুগার ড্যাডি' নামের এক অদ্ভুত শ্রেণির পুরুষের উদ্ভব হয়েছে। 'সুগার ড্যাডি' নামধারী বাপের বয়সি এই বুড়োরা টাকা খরচ করে দামি কাপড় কিনে দেয়, দামি পারফিউম আর দামি রেস্তোরাঁয় বিল দেয়, বিনিময়ে পুরুষতান্ত্রিক সভ্যতার সৌন্দর্যের মানদণ্ডে সুন্দরী নারীটির সঙ্গ কেনে এরা।

আমাদের দেশের ক্রয়–বিক্রয় অবশ্য ভিন্নধর্মী। যেমন আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে সমাজ ধরেই নিয়েছে গ্রাজুয়েশনের পরে ছেলেটা চাকরি করে রোজগার করবে আর মেয়েটার বিয়ে হবে। বলে রাখি– বিয়ে একটা সুন্দর বিষয়। আমি নিজে বিয়ে করেছি। এখন পর্যন্ত বিয়ে আমার কাছে একটা চমৎকার ব্যাপার। কিন্তু দুঃখজনকভাবে আমার 'বিয়ে হয়নি'। আমার বিয়ে হয়নি, কারণ আমি বিয়ে করতে চেয়েছিলাম। মুসলিম প্রধান দেশ হওয়ায় বিয়েতে দেনমোহর নামের অস্বাস্থ্যকর একটা অভ্যাস ওই সমাজের আছে। এই দেনমোহরটি হলো নারীর যোনির দাম!

তাই আমার সমাজে 'মেয়েটা বিয়ে করবে'– সেই ধারণাটাই তাদের নেই। আবার সমাজের ধারণা যে মেয়ের বিয়ে হবে তাকে কেবল পড়ালেখা বা শিক্ষাগতভাবে যোগ্য আর দক্ষ হলেই হবে না, রান্না পারতে হবে, সে ভালো বাসুক আর না বাসুক– ঘর গুছাতে আর বাসন মাজতে জানতে হবে। রান্না, বাসন মাজা, ঘর ঝাড়ু দেওয়া খুবই জরুরি শিক্ষা, কিন্তু ওদেশে শেখানো হয় 'সংসার' করতে হলে কেবল মেয়েটিকেই এসব জানতে হবে, পুরুষটির এসব জানার বাধ্যবাধকতা নেই।

প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি– আমার বড় ভাইয়েরা প্রত্যেকেই রান্না পারে এবং সেটা সম্ভব হয়েছে আমার মায়ের কারণেই। তিনি শিখিয়েছিলেন– কোনো কাজই ছোট না, রান্নাবান্না খুব জরুরি গুণ জীবনের জন্য।

কিন্তু রান্না না পারা, ঘরের কাজে অদক্ষ হওয়া– শুধুমাত্র জেন্ডারের কারণে দেশের বেশিরভাগ পুরুষ আনন্দের সাথে উপভোগ করে। আমি এমনও একজন নারীকে দেখেছি যে আত্মশ্লাঘার সাথে বলেছে– আমার ভাই কখনো গ্লাসে পানি ঢেলেও খায়নি!

আমি এমনও গৃহবধূকে চিনি যিনি তার হাজব্যান্ডকে নিজের হাতে ভাত তুলে খাওয়ান, কারণ বিয়ের সময় তিনি জেনেছিলেন এই অথর্ব পুরুষ কখনো নিজের হাতে ভাত তুলে খায়নি!

এমন না যে তাদের হাত নেই, এমন না যে এই পুরুষরা কোনো শারীরিক প্রতিবন্ধকতায় ভুগছেন। কিন্তু শুধুমাত্র জেন্ডারগত কারণে এত পরনির্ভরশীলতা পার পেয়ে যায়।

বাংলা ভাষায় 'স্বামী' ডাকা হয় বিয়ের পর পুরুষসঙ্গীটিকে, এই 'স্বামী' মানে প্রভু বা ঈশ্বর! আমি অবাক হয়ে দেখেছি দেশের সিংহভাগ ঈশ্বররূপী পুরুষই উপভোগ করে নিজের অদক্ষতা আর অযোগ্যতাকে। উপভোগ করে কারণ রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে পরিবেশের কথা না ভেবেই এরা মূত্র ত্যাগ করে,

খালি গায়ে হাতের পেশি দেখিয়ে পাড়া বেড়িয়ে আসে, নাক খুঁটতে খুঁটতে যেকোনো জায়গায় হাত মুছে ফেলে– কারণ তারা পুরুষ। তারা জানে তাদের যাবতীয় বদভ্যাস, যাবতীয় অস্বাস্থ্যকর আচরণকে সমাদর করা হবে, কারণ তারা– পুরুষ! তারা জানে সমাজের মালিক তারাই।

যে কারণে আমার প্রিয় শান্তিতে নোবেল বিজয়ী কেনিয়ান স্কলার ওয়াংগারী মাথাই নারীদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন– যত ওপরের দিকে যাবে দেখবে তুমি একা হচ্ছ! কারণ তিনি জানতেন সম্পদের দিক থেকে পৃথিবীর সেরা ধনী ব্যক্তির তালিকা করা হলে তার মেজরিটি থাকবে পুরুষের হাতে।

কয়েক বছর আগে অক্সফামের একটা পরিসংখ্যান দেখেছিলাম যেখানে দুনিয়ার মোট সম্পদের মালিকানার ৯৯% পুরুষের হাতে, আর ১% মেয়েদের হাতে বলে দাবি করা হচ্ছিল। তার মানে আমরা সমতা থেকে এমন পিছিয়ে আছি যে দেখা যাবে নারীবাদ বিষয়ে আমি যাই লিখব– সেটা দিয়ে পুরুষতান্ত্রিক প্রভুদেরই সম্পত্তি বাড়ানোতে ভূমিকা রাখবে! এমনকি নারীবাদ অথবা 'পিতৃতান্ত্রিক' শব্দগুলোও পুরুষতন্ত্রকে কেমন করে সাহায্য করছে তা ভেবে আমি মাঝেমধ্যে দিশাহারা হয়ে যাই। মালিকানার ব্যাপারটা আমাকে আতঙ্কিত করে, কারণ আমি জানি মালিক তখনই হওয়া যায় যখন দাস হিসেবে কাউকে পাওয়া যায়!

মালিকানার এই সীমানা এত বিস্তৃত হতো না যদি না ধর্মগুলো সম্পত্তির বন্টনের অসাম্য ঈশ্বরের নির্দেশ বলে মেয়েদের বঞ্চিত করা শুরুটা না করত। সবাই জানে– সমান যোগ্যতার হয়েও কেবল মেয়ে বলে একই পদে থেকে পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের কম বেতন দেওয়া খুব মামুলি ব্যাপার। এমনকি এই একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে দুনিয়ার মাল্টি বিলিয়নিয়ারদের কোম্পানিগুলোর বেতন কাঠামো খুললেও ওই একই উত্তর মিলবে। এর কারণ এই যে– এটাই হয়ে আসছে, এটাই স্বাভাবিক! অথচ অস্বাভাবিকভাবে স্বাভাবিক হওয়ার এই ঘটনার শুরুটা কোথায়?

অর্থনীতির প্রাথমিক জ্ঞান আমাকে শিখিয়েছে– জমির মালিকানা বদলায়, হীরার মালিকানা বদলায়। যেমন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় হীরা কোহিনুর আছে ব্রিটেনের রাজপরিবারের কাছে, চামচ হীরা আছে ইস্তাম্বুলের মিউজিয়ামে অটোমান শাসকদের সময়কার কালেকশনে। এই সমস্ত রত্নপাথর নিয়ে মারামারি আর রক্তারক্তিও কম হয়নি, কিন্তু দুনিয়ায় যে জিনিসের মালিকানা নিয়ে সবচেয়ে বেশি সমস্যা হয়েছে সেটা সম্ভবত নারীর শরীর।

বেশিরভাগ ধর্মের যেসব বয়ান পাওয়া যায়, তাতে প্রায় সব ধর্মেই– নারীর শরীর হচ্ছে দুনিয়ার সবচেয়ে অপবিত্র বিষয়। সেই অপবিত্রকে পবিত্র করতে নারীর গায়ে পরতে পরতে কাপড় উঠেছে, ফতোয়া উঠেছে বুক, চোখ, মুখ– এগুলো সবই 'হারাম'। প্রোগ্রেসিভ নামধারীরা যেসব পর্দার কথা বলে, সেগুলোও মেয়েদের গায়ের ওপর কম কর্তৃত্ব করে না। ফলে জন্মের পর থেকেই নারীর শরীর অচ্ছুত জানা এই আমি, ওই মালিকানাকে একদিন দুই পয়সার দাম দেব না– তা কখনো ভাবিনি। কারণ আর সবার মতো এককালে আমারও মনে হতো– অস্বাভাবিক এইসব ঘটনা অতি স্বাভাবিক!

জীবনের বোঝাপড়ার শুরুতেই অন্য আর দশটা বাঙালি মেয়ের মতো অর্ধেক ইসলামিক, অর্ধেক তথাকথিত প্রগতিশীল জগাখিচুড়ি সমাজের বদৌলতে, বাংলাদেশের অপেক্ষাকৃত 'প্রগতিশীল' পরিবারের বদৌলতে আমি জেনেছিলাম– সমাজের মতে মেয়েদের উচিত 'শালীন' পোশাক পরা। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে 'অশ্লীলতা' শব্দটার মতো শালীন শব্দটাও একটা বিতর্কিত বিষয়। সেই বিষয় বাধ্য হতে শেখায়, সেই বিষয় মেয়েদের নতজানু করে। আমি দেখতাম বুক উঁচু করে সোজা হয়ে দাঁড়ানো আমার সমাজে অশ্লীল। বুকে ওড়না না থাকা অশ্লীল। ব্রায়ের ফিতা দেখা যাওয়া, ঘামে ভেজা জামার তলায় শরীরের গঠন বোঝা যাওয়া অশ্লীল। অথচ পুরুষদের আমি দেখেছি বগলের লোম দেখিয়ে উদোম শরীরে ঘুরে বেড়ালেও তা সমাজের চোখে অশ্লীল না। কারণ ও ছেলে! শুধুমাত্র লিঙ্গের কারণে ওকে মানুষ বলে গণ্য করা হয়, অথচ নারীদের গণ্য করা হয় আধা মানুষ হিসেবে।

আবার আমাদের সমাজ একটা ছেলে ভার্জিন কি না কেয়ার করে না, কিন্তু মেয়েটির অবশ্যই ভার্জিন থাকতে হবে ভেবে মেয়েদের বাবা–মায়েরা তটস্থ!

মানে তাহলে কারিগরিটা কী হবে আসলে?

সব মেয়ে ভার্জিন থাকলে ছেলেগুলো মেয়ে পাবে কোথায়?

যেমন সমাজ, তেমনই বাকি সব আইন!

ইসলামের মতে বোন পাবে ভাইয়ের অর্ধেক, সমাজের মতে– বোনের বিয়ে হয়ে যাবে, ওর ভরণপোষণের দায়িত্ব যে ওকে বিয়ে করবে তার! ওর সম্পত্তি দিয়ে কী হবে?

ফলে নারীর যোনি আর শরীরের মালিকানা বদলকে স্বাভাবিক চোখে দেখা যে সমাজ থেকে আমি এসেছি, সেই সমাজ দির্ঘদিন আমার মাথায়ও আসতে দেয়নি ওই ধর্মের, সেই সমাজের সম্পত্তি বণ্টনব্যবস্থা কত

পুরুষতান্ত্রিক, কত অনধিকার আর অপমানের। বরং নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিতাম এই ভেবে যে আমার মা কখনো ভাইদের তুলনায় অর্ধেক খাবার, ভালো খাবারটা ছেলেকে দেওয়ার যে চল বাংলাদেশের বেশিরভাগ মা জন্মের পর থেকে মেয়ে শিশুদের সাথে করে থাকে– তা কখনো করেননি। কখনো বলেননি– ওটা তোমার ভাই খাবে, তুমি না!

মনে পড়ে সমাজের প্রেক্ষিতে এইটুকু 'অস্বাভাবিকভাবে স্বাভাবিক' জীবন থাকার ফলে, আমার এই অধিকারবোধ ঠিক সেদিন তীব্র হয়েছিল যেদিন দেখেছিলাম রাগারাগি আর ঝগড়ার এক পর্যায়ে আমার মাকে একটা চড় মেরে দিলেন বাবা!

বাংলাদেশের সিংহভাগ নির্যাতিত নারীদের কাছে একটা চড় তেমন কিছু না। নিতান্তই স্বাভাবিক বিষয়। বাংলাদেশের সিংহভাগ নারী–পুরুষ ম্যারিটাল রেপ বা বিবাহ পরবর্তী ধর্ষণ বোঝে না, বোঝে না ইচ্ছের দাম। কিন্তু আমার মায়ের গালে মারা বাবা নামক ব্যক্তির ওই একটা চড় ছিল পুরুষতান্ত্রিক সমাজের হালহকিকত বোঝার মূল চাবিকাঠি আমার কাছে।

যে চাবিকাঠি পরবর্তীতে আমাকে শিখিয়েছে প্রতিবাদী হতে, শিখিয়েছে পায়ের তলার মাটি শক্ত করতে।

তবে সত্যি কথা কি জানেন?

সেদিনের পর থেকে নিজের বাবাকে কখনো বাবা বলে ভাবতে পারিনি আমি। বাবা মানে সেই থেকে একজন 'স্পার্ম ডোনেটর'। যার শরীর থেকে আসা শুক্রাণু ছাড়া আমার জীবনে তার ভূমিকা নেই!

আমার মায়ের গালে পড়া সেই 'সামান্য চড়' আমাকে জানিয়েছে– তোমার জীবনের প্রথম পাঠ, এই চড়টি, যেটি তোমার মায়ের গালে পড়েছে! এই চড় সংক্রান্ত কিছুই তোমাকে তোমার স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে শেখানো হবে না, কিন্তু জানবে 'সুখী পরিবার' সেজে সমাজ নামের মঞ্চে তুমি বাবা–মা'কে একসাথে যতবার সবার বাবা–মা'র কাতারে দাঁড় করাবে, এই চড়টাই তোমাকে তোমার দিকে চোখ রাঙাবে!

ছোটবেলায় আবেগ তীব্র থাকে। সেই জ্বলজ্বলে আবেগে ভর দিয়েই আমার ভীষণ ঘেন্না করেছে সেই লোকটিকে যে লোকটি কথায় না পেরে, রাগারাগিতে না পেরে তার স্ত্রীর গায়ে হাত তোলে। কারণ আমি সেই বয়সেই টের পেয়েছিলাম 'অসম্মান' আসে কাউকে ছোট করা, কম মানুষ মনে করার চর্চা থেকে। আর সেই চর্চা নিজেই এক সংস্কৃতি! অসম্মান আসমানি কিতাবের মতো কোনো গুহায় নাজিল হয় না। অসম্মানের জন্ম

সেই সংস্কৃতিতে– যেখানে শ্লীল ও অশ্লীলের পার্থক্য শেখানো হয় পোশাকে, লিঙ্গে, চালচলনে।

অবশ্য এই ঘটনার আগে বাবার সাথে আমার সম্পর্ক ছিল আর দশটি আহ্লাদী কিশোরীর মতো। তাই ঘটনার আগ পর্যন্ত আমার সবচেয়ে মধুর স্মৃতি ছিল আমার শৈশবের খেলার সাথি পুতুল সূর্যমুখীকে কিনে আনা। বিরাট এক তুলার পুতুল, যাকে ঘাড়ে ঝুলিয়ে আমি ঘুরতাম মাঠে মাঠে! কিন্তু আমার মায়ের গালের চড়ের ব্যথাটা হয়তো আমার হৃদয়ে লেগেছিল। আর লেগেছিল বলেই, এই ঘটনার পর আর কোনো উল্লেখযোগ্য ভালো স্মৃতি আমার মনে পড়ে না বাবার সাথে!

এখন আমাকে আপনি প্রশ্ন করতে পারেন– তবে কি নিজের বাবাকে এখনও ঘেন্না করেন আপনি?

আমার উত্তর হবে– না, ঘেন্না করি না।

ভালোবাসার মতো ঘৃণার রঙও বদলায়। তাই হয়তো ঘৃণার রঙ ফিকে হয়েছে। হয়তো লোকটি বৃদ্ধ হয়েছে একথা ভেবেই। তবে নিশ্চিত জানি এই লোকটিকে আমি ভালোবাসি না, শ্রদ্ধাও করি না। শ্রদ্ধা না করার কারণ যে কেবল সেই চড় তা–ও না। শ্রদ্ধা না করার প্রধান কারণ এই যে– অশিক্ষিত স্বৈরশাসকদের মতো আমার বাবা আমার শৈশব ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। টাকা–পয়সার নয়ছয় আর লোকের কাছ থেকে চাকরির জন্য টাকা নিয়ে সেই টাকা গায়েব করে দেওয়া– এটা ছিল আমার বাবার প্রিয় খেলা। সেই টাকাগুলো বাবা কী করতেন তা এখন অবধি আমি জানি না!

জুয়া খেলতেন? কোনো পঞ্জি স্কিমে ইনভেস্ট করতেন?

না, এখন পর্যন্ত আমরা ভাইবোনেরা কেউই জানি না তিনি কী করতেন। আমি ক্রমেই টের পেয়েছিলাম আমার চার সন্তানের জননী মা'টি কত অথর্ব। অথর্ব কারণ তিনি চাকরি করেন না, টাকা উপার্জন করেন না। তার অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নেই! আর তাই খুব কম বয়সেই আমি জেনেছিলাম– পুঁজিবাদী দুনিয়ার আল্লাহর নাম টাকা! পুঁজিবাদী দুনিয়ার মালিকানার নাম টাকা। পুঁজিবাদী দুনিয়ার ইচ্ছের দামও টাকা।

আমার লেখাপড়ার সুযোগ না পাওয়া সমাজের চোখে 'অল্প শিক্ষিত' মা'টি যে এই অথর্ব লোকটির বিয়ে করা গোলাম, তাও বুঝেছিলাম। বুঝেছিলাম যখন বাজারে দাস কিনতে পাওয়া যেত, তখনকার চেয়ে উন্নত কিছু নয় ওদেশে মা হওয়া!

অবশ্য পরে অনেকবার নিজেকে জিজ্ঞেস করেছি– আচ্ছা, আমি কি মাতৃত্ব ঘৃণা করি?

উত্তর হচ্ছে— না। তবে কেন জানি এখনও পর্যন্ত কখনোই শারীরিকভাবে আমার কখনো মা হতে ইচ্ছে করেনি। কিন্তু মানসিকভাবে কি আমি মা হইনি? আমার তো নিজেকেও মাঝেমধ্যে আমার মায়ের মা বলে মনে হতো! মনে হতো আমার মায়ের হাতটি ছুঁয়ে বলি— এই হাত যেসব দুঃখের সাক্ষী, তার অর্ধেক ভার আমাকে দাও!

সে যাক, আমার দরিদ্র মা'র আর্থিক সংগতি না থাকুক, কিন্তু মনটি ছিল বিরাট ধনী। সেই মনটি চাইত তার ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করবে, মানুষ হবে, গ্রাজুয়েট হবে, আর্থিক সংগতি হবে। আর কে না জানে, বাংলাদেশে লেখাপড়া করা মানে কেবল পশ্চিমের ভাষায় স্কলার হওয়া না, বরং টাকা হওয়া, পকেটে জোর থাকা। ফলে মা তার কর্মপরিকল্পনার জন্য এগিয়ে গেলেন। সতেরো বছর বয়সের অপরিপক্ক শরীরে জন্ম দিয়েছিলেন আমার বড় ভাইকে, চল্লিশের পরে জন্ম দিলেন আমাকে। মাঝে আরও দুই ছেলেমেয়ের জন্ম হলো। এর মধ্যে নানান যুদ্ধ করে আর চড়াই–উতরাই পেরিয়ে গ্রাম থেকে শহরে এলেন। আমাদের নিয়ে এগিয়ে চলল আমার মায়ের জীবন।

আমার নানা রেলওয়েতে চাকরি করতেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর যুদ্ধে লুঠ হয়ে যাওয়া বাড়িঘরের জিনিসপত্র হারিয়ে নিঃস্ব হওয়ার পর তিনি ভেবেছিলেন দ্রুতই মরে যাবেন চাকরি থেকে অবসরের পর। তাই কালবিলম্ব না করে সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ উপজেলার তিননান্দিনা গ্রামের এক কৃষক পরিবারের ছেলের সাথে নিজের ইন্টারমিডিয়েট পড়ুয়া ছোট মেয়েটির বিয়ে দিলেন। একবারও ভাবলেন না শহরে সংস্কৃতিমনা পরিবেশে বড় হওয়া মেয়েটি কেমন করে মানিয়ে নেবে গ্রামের ওই বৈরি পুরুষতান্ত্রিক পরিবেশে— যেখানে নারী মানে মূলত দাস, হালের বলদ। একবারও ভাবলেন না নাচ শেখা সময়ের তুলনায় আধুনিকা ওই মেয়েটিকে গ্রামীণ সমাজে ডাকা হবে— নর্তকী, আড়ালে করা হবে কটাক্ষ!

নানা কেবল বিয়েই দেননি, আমার বাবাকে চাকরিটিও তিনি দিয়েছিলেন এবং এই শর্তেই বিয়েটি হয়েছিল। এখন ভাবলে শরীর–মন ঘিনঘিন করে আমার এই ভেবে যে— কী নোংরা পাশবিক একটা ব্যাপার আছে অমন বিয়েতে, সেটা কি আমার নানা আন্দাজ করেছিলেন?

না, তিনি করেননি। আর করেননি বলেই বাংলাদেশের আর সব পুরুষ প্রভুর মতো আমার মায়ের জীবনের সিদ্ধান্তটি নিয়েছিলেন আমার নানা, মহান পুরুষ, বাংলাদেশের পুরুষতান্ত্রিক গ্রাম্য মফস্‌সলী সমাজে যাদের

আদর করে 'বংশের বাতি' ডাকা হয়! যেকোনো পুরুষতান্ত্রিক প্রভুর মতো নানা কেবল মালিকানা বদল করেছিলেন নিজের কন্যার।

অথচ যে মৃত্যুর আতঙ্কে আমার মায়ের তড়িঘড়ি বিয়ের ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন, করে ভেবেছিলেন বিরাট দায়িত্ব সেরেছেন, আমার সেই নানা কিন্তু নব্বই বছরের বেশি বয়সে মরেছিলেন ২০০৬ সালে। আমাকেও দেখেছিলেন। ক্লাস ফোর কিংবা ফাইভে পড়ুয়া সেই আমি তাকে প্রশ্ন করেছিলাম— কী মনে করে আমার মায়ের বিয়েটা অমন তড়িঘড়ি করে যার-তার সাথে বিয়ে দিয়েছিলে তুমি?

আমার বৃদ্ধ নানা আমার পাকামোতে হেসে বলেছিলেন— সেই সময় এটাই সবচেয়ে ভালো সিদ্ধান্ত ছিল!

আমি বলতে পারলাম না— আহা! কী ভালো করে তোমার মেয়েকে সম্বোধন করেন ওই লোকটি, তা যদি দেখতে! আর যদি দেখতে ওই চড় দেওয়ার দৃশ্যটা! বুঝতে তোমার মেয়ে কত সুখেই আছে!

সেসময় ছোট ছিলাম বলেই হয়তো বলতে কেমন জানি বাধছিল! কেন যেন আমার মায়ের গালে চড় মারার দৃশ্যটা মনে পড়তেই মনের মধ্যে কুঁকড়ে দিয়েছিল আমাকে। তবে আজকাল খুব আফসোস হয়, কেন বলিনি তখন?

যা-ই হোক, জন্মের পর বোধ হওয়ার পর থেকেই দেখতে লাগলাম বাবা নামের লোকটি নানান সময়ে নানান যন্ত্রণায় ফেলতে লাগলেন আমাদের। ছেলেমেয়েদের সাথে ঝগড়া করে বাসা থেকে ঈদের আগের দিন টাকাগুলো বগলদাবা করে বেরিয়ে যান বাসা থেকে। তিনি নিজের ভাইরা চাহিবামাত্র গিয়ে টাকা দিয়ে আসতে পারেন, কিন্তু ছেলেমেয়েদের পড়ার বই কিনে দিতে পারেন না।

লোকের ডাকটিকিটের শখ থাকে, মুদ্রার শখ থাকে, আমার বাবা টাকা ধার করেন শখের বসে, পাওনাদারদের টাকা ফেরত দেন না, কিন্তু তার পক্ষের কোনো আত্মীয় এলেই তিনি বিশাল মাছ—মাংসের মোচ্ছব নিয়ে বসেন।

আমার মনে আছে, মায়ের পক্ষের আত্মীয়দের সাথে তথাকথিত ভালো ব্যবহার ছাড়া আর কিছু করেননি তিনি, ভালো কিছু কিনতেও চাননি। বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন, আমার মাকে বারবার যে সংসারের তিনিই রাজা, প্রজার প্রজার মতো থাকাই আমার মায়ের জীবনের ভবিতব্য!

খুব কম বয়সেই ধর্ষণ সম্পর্কে পড়াশোনা করার ফলে আমার একবার কৌতূহল হয়েছে জানতে, অতি অস্বাস্থ্যকর কৌতূহল— আচ্ছা, আমি কি কোনো ম্যারিটাল রেপের ফসল? যে লোক আমার মায়ের ইচ্ছার কোনো

দামই কখনো দেয়নি, সে কি আমি জন্মানোর আগে আমার মায়ের ইচ্ছার দাম দিয়েছিল?

আমি জানি না। কিন্তু খুব করে জানি, দুনিয়ার পুরুষদের প্রতি বিতৃষ্ণার আর ভরসা না পাওয়ার প্রধান কারণ আমার প্রাক্তন প্রেমিকরা ছিল না, ছিল না পত্রিকার পাতায় অহরহ নারী নির্যাতন করা কিংবা কিশোরী শরীরের প্রতি বিকৃতমাত্রায় আগ্রহীরা। পুরুষদের প্রতি আমার বিতৃষ্ণার মূল কারণ ছিল আমার বাবা!

যার কারণে খুব কম বয়সেই আমি জেনে গিয়েছিলাম জন্ম দিলেই বা দুটো ভাত মুখে তুলে দিলেই বাবা হওয়া যায় না। বাবা–মা হতে হয় মন থেকেও। নইলে দেশ থেকে আসার শেষ মুহূর্তেও আমি দেখেছি মেয়ের নামে বাক্‌স্বাধীনতা বিরোধী আইনে মামলা চলা সময়ে রিটায়ারমেন্টের পরে প্রভিডেন্ট ফান্ডের সমস্ত টাকা তুলে নয়ছয় করা যায়, চাকরির আশ্বাস দিয়ে লোকের অভিশাপ কুড়ানো, অনিশ্চিত ভবিষ্যতে চলার জন্য টাকার হিসাব চাইলে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার খোঁটা দেওয়া যায়, চূড়ান্ত অপমান করা যায় নিজের জীবনসঙ্গীকে।

আমার বিরুদ্ধে মামলা চলাকালীন রাষ্ট্রীয় নাটকের পাশাপাশি বাবা যেহেতু প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা তুলে নিয়ে আমার মায়ের সাথে ঝগড়া করে ঘর থেকে অভিমান করে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, তখন নিজের খরচ চালাতে ওই করোনাকালীন মহামারিতে আমার একমাত্র সম্বল হয়ে ওঠে সোশ্যাল মিডিয়া। পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি আর টাকা উপার্জন, দুইই আমি চালিয়ে নিয়ে যাই। নিজের পেইন্টিং থেকে শুরু করে গয়নার বাক্স আর ডিজাইন করা কাপড় বিক্রির প্ল্যাটফর্ম হয়ে ওঠে আমার সোশ্যাল মিডিয়া। রাত জেগে পরীক্ষার পড়া করব নাকি শিল্পকর্ম বানাব বিক্রি করার জন্য, তার ঠাহর পাই না।

কেবল যন্ত্রের মতো জেনেছি– নিজের সংগ্রাম নিজেকেই করতে হয়। নতুন করে পুরাতন ঘটনার পুনরাবৃত্তির মতো দেখেছি বাবার সাথে আমার মায়ের সম্পর্ক ছিল সম্পর্কের মালিকানার, সেই সূত্রেই খুব অল্প বয়সে আমি জেনে গিয়েছিলাম– ওই বিষাক্ত ক্ষমতাপ্রবণ সম্পর্ক দুনিয়ার কোনো যুবকের সাথেই আমি কখনো চাই না।

তখন আবারও ভেবেছি অতীতের কথা। অতীতে যেসব সম্পর্ক চাই না বলেই ছেড়ে এসেছিলাম আমার সেইসব প্রাক্তনদের যাদের জন্মগতভাবে মজ্জাগত ছিল– তারা মালিক! তাদের ধারণা ছিল নারীবাদীরা কখনো সুখী হয় না। এর কারণেই কি না জানি না, আজকাল আমি সবসময় নিজের পরিচয় দিই একজন সুখী নারীবাদী হিসেবে!

বরং আমি বারবার মনে করতে চাই সেই অদ্ভুত সোনালি সময় যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন সময়ে পাবলিক বাসে যাতায়াত করতে গিয়ে আমার সাভারের গার্মেন্টস শ্রমিক নারীদের সাথে দেখা হতো। কিংবা যখন আমি দেখেছিলাম সেই মেয়েদের যাদের আমার দেশ রাষ্ট্রীয়ভাবে দাসবৃত্তি করতে সৌদি আরবসহ কাতার, বাহারাইনের মতো দেশগুলায় পাঠায়। যেখান থেকে আমাদের মেয়েরা ধর্ষিত হয়ে, লাশ হয়ে ফিরে আসে এবং হাজার হাজার ডলার রেমিট্যান্স যুক্ত হয় দেশের রিজার্ভে। কিন্তু ওইসব ধর্মের দালালদের আমার দেশ মুখ ফুটে বলতে পারে না– আমরা আর মেয়েদের পাঠাব না যতক্ষণ না এর সুরাহা হচ্ছে।

শেষমেশ দুর্নীতিবাজ দেশের কাছেও ওই হতভাগা মেয়েরা 'যুদ্ধের উচ্ছিষ্ট' ছাড়া আর কিছু না। যে কারণে আমি সবচেয়ে ঘৃণা করি– নারীর 'ক্ষমতায়ন' নামের শব্দটাকে।

যে ক্ষমতা সবসময় পুরুষতান্ত্রিক সমাজের হাতেই থাকে, সেটির ভূমিকায় নারী ও পুরুষ যে–ই থাকুক, সেটা কেবল মানুষকে শোষণ করে। যে একই কারণে নারী প্রধানমন্ত্রী, বিরোধীদলীয় নেতা হলেও তারা পরিচিতি পায় 'জাতির পিতার কন্যা' এবং 'বিগত রাষ্ট্রপতির স্ত্রী' হিসেবে। কিন্তু নারীর পোশাক, চাকরি কিংবা সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা নিয়ে ফতোয়া অব্যাহত থাকে, নারীর ওপর পারিবারিক সহিংসতা, হত্যার পর আর ধর্ষণের পর তার চরিত্র নিয়ে কাটাছেঁড়া চলে, আর অন্যদিকে পুরুষতন্ত্র তার বিজয়ের পতাকা ওড়ায়!

মাঝেমধ্যে আফসোস লাগে– আজও দেশের মেয়েরা এখনও জানে না পুরুষতন্ত্র তার পতাকা ঠিক ততদিনই ওড়াবে যতদিন ওদেশের মেয়েরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসবে এবং এসে নিজেদের দাবি আদায় করবে। তার আগ পর্যন্ত যত মুক্তির আন্দোলন আর সংগ্রাম হবে সেগুলো সব বৃথাই যাবে। বৃথা যাবে কারণ পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর যোনির দাম সবসময়ই সমান থাকে, সবসময় বাবা বা স্বামীর হাতবদলেরই হাতিয়ার হয়, যদি না নারী নিজের যোনিকে নিজের বলে দাবি করে!

আর কে না জানে, নিজের শরীর ও যোনির মালিকানা নিজে দাবি করা মেয়েই ওই সমাজে প্রকাশ্যে নারীবাদী, আড়ালে বেশ্যা! অথচ ওই সমাজ বেশ্যাবৃত্তিকে টিকিয়ে রাখে পেশা হিসেবে। কারণ ওরা জানে, ওদের ভোগ সম্ভোগ করা হলেও ওদের মানুষ হিসেবেই গোনায় ধরা হবে না শেষতক। ফলে যেদিন থেকে 'বেশ্যা' গালি হিসেবে শুনেছি, সেদিন থেকেই জেনেছি–

পুরুষ যোগ্যতায়, দক্ষতায় আর প্রতিভায় যখনই হীনম্মন্যতায় ভুগবে, মেয়েদের সে গালি দেবে বেশ্যা হিসেবে। তাই সে গালি ফুলের মালার মতো গলায় পরেছি।

যে বেশ্যা হতে জানবে না, সে বিদুষী হবে কেমন করে?

অতীতে যে জীবন আমি কাটিয়েছি বাংলাদেশে, যে জীবন আমি কাটাচ্ছি ইউরোপে, সেই জীবনে আমি একা মরতে ভয় পাই না। যেমন ওতে ভর করেই হয়তো বেশ্যা হওয়ার ভয় ছুড়ে ফেলেছি অনেক আগেই। আজকাল পেশার কাজে একাই ঘুরিফিরি। বাংলাদেশের মতো কেউ জিজ্ঞেস করে না– সাথে কেউ যাবে না? কেউ নিশ্চিত হতে চায়না আমি কোথাও একাই যাচ্ছি নাকি আরেকজন অভিভাবক যাচ্ছে আমার সঙ্গে!

ফলে যদি আমার জীবনসঙ্গীটি কখনো আমার সাথে না থাকতে উৎসাহী হয়, আমি জানি যে সে তখনও জানবে– আমি একা থাকতে ভয় পাই না। যে কারণে একাকিত্ব দূরীকরণে আমি কখনো সন্তান চাই না, যতদিন আমি ও আমার জীবনসঙ্গী দুজনেই আগ্রহী না হচ্ছি নতুন কাউকে পৃথিবীতে আনতে।

শেষজীবনে আমার মায়ের মতো সেই সন্তানকে আঁকড়ে ধরার গভিড় একাকিত্ব আমি চাই না! কারণ আমি এও জানি– দারিদ্র্যের কথা, একাকিত্বের কথা বইতে পড়তে যত আনন্দের, বাস্তবে তার মুখোমুখি হওয়া ততই কঠিন। একাকিত্বের জীবন ভয় না পেলেও আমি সেই জীবনকে অপছন্দ করি।

তবে কখনো যদি চলার পথে আবারও একা হয়ে পড়ি তখন এইবেলায় হয়তো নিজেকে বলব– অপছন্দ করলেও, ওই কঠিন বাস্তবতায় একাকিত্বের জীবনই আমি চাই, কিন্তু আত্মসম্মানহীন অসম্মানের জীবন কক্ষনোই চাই না! কারণ আমি চাই– দিনশেষে এমনকি নিজের জীবনের এমনকি একাকিত্বের মালিকানার ভারও নিজেরই থাকুক। যাতে আমি চাইলেই কবিতার মতো করে বলতে পারি–

My heart to jo– at the same tone
And all I loved– I loved alone!

শেষ পর্যন্ত আমার কাছে একাকিত্বের মুকুট দাসত্বের জীবনের চেয়ে গৌরবের। কারণ শেষ পর্যন্ত সমাজের, পরিবারের, প্রেমিকের বা রাষ্ট্রের আমি হতে চাইনি।

কারণ সবার হলে, নিজের জন্য নিজের কাছে অবশিষ্ট থাকে না কিছুই, থাকে না এমনকি ব্যক্তিত্বটুকুও!

আমার পুরুষেরা

ফরাসিদেশ ওরফে প্যারিসে আসার পর ২০২২ সাল হাতছানি দিচ্ছে, এই হাতছানিতে জর্জরিত করোনা মহামারির কারণে অচ্ছুত ঘোষণা করা, আমার পশ্চিমা বন্ধুদের ভাষায় 'এযাবৎকালের সবচেয়ে জৌলুসহীন' প্রথম নিউ ইয়ার পার্টিতে মদ খেতে খেতে আমার জার্মান বন্ধু নিনা গল্পচ্ছলে জিজ্ঞেস করেছিল– আমার জীবনে পুরুষের সংখ্যা কত?

আমি শ্যাম্পেনের গ্লাসে চুমুক দিয়ে হাসতে হাসতে বলেছিলাম– এতগুলো যে মদ খেতে খেতে সবার নাম মনে করা সম্ভব না।

তাও আন্দাজ করলে?

–এই ধরো ত্রিশ–পঁয়ত্রিশ!

সে ছোট্ট শিস দিয়ে বলল– কিছু মনে না করলে জানতে পারি, বয়স কত তোমার?

–ছাব্বিশ হতে যাচ্ছি!

সে নিজের গ্লাসের অবশিষ্ট শ্যাম্পেনটুকু পেটে চালান করে দিয়ে বলল– সে কি, বয়সের চেয়ে বেশি!

আমি হেসে যোগ করলাম– আর এখন ভালো মেয়ের মতো প্রেম করছি!

সে শ্যাম্পেন খালি হওয়া গ্লাসে লাল টকটকে ওয়াইন ভরে এনে ঘোষণা দিল– টোস্ট ফর ইউর লাভ লাইফ!

আমার লাভ লাইফ বা প্রেম জীবনের প্রতি শুভকামনার ঘোষণা দেওয়া নীনার কাছে জানলাম– ও নিজে আছে এক ওপেন রিলেশনশিপে। ছেলেটির নাম– লুই।

বলতে বলতেই লুইয়ের সাথে পরিচিত হলাম।

লুই দেখতে একেবারে আগেকারদিনের ফ্রেঞ্চ সিনেমায় লম্বা চুলের রাজকীয় চেহারাধারী ফরাসি যুবকদের মতো আকর্ষণীয় চেহারার এক যুবক। একহারা গড়নের। কথার ফাঁকে ফাঁকে জানলাম খাঁটি ফরাসি লুইয়ের পিএইচডি মিউজিক নিয়ে। সে পেশায় মিউজিশিয়ান, নেশায় কম্পোজার। আমাদের উপমহাদেশের ক্লাসিক্যাল ঘরানার সুরে তার মুগ্ধতা অবিরাম। এমনকি পরবর্তীতে আমার বিয়ের দিনেও সে নেচেছে বাংলা গানে আমারই হাত ধরে!

ইউরোপে আসার আগে ওপেন রিলেশনশিপের নাম শুনলেও এ কখনোই দেখিনি আমি স্বচক্ষে। দেশে যেসব প্রেমকে 'ওপেন রিলেশন' বলে জেনেছি, সেগুলো ছিল অতি অস্বাস্থ্যকর– বেশিরভাগ সময়ই বউ, প্রেমিক ও প্রেমিকার ত্রিমুখী সংঘর্ষ! এদিকে বইয়ে পড়েছি ফরাসি দার্শনিক জ পল সাঁত্র (ফরাসিরা উচ্চারণ করে– সাখত) আর নারীবাদের পুরোধা সিমন দ্য ব্যভোয়া ওপেন রিলেশনশিপে ছিলেন। দুজন দুজনকে ভালোবাসতেন। কিন্তু শুয়েছেন বহুজনের সাথে। আর দশটা সম্পর্কের মতো রাগ–অভিমানও করেছেন। আবার ঠিক গিয়ে মিলেছেন। এমনকি এখনও দুজন শুয়ে আছেন প্যারিসের বিখ্যাত কবরস্থান 'মোপারনাস সিমেট্রি'তে একই কবরের ভেতর। কেবল এটুকুই।

কিন্তু জলজ্যান্ত দুজন মানুষ এমন সম্পর্কে আছে, তা আমার কাছে কৌতূহল জাগানিয়া। তাই লুই ও নীনা জুটিকে দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারি না। এমনই অবিচ্ছেদ্য ওরা।

অবশ্য স্মৃতিচ্ছলে মনে পড়ে দেশে থাকতে একবার আমিও নিনার মতো আমার অতি বিখ্যাত বয়সি কবিবন্ধু হেলাল হাফিজকে জিজ্ঞেস করেছিলাম– তোমার জীবনে নারীর সংখ্যা কত? সে উত্তর দিয়েছিল– যথেষ্ট দুঃখ পাওয়ার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ। ঢাকায় প্রেসক্লাবে বসে আড্ডা দিতে দিতে কথায় কথায় জেনেছিলাম হেলেনের কথা, ওর প্রথম প্রেম! পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিধান যাকে কখনোই ওর সাথে মিলতে দেয়নি। বাবা–মার ইচ্ছেতে মেয়েটির বিয়ে হয়েছিল অন্য একজনের সাথে, ঢাকায়। বহুবছর পর যখন হাফিজের প্রথম বই বেরোল , কাকতালীয়ভাবে এই মেয়েটির সঙ্গী সেই বই কিনে নিয়ে গিয়েছিল আর প্রবল ধাক্কায় এই মেয়েটি সেই থেকে মানসিক ভারসাম্যহীন। কোনো এক মানসিক হাসপাতালে স্থান হয়েছে ওর। এ যেন সিনেমাকেও হার মানায়!

তবে সিনেমায় জীবন থেমে থাকলেও, অভিনয় শেষে নায়ক–নায়িকা 'অভিনয়' করেছে নিশ্চিত হওয়া গেলেও সত্যিকারের জীবন আর অভিনয়– দুটির কোনোটিই থেমে থাকে না। আর থাকে না বলেই, হেলেনের জীবন থেমে গেলেও, হেলাল হাফিজের জীবন থামেনি। তাই না থামা জীবনটির নতুন সব সিনেমার ঝলকের মতো ওর কাছে আরও জেনেছিলাম সেইসব নারীদের কথা যাদের শয্যাসঙ্গী হতো সে টাকার বিনিময়ে। জেনেছিলাম ঢাকায় যখন গণঅভ্যুত্থান চলছিল তখন সে কেমন করে লিখেছিল– 'এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাওয়ার তার শ্রেষ্ঠ সময়'–এর মতো সময়ের কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠা কবিতা।

মূলত হেলাল হাফিজ আমার অভিজ্ঞতার পারদে এক চিলতে ফুঁ দিয়েছিল। সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ। তবে যখন প্রেম প্রেম করে এই বৃদ্ধ বন্ধুটিই ঘ্যানঘ্যান করেছিল কিছুদিন, তখন খুব বিরক্ত হয়েছিলাম এবং সাফ জানিয়ে দিয়েছিলাম– তোমার সাথে কেবল বন্ধুত্বই চাই, প্রেম নয়।

সে কি কষ্ট পেয়েছিল?

–জানি না।

কিন্তু একবার উদাস হয়ে বলেছিল– যাদের সাথে ও থাকতে চেয়েছে, তারা কেউই ওর সাথে থাকতে চায়নি! অবশ্য কয়দিন চুপচাপ থাকার পর বলেছিল– আমাকে নিয়ে যাবি রাজশাহীতে?

আমি বলেছিলাম– হ্যাঁ, নেব!

মানুষ পণ করে পণ ভেঙে হাঁপ ছেড়ে বাঁচার জন্য। আমিও একথার প্রমাণ রাখতেই সম্ভবত পণ করে সেই পণ ভুলে গিয়েছিলাম। সময় মেলাতে পারিনি। সুযোগও না। কিংবা কে জানে, হয়তো– চাইনি! মেয়েমানুষ মাঝেমধ্যে বড় নিষ্ঠুর। আমিই বা তার ব্যতিক্রম হই কীভাবে?

আর তাই ব্যতিক্রমকে অতিক্রম না করেই, আমি এগিয়ে যাই। এগোয় আমার জীবন। পিছে পড়ে থাকে কিছু ছেঁড়া ছেঁড়া নস্টালজিয়া।

সেই নস্টালজিয়ায় ভর দিয়েই মনে পড়ে– একবার ঝুম বৃষ্টির মধ্যে টিভি চ্যানেলে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়েছিলাম মা'কে নিয়ে। ইশরাত জাহান ঊর্মি নামের এক উপস্থাপক তখন 'অন্যপক্ষ' নামের এক অনুষ্ঠান করছে নারীর সংগ্রাম নিয়ে। সে–ই ডেকেছিল। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, পরে অবশ্য এই ইশরাত জাহান ঊর্মি নামের হিংসুক নারীটি ঈর্ষায় মাখামাখি হয়ে গালাগাল দিতেও ছাড়েনি আমাকে, আমার প্রাক্তন ইমতিয়াজের পক্ষ নিয়ে আমাকে মাঝেমধ্যে সুযোগ পেলেই তিরস্কার করতে ছাড়েনি। এমনকি এক

দুর্গতি বন্ধুর কাছে জেনেছিলাম এই নারীটি কী চমৎকার সংগমপটু। কে জানে হয়তো ইমতিয়াজকে কামনাই করত সে, সেই কারণেই এই পক্ষপাত। নাহলে যে আমাকে চেনে না, জানে না, সে হুট করে আমার সম্পর্কে মন্তব্যই বা করে কেমন করে?

যেহেতু তার অকারণ যুদ্ধ ও কটূক্তি কিছুরই আজও খেই পাই না, ফলে বেবে আনন্দ পাই— মেয়েদের লড়াই মাঝেমধ্যে বিচিত্র বটে!

সে যাকগে, আমার বন্ধু হেলাল হাফিজ বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি বিক্রি হওয়া কবিতার বইটি লিখেছিল, বইটির নাম— যে জলে আগুন জ্বলে। আমি আদর করে ইংরেজিতে ডাকতাম— ফায়ার ইন টিয়ারস!

তো এই আগুন জ্বলা জলের গল্প মূলত তার জীবনই। জীবনের প্রতিচ্ছবি সে হয়তো তাই দেখত চোখের জলে!

যখনই যেতাম তাঁর কাছে সে গল্পের ঝাঁপি খুলে বসত তাঁর সমসাময়িক বাংলা ভাষার অন্যান্য কবি–লেখকদের নিয়ে। ঘনিষ্ঠ বন্ধু কবি রুদ্র আর তসলিমা নাসরিনকে নিয়েও। লেখক তসলিমা নাসরিন নাকি তখন অতটা সমালোচিত হননি, তখনও মোল্লারা তার মাথা চেয়ে আন্দোলন শুরু করেনি। তিনি তখন লিখছেন, রুদ্রের কবিত্ব ফলানো যৌনাচারের জীবন কুলিয়ে উঠতে পারছেন না, মতের মিল হচ্ছে না— দুজনেই ঝগড়া করছেন। গাল ফুলিয়ে এসে বসে থাকছেন হেলাল হাফিজের কাছে এসে। হেলাল হাফিজ ওদের ঝগড়ার মীমাংসা করতেন। বন্ধুর বউ বলে নাসরিনের প্রতি দুর্বলতা প্রকাশ করতে পারতেন না ভদ্রতায়। কিন্তু যখন রুদ্র প্রয়াত হলেন, তখনই এক সুযোগে নাসরিনকে তাঁর ভালোবাসার কথা বললেন। আমি হাফিজকে থামিয়ে দিয়ে বললাম— সেকথা সে লিখেছেও, তোমাকে ডেকেছে সুযোগসন্ধানী। কিন্তু তাতে কি তুমি রাগ করেছ?

হাফিজ হেসে বলেছিল— অভিমান করেছিলাম, রাগ করিনি। মন খারাপ হয়েছিল। কিন্তু জানিসই তো, কাউকে ভালোবাসলে তুই কখনোই ঘৃণা করতে পারবি না!

আহা হাফিজ, তুমি যদি জানতে!

আমি যাদের ঘৃণা করেছি তাদের প্রতি আমার প্রেমের কমতি ছিল না। কিন্তু ঘৃণা, সে তো ভালোবাসারই বিপরীত, মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ। আমি কি ইমতিয়াজকে ভালোবাসিনি? কিংবা আমার প্রথম প্রেমিক উত্তমকে? কিংবা সাজিদকে অথবা অভীকে? কিংবা আর তাদেরকে যারা আমাকে ভালোবাসার বাণী শুনিয়ে প্রতারণা করেছে, মিথ্যে বলেছে। আমি জেনেছি ভালোবাসা মানে কেবল শরীর শরীর খেলাই। মন সেখানে কী কাজে লাগে?

হাফিজের সাথে তর্ক অত বেশি করিনি। তবে যা-ই যতটুকুই করেছি, তাতে হাফিজ বলেছে– তোর কাছে কথার খঞ্জর আছে। কাউকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিতে পারবি!

আমি হেসে বলেছি– কবিদের এই এক সমস্যা! কেবল কথার ছুরিই দেখলে? আরেক হাতে যে এক গুচ্ছ গোলাপ আছে সেটা দেখলে না?

হাফিজ যাত্রার অভিনেতার মতো বলত– বেগম, পেশ করো তোমার গোলাপ গুচ্ছ!

মাঝে মাঝে মনে হয়, আমার মাতৃত্বের যে সত্তাটা আছে, সেটা সময়ে অসময়ে হেলাল হাফিজ নামের এই বৃদ্ধটির জন্য চয়নমনিয়ে উঠত।

বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের বেশিরভাগ সময়েই সাতসকালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পল্টনের বাসে উঠতাম বন্ধুদের সাথে, চারুকলায় পড়ার সুবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে অদ্ভুত সব প্রোজেক্ট দেন শিক্ষকরা, সেসবের রসদ সংগ্রহ করে পুরাণ ঢাকার বিউটির লাচ্ছি বা হাজির বিরিয়ানিতে পেট পুরে, শাঁখারীবাজার কিংবা তাঁতিবাজার হয়ে ফেরার পথে মনে হলে চলে যেতাম প্রেসক্লাব। যাওয়ার সময় ক্যান্ডি, চকলেট নিয়ে যেতাম। হাফিজ দুটো মুখে দিত, কেন যেন সেই চকলেট খাওয়া দেখতে মাতৃসুলভ ভালোলাগা কাজ করত। গল্প করতে করতে ওর হোটেল জীবনের কথা বলত। ওর এই হোটেল জীবন আমার বড় মজার অভিজ্ঞতা লাগত। একজন মানুষ সারাজীবন সঙ্গীহীন হোটেলে কাটিয়ে দিচ্ছে, আমার কাছে– এ বড় আশ্চর্যের বিষয়!

সে যাকগে, হাফিজের সাথে বন্ধুত্ব হলো, পাশাপাশি এরইমধ্যে টিভিতে সাক্ষাৎকার, পত্রিকায় কথা বলতে গিয়ে, লিখতে লিখতে পরিচয় হলো অনেকের সাথেই।

এক সাহিত্য সম্পাদক ছিল মাহবুব আজিজ, 'সমকাল' পত্রিকায় কাজ করত। সে প্রায়ই ফোনে কল দিয়ে 'হ্যালো' বলামাত্রই বলত– কতটুকু হেলব? লোকটির টেস্টাস্টেরনের প্রতি নিয়ন্ত্রণ ছিল না। একবার অবশ্য সোশ্যাল মিডিয়ায় নাম উল্লেখ না করে লিখেই ওর ঘাম ছুটিয়ে দিয়েছিলাম। আকুল হয়ে কল দিয়ে বলেছিল– যাকে নিয়ে লিখেছেন, সে কি চেনা কেউ?

আহা! বাংলাদেশের পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদক!

এরা সাহিত্যকেও দূষিত করেছে, না পারে লিখতে, না পারে বলার মতো করে বলতে। কেবল ওই শব্দের খেলাগুলো করে কোন নারীটিকে সেই কবিতা কবিতা খেলায় একটু ছুঁয়ে দেওয়া যায়।

তার এই লিপ্সার কীর্তি বলেছিলাম আমার মা'কেও। একবার রাজশাহীতে আমাদের বাসায় আসার পর আমার মা প্রথম দর্শনেই বলেছিল– এমন চোর চোর আচরণ কেন এর? আমি বলেছিলাম– এই সেই লোক, যে ঘুমের মাঝে ফোন করে হেলে পড়ার সুযোগ খুঁজত!

দুজনে কী হাসাহাসিই না করেছিলাম একে নিয়ে!

আরেকজনকে চিনতাম, নাম নওশাদ জামিল। প্রথমে বড় ভাই সেজে যে আন্তরিক আচরণ ঘটেছিল, নিজের লেখা এক অখ্যাত কবিতার বই দিয়েছিল। পরে সেই ভাই থেকে উৎরে গিয়ে সে প্রায়ই ইচ্ছা প্রকাশ করত একটু নিরিবিলিতে কথা বলতে চায় আমার! আহা, কী অনুগ্রহের আকুতি। লোকটি বিয়ে করেছে। কিন্তু নিরিবিলিতে গোপনে তার দেখা করতে হবেই অন্য মেয়ের সাথে। যার কথা স্ত্রী জানবে না। এ বড় কঠিন লীলাময় রোগ। অবশ্য ওঝার ভূমিকা আমি ভালোই পালন করেছিলাম।

বেশিদিন নয়, মহামারি আসার পরের একদিন সরকারি দলের লোকদের তাবেদারি করছে দেখে সুন্দর করে একদিন কথাচ্ছলে এই লোকটিকে অচম্বিতে বলেছিলাম– আচ্ছা, বলুন তো আপনার দেখা সাহসী মানুষদের মধ্যে আমি কি একজন?

সে আমাকে খুশি করতে লিখেছিল– হ্যাঁ, আমার দেখা সবচেয়ে সাহসী মানুষদের মাঝে তুমি অন্যতম!

আমি তাকে বলেছিলাম– আমার সাহসের কসম, আপনার মতো মেরুদণ্ডহীন লোক আমি আমার জীবনে খুব কম দেখেছি!

এ যেন শব্দের থাপ্পড় দেওয়া ছিল লোকটির গালে। মুহূর্তেই আমাকে 'সাহসী' বলার ভোল বদলে গেল। কিছু গালাগালি করে আমাকে সম্ভবত তার সোশ্যাল মিডিয়া থেকে ব্লক করে দিল সে। এরকম আরেক চিড়িয়া ছিল অনীশ দাস অপু। বইয়ের সূত্রে চিনতাম, চমৎকার অনুবাদ করে। সেই সূত্রে যোগাযোগ হয়েছিল যখন তখন ক্লাস এইট কি নাইনে পড়ি। সে আমার গলার আওয়াজ শুনেই লিখল– আমার গলার আওয়াজ নাকি তাকে ইংরেজিতে হর্নি ও বাংলায় 'যৌনপিপাসাক্রান্ত' করে তোলে! বলে ফেলল– সে নাকি আমাকে বিয়ে করতে চায়!

আহা, ক্লাস এইট পড়ুয়া এক মেয়েকে বশীভূত করে ফেলা এতই সহজ?

অথচ তাই হলো, আমার অবাধ্য কৌতূহলেই এই লোকটির সাথে আরও এক সপ্তাহ কথা বলেছিলাম। যে আমাকে দেখেনি, শোনেনি, কেমন করে সে অবলীলায় সেইসব লকলকে কামের কথা প্রেম বলে প্রচার করে আমার অস্বাস্থ্যকর কৌতূহলসমেত তাই দেখতে চেয়েছিলাম।

ওদিকে মঈনুল আহসান সাবের নামের এক লেখক ছিল। শৈশবের এক গল্প লেখা প্রতিযোগিতায় ওকে চিনেছিলাম। কোন এক বিখ্যাত কবিপুত্র, বেশকিছু উপন্যাস আর গল্প লিখে সাহিত্যের মোড়ল সেজেছে। এক সময় মনে হতো– না চিনলেই বুঝি ভালো করতাম। সেই একই কথা, একই আহ্বান। যেন সব মেয়েরা সাহিত্য করতে গেছে ওদের সাথে শোবে বলে।

বিডিনিউজ টুয়েন্টিফোরের সাহিত্য সম্পাদক রাজু আলাউদ্দিনকে দেখেছিলাম, ছিপছিপে তালপাতার সেপাই, কিন্তু কামনার লকলকে থাবাটি বের করে আছে। ওর বাড়িতে দাওয়াত দিয়েছিল মদের, খাবারের। সেই যাত্রায় গিয়ে দেখা হয়েছিল দীপেন ভট্টাচার্য নামের প্রবাসী বিজ্ঞান লেখক, অনুবাদক রওশন জামিল, জীবন চৌধুরী নামের এক গায়কের সাথে। দেখেছিলাম মদ খেতে খেতে আমার জামার ওপর পিঠের কাছে হাত বোলাচ্ছেন রাজু নামের এই তালপাতার সেপাইটি। মদের ঘোর ভেবে ক্ষমা করে দিয়েছিলাম। কিন্তু অনলাইনে বিডি আর্টস নামের সাহিত্যপাতায় লেখাগুলোর সম্মানী দিচ্ছিলেন না বলে একদিন চূড়ান্ত অপমান করে টাকা আদায়ের পর ওর মুখ আর দেখিনি।

এই লোলুপের দল বাদেও একে একে আমার জীবনে এসেছিল যে প্রেমিকেরা তাদের দেখে, প্রেম বলে কিছু নেই জেনে চেষ্টা করেছিলাম এক নতুন জীবন কিছুদিনের জন্য বেছে নিতে, যেখানে হাত বাড়ালেই সঙ্গী, হাত ছুঁলেই প্রেম!

সেই ধারাবাহিকতায় শুয়েছিলাম গিয়াসউদ্দিন সেলিমের সাথে। শুয়ে শুয়েই সেলিমকে জিজ্ঞেস করেছিলাম কতগুলো মেয়ের সাথে শুয়েছ তুমি? সে উদাস গলায় বলেছিল– পঞ্চাশের ওপরে হবে। যাদের সাথে শুয়েছি তাদের অধিকাংশেরই নাম ভুলে গিয়েছি! কথায় কথায় সেলিম বলেছিল- জয়ার সাথে শুয়েছিলাম টানা কয়েক বছর।

জয়া মানে? অভিনেত্রী জয়া আহসান?

আরে হ্যাঁ! একবার কী হয়েছে জানো?

কী!

পরীমণি তখন নিক্সন চৌধুরীর সাথে প্রেম করছে। নিক্সনকে চিনেছ? বিরাট নেতা। সেই নেতার প্রেমিকার আশপাশে কেউ ভয়েই যায় না। যদি খুন করে ফেলে?

অথচ সেলিমের ভাষ্যমতে বাংলাদেশের হালের জনপ্রিয় নায়িকা পরীমণি সেলিমকে ডেকে পাঠিয়েছিল। সেলিমের অ্যাসিস্ট্যান্ট মুক্তাকে কল দিয়ে

বলেছিল— ডিরেক্টরকে বলো নায়িকার মাথা ধরেছে, সে যেন মাথা টিপে দিয়ে যায়!

সেলিমকে জিজ্ঞেস করেছিলাম— এরপর?

সে লাজুক হেসে বলেছিল— এমন আমন্ত্রণ কখনো ফেলা যায়!

আহা সেলিম!

যেন তুমি ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানো না— সেকথা মনে মনে বলেছিলাম।

আজ যখন বাংলাদেশের খবর দেখতে বসলে পরীমণির মুখে তার নিজের সর্বশেষ বিয়ে সংক্রান্ত কথায় 'সেলিম ভাই আমাদের বিয়ের ব্যবস্থা করে দিলেন' জাতীয় বাক্য 'ভাই' সম্বোধিত বাক্য শুনি, তখন পেট ফেটে হাসি পায়। প্রাচীনকালে ভাইবোনেতে যে বিয়ে হতো, সেকথা মনে পড়ে যায়, কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যা ঠাহর করতে পারি না।

তবে একথাও সত্য যে, খুব কাছ থেকে দেখে মনে হয়েছিল মিডিয়া নামের চক্রে এইসব অভিনেতা—অভিনেত্রীদের জীবনও অভিনয় পরিপূর্ণ। এরা পর্দার অভিনয় বাস্তবে আর বাস্তবের অভিনয় প্রতিনিয়ত করে চলেছে পর্দায়। তাই সেলিমের সাথে কৌতূহল মেটানোর পর কখনোই থাকা হয়নি।

তবে একথাও সত্য যে সে আমার কৌতূহল মিটিয়েছিল প্রাণ খুলে। যেদিন ওর বাবা মারা গেল সেদিন কী মনে করে প্রথম আমাকেই ও কল দিয়েছিল এখনও তা ভাবলে খেই পাই না।

কবে কোন এক বিখ্যাত লেখক যেন বলেছিলেন— মানুষ মানুষের সবচেয়ে ভালো বন্ধু হয়, যখন তারা একে অপরকে চেনে না। হয়তো সেলিমের ক্ষেত্রেও তাই।

সে আমাকে চিনত না, জানত না বলেই অমন সহজ হয়ে উঠেছিল। জাঁদরেল সিনেমার পরিচালক হওয়া তার আমার কাছে কখনো হয়ে ওঠেনি। কারণ শুরুতেই আমরা জানতাম— আমাদের একে অপরের কাছে পাওয়ার কিছু নেই। পাওয়ার দাবি বড় ধ্বংসাত্মক।

যেমন ফারহানা মিলি নামের এক অভিনেত্রী ছিল, সেলিমের সবচেয়ে বিখ্যাত সিনেমাটির নায়িকা ছিল সে। মিলির সাথে প্রেম কামে মাখামাখি হয়েছিল সেলিম ছবির শ্যুটিং চলাকালীনই। সে নিয়ে দুজনেরই সংসারে অশান্তি। শেষ পর্যন্ত ওটাই শেষ সিনেমা হয়েছিল মিলির কপালে। সত্য—মিথ্যা জানি না, তবে আঁচ করতে পারি মিলির ক্ষেত্রেও সেলিমের ওই সর্বগ্রাসী কামটাই সত্য ছিল, প্রেম নয়।

সেলিম আরও জানিয়েছিল যে, ছাত্রাবস্থায় ও যার সাথে প্রেম করেছিল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন, ছুটিতে বাড়ি যাওয়ার পর বিয়ে করেছিল ওর বউকে পরিবারের পছন্দে আর বাল্যপ্রেমের জের ধরে। এতে করে কী হলো– নতুন এক জাতের সম্পর্কের সাথে পরিচয় ঘটল ওর। দুটি নারীকেই চেনা–জানা হলো, দুজনকে একে অপরের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো। কিন্তু পরবর্তীতে সেলিমের মনে হলো– সে তার স্ত্রীকে না, ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেমটিকেই চায়। সেকথা সে বলল স্ত্রীটিকে। দুজন ঝগড়াঝাঁটি সেরে ঠিক করল বিবাহবিচ্ছেদই ওদের একমাত্র সমাধান। কিন্তু যেদিন বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন করতে গেল সেদিনই ওর স্ত্রীটি নাটকীয়ভাবে ওকে জানাল– সে অন্তঃসত্ত্বা। তখন বিবাহবিচ্ছেদকে শিকেয় তুলে অনাগত সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে তারা ঠিক করল– যা হওয়ার হয়েছে, সন্তানের আদর্শ বাবা–মা হবে তারা!

সেলিম স্বীকার করেছে সে ভালো সঙ্গী নয়, তার স্ত্রী কখনো নিশ্চয়তা পায়নি, নিশ্চিন্তি পায়নি ওই সম্পর্কে। কিন্তু কি করেছে? কেবল সয়ে গেছে। আমি সেলিমকে জিজ্ঞেস করেছিলাম– তুমি কী ভালোবাস ওকে? এতদিন সংসার নামের খেলা করতে করতে তোমার কি মনে হয়, ও ভালোবাসে তোমাকে?

সেলিম সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে বলেছিল– ভালোবাসা না প্রীতি, একসাথে থাকাটা একটা অভ্যাস। সেই অভ্যাস তোমার সকল লাম্পট্যকে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিতে পারে, অস্বীকার করতে পারে তোমার কামকে। আমি আর আমার স্ত্রী সেই অভ্যাসই করেছি।

সেলিমের এই ব্যাপারটা আমার ভালো লাগে আজও।

প্রচণ্ড কামুক ও সম্পর্কের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত অসৎ হলেও সে অবলীলায় নিজের দীনতা–হীনতা স্বীকার করতে জানে। সেই স্বীকারের নির্ভেজাল সুযোগেই আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম– ধরো তুমি একদিন জানলে প্রতিটি নায়িকার সাথে তোমার শয়নের ইতিহাসের মতো তোমার বউয়েরও এক আলাদা জগৎ ও ইতিহাস আছে কামের। তখন তুমি কী করবে তা জেনে?

সে বলল– কষ্ট পাব! চাইব সে যা ইচ্ছে করুক, আমাকে না জানিয়ে করুক। তাতে সুখী হবো!

আমি বলেছিলাম– আহারে পুরুষ! যা তুমি নিজে করছ তা তোমার স্ত্রীটি করলেই সমস্যা?

সে শুধরে দিয়ে বলল– করলে সমস্যা নেই, কিন্তু জানলে সমস্যা!

আমি ইংরেজিতে বললাম– আই সি!

সেলিমের রান্নার হাত চমৎকার। শিপ্রার বাসায় সেই–ই রান্না করল– বেগুন আর পটল ভাজা, ডালের মধ্যে আস্ত ডিম ভেঙে দিয়ে বাংলাদেশের ফেনী অঞ্চলের এক প্রকারের পদ আর বিশুদ্ধ সাদাভাত। সংগম যেহেতু কেবল হরমোনেরই না, বরং শারীরিক কসরত, ফলে সম্ভবত ক্ষুধাও পেয়েছিল। গোগ্রাসে গিললাম সেসব।

প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি– সেলিমের অ্যাসিস্ট্যান্ট শিপ্রা দেবনাথ, ওই ডেটিং প্লেসের সুবাদে সেও আমার ভালো বন্ধু হয়ে ওঠে। তার জীবনটিও আমার চমৎকার লেগেছিল। বাবা–মা'র সাথে যোগাযোগ সেভাবে নেই। একটা ভাড়া বাসা আছে রামপুরায়। তার ভাষ্যমতে সেই বাসাটির খরচ সেই-ই রোজগার করে বিজ্ঞাপন বানিয়ে, অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করে। পড়ে একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিল্ম অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগে। শিপ্রার শেষ প্রেমটির আগেরটি শেষ হয়েছিল একটি অবিশ্বস্ত প্রেম দিয়ে– ঠিক আমারই মতোন।

ওরা এক বাসায়ই থাকত, সহজ কথায় লিভ ইন রিলেশনে ছিল। টানা দুই বছর পর ও জানল– প্রিয় বন্ধু জেরিন শুচ্ছে ওর অনুপস্থিতির সময়। তখন কী করল শিপ্রা?

দরজা বন্ধ করে শেষবারের মতো সেক্স সেরে শেষ চুমুটি খেয়ে প্রেমিকটিকে মালপত্রসমেত বেরিয়ে যেতে বলল জন্মের মতো!

কোন লেখক যেন বলেছিল– ট্রুথ ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশন?

শিপ্রার জীবনটি তেমনই নাটকীয়। আমার ভাষায়– ফিকশনের চেয়েও ফিকশনাস!

তাই গল্পের লোভে শিপ্রার জীরনটি আমাকে একইসাথে টানে আবার কেমন যেন খটকাও দেয়। খটকা তার আয়ের উৎস হিসেব করে, খটকা তার সম্পর্কে অপর্যাপ্ত তথ্যের কারণে। তবে সেসব খটকা তখনও প্রকট নয়।

এমনকি ২০২০ সালের বইমেলাতে আমার লেখা গল্পের বই 'পাপ বিষয়ক পাপেট শো' যখন বের হয় তখনও শিপ্রা আসে আমার সাথে দেখা করতে, বন্ধু হিসেবে আমাকে জড়িয়ে ধরতে। তখন সে ডেট করছে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর রক্ষী এসএসএফ বা স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্সের এক সদস্যকে। সদস্যটির নাম– মেজর সিনহা রাশেদ।

এই সিনহা রাশেদই পরবর্তীতে আমার বিরুদ্ধে মামলা হওয়ার পর আমি পলাতক থাকা অবস্থা চলাকালীন সময়ে খুন হয় পুলিশের কয়েক সদস্যের

হাতে। আমি পলাতক অবস্থায় টিভিতে দেখতে পাই শিপ্রা, শিপ্রার আরেক বন্ধু সিফাতসহ তিনজনকে অ্যারেস্ট করেছে পুলিশ। তাকে নিয়ে পত্র-পত্রিকায় লেখা হতে থাকে, সেটি হয়ে ওঠে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর দ্বারা ঘটা বাংলাদেশের সবচেয়ে আলোচিত বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডগুলোর একটি। সমগ্র মিডিয়া মুখর হয়ে ওঠে ওই প্রসঙ্গে।

অথচ আমার জানামতে সিনহা হত্যাকাণ্ডের দেড় বছর আগে নাকি ওকে ভালো লেগেছিল শিপ্রার। শিপ্রা জানিয়েছিল সিনহাকে ওর ভালো লেগেছিল কোন এক পাহাড়ে ট্র্যাকিং করতে গিয়ে। বিস্তারিত জানি না। তবে আজ মনের মধ্যে প্রশ্ন ওড়ে– যে লোকের সাথে প্রায় দেড় বছর আগে ওর দেখে, সেই লোকের প্রতি দেড় বছর পর আবেগ তীব্র হয়ে ওঠা কি স্বাভাবিক? নাকি এমন কিছু আছে, যে তথ্য আমি জানি না?

যখন সিনহার সাথে প্রথম শুয়েছিল শিপ্রা, সেটিও এক অদ্ভুত যোগাযোগ। তার আগে সিনহাকে ভালো লাগার যে সংক্ষিপ্ত চিঠি সে লিখেছিল সেই চিঠি আমাকে দিয়ে বলেছিল– বন্ধু, দেখে দে এই চিঠি পড়ে ও আমাকে পাত্তা দেবে কি না!

হ্যাঁ, সেই চিঠির সম্পাদক আর কেউ না, এই অধম।

কিন্তু যখন শিপ্রা প্রথম শুয়েছিল, তখন দেখে মাথার কাছে এক পিস্তল রাখা!

ও রোমাঞ্চ ভরা গলায় আমাকে বলেছিল– এ কার সাথে দেখা করতে আসলাম রে! মনে তো হয় মাফিয়া-টাফিয়া হবে!

সিনেমা দেখে, সিনেমায় কাজ করে মাথা বিগড়ানোর সাক্ষাৎ প্রমাণ ও নিজেই। পরে দেখি– ধুর, ও মেজর সিনহা রাশেদ। যে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে পাহারা দেওয়া বাহিনী এসএসএফের চৌকস কমান্ডো। অথচ যখন ওর মৃত্যুর খবর শুনি, তখন শুনলাম– সিনহা ছিল অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা।

অবশ্য শিপ্রার কাছ থেকেই বিভিন্ন সময়ে টুকরো-টাকরা যে খবর জেনেছি, তাতে কখনো মনে হয়নি মেজর সিনহা রাশেদ অবসরপ্রাপ্ত কেউ। কেননা আমি জেনেছি সিনহা নিজের বাড়িতে ঢুকত রাতে, মায়ের সঙ্গে দেখা করত রাতে। এমনকি ২০20 সালের একুশে বইমেলায় যখন উচ্ছ্বসিত শিপ্রা এসে আমাকে আলিঙ্গন করেছে, শিপ্রা অসংখ্যবার বলা সত্ত্বেও সিনহা আসেনি আমার সাথে দেখা করতে। কেন এই লুকোচুরি? কেন একজন অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা ভিড়ভাট্টার মধ্যে নিজের চেহারা দেখাতে ভয় পাবে? চাকরি ছেড়ে দেওয়ার পরেও সেই চাকরি কেন তাকে ছাড়েনি?

এসব প্রশ্নের উত্তর আমার কাছে নেই। যেহেতু আমার বিরুদ্ধে মামলার সময় আমি পলাতক হয়ে ঘুরছি, সেইসময় এই চাঞ্চল্যকর মামলার প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে টিভিতে শিপ্রার মুখ দেখাচ্ছে। শিপ্রার তোতাপাখির মতো বুলি শুনে আমার বারবার মনে হয়েছে যেন কেউ ওকে শিখিয়ে দিয়েছে কী বলতে হবে, কতটুকু বলতে হবে! কারা তারা? কী তাদের পরিচয়?

অবশ্য পরে যখন সেকথা জিজ্ঞেস করেছিলাম– ও অস্বীকার করেছে।

তবে যখন হাইকোর্ট থেকে জামিন পেয়ে বেরোলাম, তখনও ফেসবুকে ফিরে শিপ্রার সাথে যোগাযোগ করলে দেখি সে এক হোটেলরুমে বন্ধ। কে রেখেছে ওকে হোটেলে?

ও উত্তরে বলল– আইন–শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। অতি চাঞ্চল্যকর মামলার প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবেই নাকি এই ব্যবস্থা। আরও বলল– এমনকি পিরিয়ডের প্যাড কিনতেও বাইরে যেতে পারে না ও, এমনই নিরাপত্তার চাদর।

আবার দিনক্ষণ মনে নেই, তবে এরই মাঝে একদিন দুম করে ফেসবুক মেসেঞ্জারে কল দিয়ে বলে– প্রীতি, আমি না প্রেগন্যান্ট!

আমি আকাশ থেকে পড়ি– কীভাবে? এই বাচ্চার বাবা কে?

ও বলে– সিনহা!

আমার যেহেতু বোধবুদ্ধি একদম লোপ পায়নি, আমি বুঝতে পারি, ও মিথ্যা বলছে! দুদিন আগে যে স্যানিটারি ন্যাপকিন কিনতে যেতে পারে না বলে আক্ষেপ করেছে, সে দুদিন পরে মৃত প্রেমিকের দ্বারা প্রেগন্যান্ট হবে কীভাবে?

আমার মস্তিষ্ক আমাকে বলতে লাগল– প্রীতি, তার সাথে যোগাযোগ ছেড়ে দাও, তাকে এড়িয়ে যাও!

আমি সতর্কতার সাথে শিপ্রাকে এড়িয়ে যেতে শুরু করলাম। পরীক্ষা, পড়ার চাপ, এসাইনমেন্টের কথা বলে চুপ করে গেলাম। এরই মাঝে একদিন শিপ্রা হালকা কথা বলার জন্য কল দিয়ে জানাল– সিফাত, মানে ওর আরেক বন্ধু নাকি ওকে বিয়ে করতে চায়!

আমি ঠিক কেন জানি না, ও ব্যাপারে জানার আগ্রহ হারিয়েছিলাম। খুব ভেতর থেকে আমার একটি সত্তা সতর্ক করে বলেছিল– ও যা বলছে তা আধা সত্য, পুরোটা নয়!

আগে কথায় কথায় ও জানিয়েছিল– সিনহার পরিবার ওকে সন্দেহ করে, ওরা কথা বলে না ওর সাথে!

এবং এই পর্যায়ে আমিও ওকে সন্দেহ করতে শুরু করলাম প্রবলভাবে এবং যোগাযোগ বন্ধ করে দিলাম প্রায় পুরোপুরি।

অথচ একদিন এই শিপ্রাই আমাকে শিখিয়েছিল– কক্ষনো দুর্বল হতে নেই কারোর প্রতি। আজ একজনের সাথে আছিস, ভেবে নিবি কেবল তখন ও–ই সত্য, কাল অন্য কারোর সাথে শুয়ে আগেরদিনের জনকে ভাববি না। শিপ্রার পরামর্শে মানুষ যেভাবে হাত পাকায়, আমি সেভাবে শরীর পাকাতে চেয়েছি। কিন্তু ভারি মুসিবত হওয়ায় ক্ষান্ত দিয়েছিলাম, কারণ আমি অমন নই– শরীর আর মন আলাদা নয় আমার কাছে।

যখন দেখেছিলাম দেখা হওয়ার দ্বিতীয় দিন হাউমাউ করে কেঁদে ফেলল সেই তরুণ চিত্রগ্রাহক। পায়ের কাছে বসে বলে– তোমাকে আমি কি পরিমাণ ভালোবাসি জানো? আমি জানি তুমি আর কাউকেই বিশ্বাস করো না, কোনো প্রতিশ্রুতি দেখে ভয় পাও, কিন্তু একবার আমাকে বিশ্বাস করে দেখবে?

না, তদ্দিনে আমি পাথর হয়েছিলাম। আমি বিশ্বাস করিনি সেই তরুণের কথাও। কিন্তু নিজের এহেন অধঃপতনে গ্লানিতে জর্জরিত হয়েছি। আমি জানতাম যে ফাঁদ আমি নিজের জন্য তৈরি করেছি, সেই ফাঁদ আমাকে আটকে ফেলতে না পারলেও আমার হৃদয় ক্ষয় করে দিচ্ছে। সেই তরুণের কান্নায় অভিড় প্রতারণার অনেকদিন পর অনুভব করলাম– প্রেমের এত চমৎকার অনুভূতিটি ভুলেই গিয়েছি! ভালোবাসার কথা ইতোমধ্যেই এতবার জীবনে শুনেছি যে নিজের নামের বাংলা অর্থ বাংলা ভাষায় মূলত 'ভালোবাসা'রই প্রতিশব্দ হলেও সেই তরুণের কণ্ঠস্বর আমার কানে পৌঁছল না। কেবল প্রবল করুণা অনুভব করলাম ছেলেটির প্রতি। আমি জানলাম আমার মধ্যেকার প্রেম নামক আবেগ মরে গেছে!

শেষবারের মতো এই তরুণের গালে ভাইসুলভ চুমু খেয়ে আমি আমার প্রেম ভুলে যাওয়া ও হৃদয় ক্ষয় করা কেবল সংগমের গোপন জীবনটিকে বিদায় জানালাম। ঠিক করলাম– সেই জীবন আমি চাই না, যেখানে ভালোবাসা নেই কামনাই সব। যেখানে শরীর কখনো মনের সমান হয়ে উঠতে পারেনি।

ঠিক করলাম প্রাক্তনের প্রিয় সকল চিত্রপরিচালকের সাথে শুয়ে শুয়ে আমার যথেষ্ট প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছে। সেই থেকে আমি আমার ব্যক্তিগত গোপন প্রতিশোধের জীবনটিও শেষ করলাম।

বাসে করে ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যার ঢাকা শহরের যানজটে বসে রাস্তার নিয়নবাতিগুলোর জ্বলে ওঠা উপভোগ করতে করতে নিজেই নিজেকে

বললাম– ওয়েল ডান প্রীতি, আর কাউকে কখনো কাছের মানুষ হতে দিও না, এমনকি যে বারবার শুয়েও কখনো তোমার হৃদয় ছুঁতে পারেনি!

তাই শিপ্রাকেও ঠিক তেমনি এই জীবনটির মতো কবর দিতে কার্পণ্য করলাম না। যে জীবনে আধেক মিথ্যে বলায় বন্ধু ভেবে চলা একজনের বন্ধুত্বের প্রতি আর বিশ্বাস নেই বলে জেনেছিলাম, তেমন বন্ধু নামের অবন্ধু হয়ে ওঠা বন্ধুত্ব দিয়ে কী করতাম আমি?

আবার বসন্ত

দুই দুই দুইহাজার বাইশ সালে, এইদিন যে যুগান্তকারী ঘটনাটি ঘটল সেটি আমারই বিয়ে। বিয়ে কখনো যুগান্তকারী ঘটনা কি না তা তর্কসাপেক্ষ। কিন্তু বাঙালির মতে অপবিত্র রঙ অর্থাৎ কালো শাড়ি পরে ইমিটেশনের পুরাতন গয়না দিয়ে বিয়ে করার দুঃসাধ্যটি করতে আমি একটুও কসুর করলাম না কারণ, আমি চেয়েছি সকল অপবিত্রতার কুসংস্কারকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে আমার পবিত্র সম্পর্কটির কাগজকলমের অধ্যায়টি শুরু হোক। তাই মালিকানার তত্ত্বে অবিশ্বাসী আমি বিয়ের কর্মটি করলাম শুধুমাত্র ওকে যেন হারিয়ে না ফেলি!

জাদুকরী ঘটনা মানুষের জীবনে ঘটে। আর আমার জীবনের জাদুকরী ঘটনাটির নাম– আমার সঙ্গী, যাকে কখনো স্বামী মানে ডাকব না আমি। শেষ পর্যন্ত যে আমাকে বা আমি যাকে বিয়ে করেছি। সে আমার জীবনের সেরা উপহার একারণেই যে আমার প্রেম–ভালোবাসার বোধ খুইয়ে ফেলার জীবনটির গল্প যাকে আমি উজাড় করে শুনিয়েছিলাম, সে সে–ই। কিছু পাওয়ার বা দেওয়ার লোভে না। কেবল নিজের গোপনটুকু ভাগ করে নেওয়ার লোভেই। শুনিয়েছিলাম আমার সমাজের প্রেক্ষিতে সবচেয়ে চরিত্রহীন নারীটি আমি!

কেন যেন খুব আত্মশ্লাঘা বোধ করেছিলাম!

আর সব প্রগতিশীল সেজে থাকা পুরুষের মতো যখন সে বলেছে– শরীর মেলালেই কেউ চরিত্রহীন হয় না, তখনও হেসেছি। মনে মনে বলেছি– আমি জানি, তুমিও আমাকে সেইসব পুরুষদের চোখেই দেখছ যে পুরুষরা রাতের বেলায় যাকে ছোঁয়, দিনের বেলাই তাকে অচ্ছুত ঘোষণা করে! আর কখনোই কাছের মানুষ হওয়ার সুযোগ আমি কাউকে দিচ্ছি না হে!

জানলাম ত্রিশ পেরোনো এই পুরুষটির জীবনে নারী মূলত চারটি। একটি বাল্যকালের, টিনেজের প্রেম। অন্যটি বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের আর সবশেষটি তখন এক বছর হলো টানাপোড়েন কাটিয়ে শেষ হয়েছে। সেগুলো যে খুব বৈচিত্র্যের তা নয়, তবে দীর্ঘমেয়াদি।

অন্যদিকে আমার সর্বোচ্চ সময় ধরে টিকে থাকা প্রেমটি ছয় বা নয় মাসের মাঝামাঝি কিছু একটা হবে হয়তো। প্রেমের মেয়াদের দিক থেকে আমাদের মিল নেই, কেবল আমাদের মধ্যে মিল একটিই– আমরা দুজনই প্রতারিত হয়ে প্রেম শেষ করেছি। এইটুকু মিল নিয়ে যেমন প্রেম করা যায় না, আবার এড়ানোও যায় না। ফলে আমরা উৎসুক জনতার মতো উন্মুখ হয়ে একে অপরের কথা শুনি, কেবল শুনতে ভালো লাগে বলেই। আমাদের মধ্যে যে মিল সেগুলোও আহামরি কিছু নয়। আমরা দুজনেই বই পড়তে ভালোবাসি, দুজনেরই পছন্দের বিষয় অভিন্ন– বিজ্ঞান থেকে সাহিত্য, অর্থনীতি থেকে রাজনীতি। সবচেয়ে বড় গুণটি হলো এই পুরুষটির রসবোধ খুব ভালো। শুধুমাত্র এই গুণটির কারণেই তার সাথে জনম জনম ধরে কথা বলা যায়, আড্ডা দেওয়া যায়।

আমরা তাই আড্ডা দিতে থাকলাম। আমাদের ফোনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা হতে লাগল। এরমধ্যেই আমি লিখলাম সেই লেখাটি যেটির কারণে আজ, এখন প্যারিসের আর্টিস্ট রেসিডেন্সির জানালার সামনের লেখার টেবিলে বসে লিখছি মুঠি মুঠি কথা। সেই লেখাটির ফলে যখন আমার তখনকার পরামর্শক ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া আমাকে আত্মগোপনে থাকতে বললেন আদালত খোলার আগ পর্যন্ত (আমরা তখনও জানি না সময়টি কতদিনের)। তখন আমরা বুঝলাম ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দেওয়ার মধুর সময় অবশেষে দুম করে অবিশ্বাস্যভাবে শেষ হয়ে যাচ্ছে। শেষমুহূর্তে বাসা থেকে বের হওয়ার আগ মুহূর্তে আমার মনে হলো– এই ছেলেটিকে ভালোবাসার কথা না বললেই হবে না!

আমি তাকে বললাম– আমি জানি না আমি এই মুহূর্তে কেন একথাটা বলছি। কিন্তু আমি জানি, কথাটা না বললে আমার চলবে না। কথাটা হলো– আমি আবিষ্কার করেছি, আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি। যদি পারো আমার ফেরার অপেক্ষা কোরো, না হলে যা ইচ্ছে তাই কোরো।

আমি আসলে ভাঙনের কথা বলতে ভয় পেতাম। আর তাছাড়া এই ধরনের ঘটনা নাটক–সিনেমায় পড়েছি যেখানে অধিকাংশ সময় কর্তব্যের খাতিরে বেশিরভাগ সময় সেনা কর্মকর্তা বলে নায়কটি যুদ্ধে যায়, নায়িকাটি অপেক্ষায় থাকে। দিন গোনে। পুরানো স্মৃতি রোমন্থন করে।

এই গল্পে পার্থক্য এই যে, নায়কের জায়গায় নায়িকা আর নায়িকার জায়গায় নায়ক!

তবে কেমন করে যে সেই তুমুল আবেগ আমাকে অমন বিপদের সময় ভাসিয়ে নিয়ে গেল তা আজও ভাবলে অবাক হই! যে আমার প্রেমের প্রতি সকল আস্থা বিসর্জন দিয়ে চলে গেছে বলে জেনেছিলাম। সেই আমি বাকি চার মাস পথেপ্রান্তরে গ্রামের আত্মীয়, খালা-মামাদের বাড়িতে থাকতে থাকতেও এই যুবকের প্রতি প্রবল ভালোবাসাই কেবল অনুভব করলাম।

সারারাত পুলিশের আতঙ্কে অস্থির হয়ে ঘুমাতে পারি না, বিছানায় এপাশ–ওপাশ করি, যে আমি অভ্যস্ত ছিলাম এনরয়েড স্মার্টফোনে সেই আমি এক বাড়ির গৃহকর্মীর নামে তোলা সিমকার্ড ভরা মান্ধাতার আমলের বাটন ফোন হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করি। আমাকে নিয়ে বিপদে পড়াদের কড়া নির্দেশনায় ভুলেও কাউকে কল দিই না। পাছে আমার পরিচয় প্রকাশ পেয়ে যায়!

যেসব বাড়িতে থাকি তারা আমার আত্মীয় হলেও তারা নিজেদের নিরাপত্তার কথা ভেবে গোপন করে রাখে আমার ব্যাপারে বাকি সব তথ্য। আশেপাশের বাড়ির কেউ এলে পরিচয় করিয়ে দেয় দূরের শহর থেকে গ্রাম ঘুরতে আসা অতি সাধারণ এক আত্মীয় হিসেবে। আমার তখন নিজেকে প্রাগৈতিহাসিক চরিত্র বলে মনে হয়। এক ধাক্কায় যেন পৌঁছে গিয়েছি অন্য এক যুগে!

মনে হওয়ার ব্যাপারটা প্রকট হয় যখন দেখি পাশের বাড়ির গ্রাম্য বউ পেটানো একটি লোক আমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করছে, আমি গ্রামে কতদিন থাকব, কোথা থেকে আমি এসেছি। যাকে পেটানো হয় সেই মার খাওয়া বউটিকেও দেখি, প্রায়ই মার খায়, কিন্তু দিনের বেলা তরতাজা থাকার অভিনয়টি করে যায়। কথা বলে জানতে পারি সেই নারীটি একটা স্কুলে পড়ায়। বাচ্চারা এই নারীর কাছ থেকে কী শিখবে ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলি। এই কৌতূহলওয়ালা পুরুষতান্ত্রিক প্রভুদের দেখে আমার সাময়িক জীবনটির প্রতি বিতৃষ্ণা আসে। আবার অন্য চিত্রও দেখি, দেখি বউ ছেড়ে চলে গেছে আরও টাকাপয়সা দেখে। কিন্তু প্রেমে অন্ধ সঙ্গীটি অপেক্ষা করছে তার স্ত্রীটি কবে ফিরে আসবে!

যে শ্রেণির লোকদের নিজের বলে জেনেছি, জীবন–মানে শিক্ষার মানে সেই শ্রেণির চেয়ে নিচের ধাপে থাকা লোকদের জীবনে অন্য এক বাস্তবতা দেখি। সেই জীবনের সাথে আমার আগে কখনো সম্পর্ক ছিল না, এখনও নেই।

তবে সেসময় এই সম্পর্কহীন জীবনটির অনিশ্চয়তা আর সেই অনিশ্চয়তায় ভর দেওয়া আগামীতে কী হতে যাচ্ছে ভেবে মাঝে মাঝে ভীষণ কান্না পায়। পরিবারের বাকিরা যা বলে তিরস্কার করে, সেসব লেখার কারণে নিজেকেও সেই কারণে দূষতে ইচ্ছা করে– কী দরকার ছিল আমার লেখার, কী হয়েছে লিখে? কেউ কি আমার জন্য রাস্তায় দাঁড়িয়েছে? প্রতিবাদ করেছে? জানে আমি এখন কোথায়, কেমন জীবনহীন জীবনটি আমি কাটাচ্ছি?

এমনকি যদি এই পলাতক থেকেই আতঙ্কে, রাগে–দুঃখে কখনো মরে যাই, তখনও কেউ কি কখনো জানবে শুধুমাত্র এক দুর্নীতিতে ভরা স্বাস্থ্যখাত আর তার মৃত মন্ত্রীকে নিয়ে লিখে নিজেকেও মৃত মানুষের মতো জীবন কাটাতে হচ্ছে!

আমি হিরো হতে চাইনি। কিন্তু এই জীবনহীন জীবনে প্রবেশের পর প্রথমবার বুঝতে শিখি– অধিকাংশ হিরো হতে হয় মৃত মানুষকেই। জীবিত মানুষ হিরো হয় না। হয় না কারণ জীবিত প্রতিভা লাশে না পরিণত হওয়া পর্যন্ত তাকে নিয়ে কথা বলে আলোচনায় আসা যায় না। হিরোকে তারাই বানায়, যারা চায় সেই সুযোগে নিজেদেরও বিক্রি করা যাবে খানিকটা। ব্যাপারটা অনেকটা সাবানের বিজ্ঞাপনের মতো– সবাই জানে ওই সাবান মেখে যে বিজ্ঞাপন করছে রূপের, সেই রূপ ওই সাবান থেকে আসেনি। কিন্তু তাতে কী! ওই মিথ্যে বিকোচ্ছে। কারণ মানুষ সবসময় কাউকে না কাউকে গড হিসেবে চায়– সে মানুষ হোক আর ঈশ্বররূপী কল্পিত কেউ হোক!

সে যাকগে, আমার হিরো হওয়া হলে হয়তো মরতেই হতো। কিন্তু তা আমি চাইনি। ফলে ওই পলাতক থাকা অবস্থায়ই একবার এক দুঃসম্পর্কের ভাইয়ের নম্বর থেকে ফোন করলাম তাহসিব ভাইকে। তাহসিব ভাই নরওয়েতে থাকে, এসাইলামের আবেদন করেছে। যখন ব্লগারদের গণহারে খুন করা হচ্ছিল নাস্তিকতার অভিযোগে, তখন সে প্রাণের মায়ায় দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। তাকেই জানালাম আমার হাল, কোথায় আছি, কেমন আছি, কেমন আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছি। সে–ই তখন আমাকে পরামর্শ দিয়েছিল, কালবিলম্ব না করে আইকর্ন আর পেন ইন্টারন্যাশনাল নামের দুই মানবাধিকার সংগঠনের স্কলারশিপের জন্য আবেদন করতে। কিন্তু আমার কাছে তো স্মার্টফোনই নেই! কী করি?

মানুষ যে ইচ্ছে থাকলে উপায় হওয়ার উদাহরণ দেয়, সেটাকে সত্য প্রমাণ করতেই আমি গ্রামের দোকান থেকে আইকর্ন নামের লেখক–শিল্পীদের সাহায্য করা মানবাধিকার সংগঠনটির ফর্ম প্রিন্ট করে আনি হাতে লিখে পূরণ করব বলে।

কিন্তু বিপত্তি বাধে সেই ফর্ম পাঠানোর সময়। যদি আমার অবস্থান ধরা পড়ে যায়?

আমার প্রেমিকটি সেই শূন্যস্থান পূরণ করে। সে আমার হয়ে মেইল পাঠানো শুরু করে, আইকর্নের সাথে যোগাযোগ শুরু করে সে–ই। আমি যা লিখতে বলি তাই লেখে, যা বলতে বলি তাই বলে। আমি প্রায়ই ভাবি ওই ভয়ংকর মুহূর্তে আইনের ভাষায় আমার মতো প্রচলিত আইনের ভাষায় দেশদ্রোহীকে যদি আমার সাহায্য করতে হতো, আমি কী করতাম?

এরই মাঝে আমার ফেসবুক প্রোফাইল থেকে আমার পরিবার আমার লেখার জন্য ক্ষমা চেয়ে ফেসবুক পোস্ট দেয়। রাগে–দুঃখে, লজ্জায়-অপমানে জর্জরিত আমি জানতে পারি, আমার দূরের আত্মীয়দেরও তারা ফোনে কল করেছে, করে জিজ্ঞেস করেছে আমার সাথে তার সম্পর্ক কী! তারা অস্বীকার করেছে আমার সঙ্গে সম্পর্ক বিষয়ে। অর্থাৎ পুলিশের কাছে মিথ্যে বলেছে! সে চায়নি তার দ্বারা আমার কোনো ক্ষতি হোক।

অথচ আমি প্রতিক্ষণ– 'এই পুলিশ জেনে ফেলল বা আমাকে ধরতে এলো' আতঙ্কে সবাইকে সন্দেহ করতে শুরু করেছিলাম। সবাইকে যেমন সন্দেহ হতে শুরু করেছিল চারদিকে তেমনই একদিন আমার নিজের প্রেমিকটিকেও উর্বর মস্তিষ্কের বদৌলতে সন্দেহ হতে শুরু করেছিল। সেই সন্দেহ জন্ম দিয়েছিল আত্মহত্যার প্রতি প্রবল প্ররোচনা।

গ্রামাঞ্চলে যে আত্মীয়দের বাড়িতে ছিলাম, সেখানেই অপেক্ষাকৃত বড়লোক 'পাকা দালান'–এর মালিক আত্মীয়টির বাসায় থাকাকালীন একদিন দোতলার ছাদের কিনারে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম– যদি লাফ দিই এবং মারা যাই, তাহলে কী হবে?

বড়জোর পত্রিকায় একটা নিউজ, ফেসবুকে কয়েকদিন তোলপাড়। আমি যেহেতু সমাজের অনুশাসন না মেনে নেওয়া অবাধ্য মেয়ে, ফলে আমার চরিত্র কতটা খারাপ ছিল, আমি নরকে যাব কি না সেই আলোচনা হবে। সবচেয়ে বেশি হাঁপ ছেড়ে বাঁচবে বাংলাদেশের ক্ষমতার আশেপাশের লোকরা, যারা সমালোচনামূলক কিছু পেলেই ফেসবুকে রিপোর্ট করে, পোস্টের রিচ ডাউন করে দেয়, আইডি ব্যান করার ব্যবস্থা করে। ফেসবুক তার এলগরিদম অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয় বাক্‌স্বাধীনতা রোধ করতে।

নাম বলব না, এরও অনেক আগে তবে বাংলাদেশের টেলিকমিউনিকেশন এক্সচেঞ্জের একাধিক কর্মকর্তা আমাকে জানিয়েছিলেন, এই বাহিনীকেও এর সদস্যদের হাজারে হাজারে বেনামে সিমকার্ড দেওয়া

হয়েছে, বানানো হয়েছে এপ, যাতে বিরোধী যেকোনো কিছু লিখলে একজন সেই লেখার লিংক কপি করে সেখানে দিলে সবাই লেখাটির খোঁজ পেয়ে যায় এবং ঝাঁকে ঝাঁকে রিপোর্ট করতে পারে। এই পদ্ধতিতে প্রতিটি বিরুদ্ধ মতকে দমন করা তো সম্ভবই, বরং অন্যদিকে নির্বাচনের সময়েও এই পদ্ধতির সফল প্রয়োগ দেখিয়ে আমাদের মতো বিরুদ্ধ মতকে চুপ করিয়ে দেওয়া সম্ভব অনলাইন প্রোফাইল ডিজেবল করে।

আমি এমনকি এখনও দেখি ফেসবুকে বিরোধী কিছু লিখলে সেই পোস্ট অনেকে দেখতে পায় না, জানেই না আমি অমনটা লিখেছি!

তবে এসব ঘটনা থেকে আমি বুঝতে পেরেছি আমি এতটাই ভয়ঙ্কর যে আমার কাছে অত্যাধুনিক রাইফেল বা অন্য কোনো মারণাস্ত্র না থাকলেও আমাকে শত্রুজ্ঞান করা হতে পারে! আমি কোনো সাঁজোয়া যানের মালিক না হয়েও দেখেছি আমার বিরুদ্ধে লেখা কেস ফাইলের ওপর জ্বলজ্বল করছে– জান্নাতুন নাঈম প্রীতি ভার্সেস দ্য স্টেট!

আমি তো যুদ্ধ করতে চাইনি। কিন্তু সত্য বলতে গিয়ে আমাকে যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়াতে হয়েছে। তখনকার ভীত–সন্ত্রস্ত আমি এই প্রবল মানসিক টানাপোড়েনেও এক অদ্ভুত দৈব শক্তির মতো টের পেয়েছি– শেষ পর্যন্ত আমার লেখা অস্ত্রের চেয়েও শক্তিশালী!

কারণ মানুষকে চাইলেই মেরে ফেলা যায়, কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে চিরকালের মতো ঢুকিয়ে রাখা যায়। কিন্তু যে মস্তিষ্কের ভেতর বাস করে, সেই চিন্তা, সেই কথা, সেই মত, সেই দর্শনকে আটকে রাখার ক্ষমতা পৃথিবীর কোনো কারাগারেরই নেই!

মার্ক টোয়েনের একটা বিখ্যাত বাণী আছে– বন্ধুর জন্য প্রাণ দেওয়া কঠিন না, কঠিন হলো প্রাণ দেওয়ার মতো বন্ধু খুঁজে পাওয়া। তাই সম্ভবত এই টানাপোড়েনেও সবকিছু হিসাব করে জেনেছি, প্রাণ দিতে পারার মতো বন্ধুটি আর কেউ নয়, সেও আমার প্রেমিকটিই। আমার জীবনের এই যুদ্ধকালীন সময় আমাকে চিনিয়েছে যে মানুষটিকে সেও এই মানুষটিই, যে কখনো পুরুষ হয়ে ওঠেনি, যতটা মানুষ হয়ে উঠেছে।

সবসময় সাহস দিয়ে, ভরসা দিয়ে, সত্যের প্রতি তার অবস্থান দিয়ে সে আমাকে বুঝিয়েছে– পৃথিবী এত সুন্দর, কারণ শেষ পর্যন্ত এখানে সেইসব মানুষও আছে, যারা না থাকলে এই দুঃখে জর্জরিত পৃথিবী আর জীবনের প্রতি অনীহা এসে যেত অনেক আগেই! তাই হয়তো স্বার্থপরের মতো এই মানুষটিকে হারাতে চাইনি বলেই প্রথম সুযোগেই বলেছিলাম– তুমি কি আমাকে বিয়ে করতে রাজি হবে, প্রিজ?

আজকাল প্রায়ই ভাবি– আমার মতো দলিলের সম্পর্কে চূড়ান্ত অবিশ্বাসী মানুষটির আকুতিভরা বিপরীত চরিত্রের দেখা কোথায়ই বা পেতাম, যদি না সে থাকত?

মিথ ও মিথ্যার রাজত্ব

যেকোনো নির্মম সত্যের মতো আমি জানি– প্যারিসের মেয়রের কাছ থেকে আমন্ত্রণ পাওয়া আমি আর আফগানিস্তানের বা সিরিয়ার সীমান্ত পাড়ি দেওয়া মেয়েটির জীবন এক না। আমরা দুজনই রিফিউজির জীবন কাটাব, কিন্তু কেউ কাউকে স্পর্শ করতে পারব না! রিফিউজি ক্যাম্পের যে জীবন তাকে দেখতে হবে, সেই জীবন আমার নয়!

দেশে আমি সরকারের সমালোচনা করেছি, সমালোচনা করেছি ধর্মান্ধতার, গোঁড়ামির। আমি লেখক এবং আমি যেকোনো ধর্মান্ধ পীরকেন্দ্রিক সমাজ আর একনায়ক– দুইয়ের জন্য বিপজ্জনক। পশ্চিম আমাকে আমার প্রতিভার প্রতি মানবিকতায় আশ্রয় দিয়েছে। আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমার মতো লক্ষ লক্ষ লোক পড়ে আছে আমার দেশে, যারা হয়তো সমান প্রতিভা নিয়ে জন্মায়নি, সমান সুযোগ নিয়ে জন্মায়নি। তারা কি আমার মতো সুযোগ পাবে? আমার দেশে যে বাউল শিল্পীকে কেবল গান গাওয়ার অপরাধে কিংবা ধর্মীয় অনুভূতি অবমাননার কথা বলে চুল কেটে দেওয়া হয়েছে জোর করে, সে কি বিচার পেয়েছে? পাবে আদৌ?

মিথ ও মিথ্যার পার্থক্যের যে জীবনটির দেখা আমি পেয়েছি সেখানে দেখি– ইউরোপের মিডিয়া বাংলাদেশের প্রসঙ্গে খানিকটা নীরব। কারণ সম্ভবত বাংলাদেশ থেকে তেমন কিছু তাদের পাওয়ার নেই। আসার পরেও আমি আবিষ্কার করেছি এক অদ্ভুত একচোখা নীতি, সেই নীতিতে যে তালেবানের কাছ থেকে তাড়া খেয়ে এসেছে, সে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে ওয়েস্টার্ন মিডিয়ার চোখে। কিন্তু আমার মতো রাজনৈতিক তাড়া খাওয়াদের ব্যাপারে তেমন ঢাকঢোল নেই। আমি বুঝেছি– এমনকি খোদ পশ্চিমেও মিডিয়ার চোখের ভিক্টিম আর সর্বস্তরের ভিক্টিম এক নয়!

প্যালেস্টাইন প্রসঙ্গে ওয়েস্টার্ন মিডিয়া বিভক্ত, ঠিক যেমন কাশ্মীর বা কুর্দিদের ব্যাপারে ভারত আর তুরস্ক কিংবা উইঘুরদের ব্যাপারে চীন।

অবশ্য মত প্রকাশের স্বাধীনতার বিরোধীদের যেদিন পতন হবে, তখন তারা বাংলাদেশ নিয়েও মুখর হবে বলে আমার ধারণা। এদিকে এও সত্য যে, বাংলাদেশের ঘরপোড়া গরু এই মুহূর্তে দেশের অসংখ্য লোক মনে করে দেশে ইসলামী শরিয়া আইন এলেই সব ম্যাজিকের মতো ঠিক হয়ে যাবে! ইসলামের শাসন মানবতার, শরিয়ার শাসন এলে সমতা প্রতিষ্ঠিত হবে!

বাঙালি যেহেতু চিরকালই হীনম্মন্যতায় ভুগতে থাকা জাত, ফলে এদের মধ্যে বিভেদ লাগানো খুব সহজ। এরা মেজরিটি মুসলিম বলে ধর্মের কারণে জীবন দিয়ে দেবে, আদি কৃষ্টি রক্ষা করতে ইসলামের নামে আরবের আর উপমহাদেশের বহুত্ববাদের জগাখিচুড়ি সংস্কৃতির মাঝামাঝি পালন করবে, কিন্তু মেয়েদের অধিকার বা সমতার কথা এলেই এরা মোল্লা হয়ে উঠবে, মেজরিটি হয়ে উঠবে তথাকথিত ধর্মীয় আইনের পক্ষের লোক।

ষাটের দশকে দেশের আনাচে–কানাচেতে যে মসজিদগুলো গড়ে উঠেছে সেইসব মসজিদ আর মাদ্রাসায় জঙ্গিবাদের মূল বীজ যদি কেউ রোপণ করে থাকে, তাহলে বাংলাদেশের প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলই দায়ী থাকবে। সবচেয়ে বেশি দায়ী থাকবে আওয়ামী লীগ। নির্বাচন ব্যবস্থাকে শেষ করে দিয়ে যদি কেউ সবচেয়ে বেশি লাভবান হয় বাংলাদেশের ইতিহাসে সেটি আর কেউ না, সেটিও তারাই!

আর আমি?

আমি হলাম সেই হতভাগা ঘরপোড়া গরু, যার ঘরই নেই! কারণ আমি ধর্মেরও বিপক্ষ আর কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রেরও! ফলে আমার কপালে ইসলামিস্ট এলে যা, নামেমাত্র 'সেক্যুলার' সেজে থাকা দুর্নীতিবাজ স্বৈরশাসকও তাই!

একারণেই হয়তো ভাগ্যের পরিহাস বুঝতে বুঝতেই পরিহাস মোতাবেক প্যারিসে আমার মতো এক বন্ধুকে পেয়েছিলাম, ইমরানি মোহাম্মদ। জন্মসূত্রে সে প্যালেস্টাইনি। জন্মেছে প্যালেস্টাইনের গাজায়। জন্মের পর থেকে দেখছে ইজরায়েলি আগ্রাসন। প্যালেস্টাইনের স্বাধীনতার পক্ষে (?) লড়া যে ইসলামিক জঙ্গিবাদী দলটি আছে, সেটির নাম– হামাস। হামাসকে পশ্চিমাদের মতো জঙ্গি বলার গুরুত্বপূর্ণ কারণ এরা নিজেরাও ধর্মীয় ফ্যানাটিক। হামাসের উদ্দেশ্য পরিষ্কার নয়, কারণ সে যখনই হামলা করে তখনই ইসরায়েল আরও অসহনশীল হয়ে ওঠে! যেন ইজরায়েলকে সুবিধা করে দিতেই সে হামলা চালায়!

এই নিয়ে বিখ্যাত সাংবাদিক মেহেদী হাসানের ব্লোব্যাক সিরিজের একটা পর্ব আছে যেখানে কি না প্রায় পরিষ্কারভাবে দেখানো হয়েছে– 'হামাস' মূলত ইজরায়েলেরই সৃষ্টি।

তো, সেই দীর্ঘ প্রসঙ্গ থাক। আমার সাথে মিলের ব্যাপারটি হলো– একবার ইমরানির আঁকা ছবি দেখে হামাসের লোকরা ওকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল দুদিনের জন্য, বেঁধে রেখেছিল দাঁড় করিয়ে। প্রশ্ন করেছিল– কেন এমন ন্যাংটো মেয়েদের এঁকেছে ও? ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করার সাহস ও পেল কোথায়? কে ওকে এইসব তথাকথিত অশ্লীল ছবি আঁকার প্রেরণা দেয়? তবে কি ও পশ্চিমাদের এজেন্ট?

ও হামাসকে বোঝাতে পারেনি, ওর ধর্ম ইসলাম যতটা নয়, তারচেয়ে বেশি ন্যাংটো মেয়েদের ছবি আঁকাই ওর ধর্ম, যে ধর্ম ইসলামের চেয়েও হয়তো শক্তিশালী! নইলে এত বিপদ জেনেও ও কেবল অমন ছবিই আঁকতে চাইবে কেন?

একদিন আমাকে লাজুক চেহারায় ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে ও বলল– প্রীতি, তুমি কি আমাকে সাহায্য করবে আমার প্রদর্শনীর খবর প্রচার করতে?

আমার আর্টিস্ট রেসিডেন্সিতে থাকার সুবাদে ইমরানির ওপেন স্টুডিও প্রদর্শনীর পোস্টার সাঁটাতে গিয়েছিলাম রেসিডেন্সিরই বিভিন্ন জায়গায়। সব পোস্টার সেঁটে সেইনের পাড়ে দুজন এক চক্কর দিয়ে কয়েক ঘণ্টার মাঝে ফিরে আসার পরে দেখি কে বা কারা যেন লিফটের মধ্যেকার টানানো পোস্টারটা নখের কিংবা ছুরির আঁচড়ে কুটিকুটি করে কেটে রেখে গেছে আর পাশে এঁকে রেখে গেছে জুইশদের পবিত্র স্টার মার্ক!

আমি কষ্ট পেলাম। কিন্তু জানলাম, আমি একা নই... এই সভ্য নামের দেশে কেউ আর্টিস্ট রেসিডেন্সির মতো আন্তর্জাতিক এলাকায়ও সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে যেতে পারে।

ওই সময় আমার মনে পড়েছিল আমাদের দেশের এক প্রখ্যাত বাউলের কথা, শাহ আব্দুল করিম। এই ভদ্রলোক স্ত্রী সরলার কবর দিয়েছিলেন নিজের বসতভিটায়, জানাজা করেছিলেন নিজে। কোনো মসজিদের ইমাম সরলার জানাজা পড়ায়নি। শাহ আব্দুল করিম সরলার কবরের জায়গাটা নিজে পরিষ্কার করতেন আর বলতেন– সরলা না থাকলে তার করিম হওয়া হতো না! স্ত্রীর কবরের পাশে তাই নিজের কবরটা খুঁড়ে রেখেছিলেন তিনি, সেই কবরেই কথামতো শুয়েছেন মৃত্যুর পরে।

অবশ্য তার আগে নিজের আরেক সঙ্গী বাউল আকবরের মৃত্যুর পরেও তিনিই খুঁড়েছিলেন নিজের কবর, কারণ তখনও একজন বাউলের মৃত্যুর খবর মসজিদের মাইকে প্রচার করা হয়নি!

ওইসময় করিম যে গান লিখেছিলেন সেখানে বলেছিলেন– আমি কুলহারা কলঙ্কিনী, আমারে কেউ ছুঁইয়ো না গো সজনী তাকে অচ্ছুত ঘোষণা করার আফিমে আক্রান্ত সমাজকেই তিনি গানে গানে অচ্ছুত করে দিয়েছিলেন!

শাহ আবদুল করিমকে গান ছেড়ে দিতে বলা হয়েছিল, তার বদলে তিনি ছেড়েছিলেন তার নিজের গ্রাম। নিরাপত্তার অভাবে। কার্ল মার্কস যেমন ছেড়েছিলেন জার্মানি। এমনকি করিমকে একবার সারারাত ওয়াজে গালমন্দ করা হয়েছিল। জিজ্ঞেস করা হয়েছিল– করিম, তুমি কি গান ছাড়বা?

করিম বলেছিলেন– আমি মিথ্যা কইতে পারব না।

এরও অনেক অনেক বছর পরে যখন সামান্য নামডাক হয়েছিল তাঁর, তখনও ছেঁড়া পাঞ্জাবি পরে একবার রেডিওর চেক ভাঙাতে গিয়ে অপমানিত হয়ে তিনি বলেছিলেন– আমি তো রাষ্ট্রের ট্যাক্স ফাঁকি দেই নাই, তাইলে তারা আমার কাপড় দেখে সম্মান নির্ধারণ করবে কেন?

করিম জানতেন না যে সমাজ তাঁকে বিখ্যাত বলে ঘোষণা দিতে পারে, সেই তারাই আবার অপরিণত মনটির দোহাই দিয়ে কেবল কাপড় দেখে তাঁকে খারিজ করে দিতে পারে! এমন কুটিল সমাজের সরল লোক হওয়ার অভিশাপ তিনি এড়াবেন কেমন করে?

শাহ আব্দুল করিম চাইতেন– উনার গান বিকৃত করে সুর বদলে গাওয়া হলেও কথাটা যেন ঠিক থাকে। কারণ সেই গানটা কেবল গান না, সেটা একটা আদর্শ! এই আদর্শের জন্য অনেকদূর যাওয়া যায়! এই আদর্শ কেবল মানুষ হিসেবে মানুষের কথাই বলত। সিলেটের হাওড়ের পানিতে বান এলে সেই কথারা ছড়িয়ে পড়ত জলে–স্থলে আর অন্তরীক্ষে!

প্যারিসে আসার পরেও একজন আমাকে বলেছিলেন– আচ্ছা, দেশে থাকতে লেখার জন্য মামলা খেয়েছ, মৌলবাদীরা তোমাকে হুমকি দিত, কিন্তু তাও লেখাটা ছাড়লা না কেন?

আমি শাহ আব্দুল করিমের মতো করেই তাকে বলেছিলাম– আমি আসলে লেখার মধ্য দিয়ে একটা আদর্শ প্রচার করতে চাই। আমি চাই কেউ একদিন বাধ্য হবে না দেশত্যাগ করতে, সে দেশে বসেই সেই কথাটা একদিন বলতে পারবে যে কথাটা বিদেশে বসে আজকে আমার বলতে হচ্ছে! কারণ আমি জানি, আমি সেই সংখ্যালঘু যাকে ধর্ম, গোত্র, জাতীয়তা কোনো ভাগেই ফেলা যায় না। কিন্তু একদিন এই দিন থাকবে না। আমি মূলত সেদিনের জন্য লেখাটা লিখি!

প্রসঙ্গক্রমে আরও বলে রাখি– আমাদের পুরো প্রজন্মকে জন্মের পর থেকে শেখানো হয়েছিল পাকিস্তানকে ঘৃণা করতে হবে। কারণ উনিশশো একাত্তর সাল এরা আমাদের ত্রিশ লাখ সাধারণ নিরপরাধ মানুষকে নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে মেরেছিল। ফলে পাকিস্তানে দুর্ঘটনা ঘটুক, বন্যা হোক, আমি দেখি আজও এক শ্রেণি উল্লাসে ফেটে পড়ছে। এরই ধারাবাহিকতায় একদিন দেখেছিলাম পাকিস্তানে তালেবানের গুলিতে আহত সবচেয়ে কমবয়সি হিসেবে শান্তিতে পাকিস্তানের মালালা ইউসুফজাই নোবেল প্রাইজ পেয়েছে ভারতের কৈলাস সত্যার্থির সাথে। যথারীতি বাঙালি হিসেবে জাতীয়তাবাদের পালে হাওয়া দিয়ে এক শ্রেণি মালালাকে গালাগাল করছে– মাথায় গুলি খেয়েই নোবেল প্রাইজ পেয়ে গেল? কী কপাল!

অথচ মেয়েদের শিক্ষা নিয়ে সংগ্রাম করার ইতিহাস তার পুরাতন। কিন্তু ওই পাকিস্তান নামটিই যথেষ্ট সেই সংগ্রামকে ধূলিসাৎ করতে!

অথচ আমি দেখেছিলাম নোবেল প্রাইজ পাওয়ার আগে মালালা ইউসুফজাইকে একটা সাক্ষাৎকারে উপস্থাপক জিজ্ঞেস করেছিলেন– যারা তোমার মাথায় গুলি করেছিল তাদেরকে তোমার কী বলার আছে?

মালালা খুব দ্বিধাহীন গলায় বলেছিল– আমি তাদেরকে বলতে চাই, এমনকি আমি তোমার মেয়ের শিক্ষার জন্যও লড়াই করব!

মাত্র এগারো বছর বয়সে মাথায় গুলি খেয়ে যে বাচ্চা মেয়ের জীবন বদলে গিয়েছিল, গুলি লাগা অবস্থায় যে প্রায় তিন দিন অজ্ঞান ছিল, যে বুঝতে শিখেছে শিক্ষার জন্য স্কুলে গেছে মেয়ে হয়ে বলে তাকে গুলি করেছে তালেবান, অপারেশনের পরে যার মাথার খুলির খানিকটা অংশ কেটে বাদ দিতে হয়েছে– তাকে নিয়ে মজা করার কোন যোগ্যতাটা ওই লোকদের আছে যারা এখনও বোঝেনি, ওই গুলিটা হতে পারত এই বাচ্চা মেয়েটার জীবনের দাম?

আর তাই 'আমি তোমার মেয়ের শিক্ষার জন্যও লড়াই করব!' এই কথা যে বলতে পারে, তাকে শুধু পাকিস্তানি বলে আমাদের জাতীয়তাবাদী শিক্ষকদের মতো আমি খারিজ করতে পারিনি।

পাশাপাশি ধর্মে বিশ্বাসের মতোই আমি ক্রিকেট খেলা দেখা ছেড়ে দিয়েছি, কারণ ক্রিকেট নিয়ে উপমহাদেশে যে জঘন্য জাতীয়তাবাদী ঘৃণার চাষাবাদ হয় তা অবর্ণনীয়। দুনিয়া সম্পর্কে আমি যতই জেনেছি, ততই শিখেছি– দেশপ্রেম এক বায়বীয় ব্যাপার। কারণ আজ যে দেশের জন্য আপনি লড়াই করছেন, কাল সেই দেশের ভালো চেয়ে দেশের চোরদের কথা

যদি আপনি জনসম্মুখে প্রচার করেন, তাহলে ভাবমূর্তি নষ্টের অপরাধে উলটো আপনি নিজেই হয়ে যেতে পারেন দেশদ্রোহী। আমার কাছে দেশপ্রেমের কথা বলা জাতীয়তাবাদ ধর্মের মতোই আরেক মিথ।

পাকিস্তানের যে শিশু বোমা হামলায় মারা যায়, আরেকটু সৌভাগ্যবান হলে হামলায় হাত–পা হারিয়ে বাকি জীবন পঙ্গুর জীবন কাটাতে হয় যাকে, যে মাথায় গুলি খেয়ে মৌলবাদীদের টার্গেটেড লিস্টের প্রথমে দাঁড়িয়ে থাকে, যারা বন্যায় ডুবে যায়, তাদের প্রতি আমার ঘৃণা নেই। যে ১৩ জন পাকিস্তানি লেখক ও সাংবাদিক বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে কলম ধরেছিলেন, যাঁদের আশ্রয় হয়েছিল কারাগারগুলোতে তাঁদেরকে কেবল 'পাকিস্তানি' বলেই উন্নাসিক জাতীয়তাবাদী কবি–সাহিত্যিকদের মতো 'তারা ফুল নিয়ে আসলেও আমি তাঁদের বিশ্বাস করি না' একথা আমি বলতে পারব না।

নিজের ঠুলি খুলে হয়তো দেখতে পাবো সাত পুরুষ আগে পাকিস্তানের কেউ, আফগান কেউ, মরক্কোর কোনো পর্যটক অথবা স্বয়ং চেঙ্গিস খান আমার রক্তের সম্পর্কের কেউ হয়! দুনিয়ায় কার রক্ত কোথায় মিশেছে তার হদিসই বা কোথায়?

এর মানে এও নয় যে, নিজেদের ভূখণ্ডের লোকদের ওপর চলা গণহত্যাকে ভুলে যেতে হবে, শুধু মনে রাখতে হবে– বোমা হামলায় মারা যাওয়া পাকিস্তানি শিশু আপনার পূর্বপুরুষের ওপর গণহত্যা চালায়নি!

দুনিয়ার ইতিহাস তো বেদনারই। কয়েকশো বছর আগে যে রেড ইন্ডিয়ানদের মারতে স্প্যানিশ দখলদার বাহিনী কম্বল উপহার দিত ওদের জলবসন্তের রোগীদের ব্যবহার করা, সেই কম্বল গায়ে ঢেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত স্থানীয় ওইসব অধিবাসীরা। আর অন্যদিকে আমেরিকা আবিষ্কারের কৃতিত্ব কুড়াত দখলদার স্প্যানিশ বাহিনীর নেতা কলম্বাস। কম্বলগুলো উপহার নেওয়া আদিবাসীদের বোকামি না, ওরা কেবল 'বিশ্বাস' করেছিল- ওদের ক্ষতি হবে না এতে! অপরাধ যারা করেছে, তাদের তো শাস্তি পেতেই হবে, অন্তত লেখা তো থাকবে অপরাধীর নাম! কিন্তু যে অপরাধ করেনি, তাকে শাস্তি দেওয়ার জাতীয়তাবাদী ঘৃণার নাম যদি দেশপ্রেম হয়, তাহলে সেই বিধ্বংসী প্রেম দিয়ে আমরা কী করব?

এইসব প্রশ্ন আর উত্তরই আমাকে জানিয়েছিল দেশপ্রেম মূলত এক অতি অন্ধ কুসংস্কার, মূলত ধর্মের প্রতি প্রেমের নিদর্শন হিসেবে দেখানো উন্মাদনার মতোই মিথ, যেখানে নিজের দেশকে ভালোবাসতে অন্যকে ঘৃণা করতে হয় নিজের ধর্মকে শ্রেষ্ঠ ভেবে অন্যদের অবজ্ঞা করার নিয়মেই!

অথচ, যেদিন এই সকল যুদ্ধ কত ভিত্তিহীন মানুষরা বুঝবে, সেদিন হয়তো ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের কারণে দেশ হারানো আমার প্রিয় উর্দু ভাষার গল্পকার মান্টোর মতো ওরাও বলতে শিখবে– বলো না যুদ্ধে এক লাখ হিন্দু আর এক লাখ মুসলমান মরেছে। বরং বলো– যুদ্ধে দুই লাখ মানুষ মরেছে। আর মানুষের মরাটা ট্র্যাজেডি নয়, ট্র্যাজেডি হলো– ওরা অকারণে মরল!

বিশ্বাসের মুলো ও মূল্য

ধর্ম আর কর্ম শব্দ দুটো বাংলা ভাষায় পাশাপাশি উচ্চারিত হয়। একারণেই বাংলাদেশে যে বাজারে মন্দাভাব নেই, যে বাজারে কাটতির কমতি নেই সেই বাজারের নাম ধর্মের বাজার, বিশেষ করে বলতে গেলে– ইসলাম ধর্মের বাজার। টুপি পরে দাড়ি রেখে অপকর্ম করার লাখ লাখ নিদর্শন বাংলাদেশে যত্রতত্র, এমনকি বাংলাদেশের জন্মেরও আগের কথা। একাত্তর সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধে এমনকি মেয়েদের মসজিদের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করারও নমুনা আছে। তবুও লোকের ধর্মপ্রীতি কমেনি!

কমেনি কারণ দেশের মূল জনগোষ্ঠীই দরিদ্র, অধিকার সম্পর্কে চূড়ান্ত অসচেতন, প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত। ফলে এই দরিদ্র জনগোষ্ঠী প্রতারিত হয় জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় দুর্নীতিবাজ মেম্বার, এমপি, চেয়ারম্যানদের দ্বারা। দেখা যায় ঘূর্ণিঝড়ে ঘর ভেঙে গেছে, সরকার যে ত্রাণের টাকা দিয়েছে, সেটাও দুর্নীতিবাজ জনপ্রতিনিধি মেরেকেটে খেয়েছে। এরপর ওই গরিব শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত লোকটি সেই জনপ্রতিনিধির বিচার চাইবে কার কাছে? এমনকি সেই জনপ্রতিনিধি লোকটিও পেশিশক্তির জোরেই টিকে থাকে, ভাড়ায় খাটা গুন্ডাও থাকে ওদের। ফলে এই যে ঘরহারা লোকটি, সে কাউকে না পেয়ে বিচার চায় সৃষ্টিকর্তার কাছে!

জন্মের পর সামান্য বোধের শিশুকালে ধর্ম নিয়ে আমার জ্ঞান ছিল ভাসা ভাসা। ঘুমের সময় বাবার শিখিয়ে দেওয়া আয়াতুল কুরসি নামের আরবি ভাষায় প্রলাপের মতো। অর্থ জানি না, কিছুই জানি না, কেবল জানি– এই ভাষায় ডাকলে এক অদৃশ্য প্রভু আমার কথা বুঝবেন। কিন্তু একদিন নিউটনের মাথায় আপেল পড়ার মতোই আমার মাথায় এলো– আরেহ!

সৃষ্টিকর্তা যদি আরবিই বোঝেন, তাহলে দুনিয়ার এতগুলো ভাষার সৃষ্টিকর্তা কে?

যতই ধর্মগ্রন্থ পড়তে থাকলাম হাসি কমল না। বরং সেই হাসি বিস্তৃত হলো।

সবচেয়ে বেশি হাসি পেল– নিজের নাম নিয়ে । যেমন ধরেন– আমার নাম জান্নাতুন নাঈম। ধর্মমতে এক স্বর্গের নাম। অথচ যতদিনে ইসলামের সমালোচনা করতে শুরু করেছি, লোকে বলা আরম্ভ করেছে– নাস্তিক কোথাকার, তোর নরকেও ঠাঁই হবে না! তোর নাম জান্নাতুন নাঈম কেন?

আমি পালটা প্রশ্ন করতে শিখেছি তদ্দিনে। জিজ্ঞেস করেছি– ইসলামের নবি মোহাম্মদের নাম মোহাম্মদ কেন?

মোহাম্মদ কুরাইশ গোত্রে জন্মানোর পর ওর নাম ছিল মোহাম্মদ। মোহাম্মদের চৌদ্দগুষ্টি ছিল মূর্তি পূজারি। মোহাম্মদের নাম নিয়ে সমস্যা নাই, আর আমার নাম নিয়ে সমস্যা?

প্রতিটি ধর্মগুরু সহ যাবতীয় ধর্মকেই আমার হাস্যকর লাগে ততদিনে। এই যে আইয়ামে জাহেলিয়াত নামের সময়ের বর্ণনা, যেসময় নারীদের জীবন্ত পুঁতে ফেলা হতো, কন্যা জন্ম নিলে জ্যান্ত মাটিচাপা দিত। কিন্তু তাই যদি সত্যি হবে তাহলে মোহাম্মদকে বিয়ে করা খাদিজা কেমন করে ব্যবসা করতেন? কেমন করে মোহাম্মদের এত কর্মচারীকে বেতন দিতেন?

শুধু কী তাই! মোহাম্মদ ছিল খাদিজার তিন নম্বর স্বামী। ওইরকম সমাজ ব্যবস্থায়, খাদিজার মতো একজন ব্যবসায়ী নারী যার কর্মচারী ছিলেন মোহাম্মদ নিজে, যার কি না তিন নম্বর স্বামী মোহাম্মদ, যে মোহাম্মদ কি না খাদিজার চেয়ে কমপক্ষে পনেরো থেকে বিশ বছরের ছোট বয়সে, সেই যুগকে অন্ধকার যুগ বলা হবে কেন? বরং অন্ধকার যুগ বলে কিছু থাকলে সে তো ধর্মটি ধর্মরূপে আসার পরেই অন্ধকার যুগের শুরু হয়েছে। আর মেয়েদের পুঁতে ফেললে মেয়ের সংখ্যা কম হওয়ার কথা আরবে। কিন্তু তাতো হয়নি।

বরং আরবের লোকেরা হেসে–খেলে, নেচে–গেয়ে, মৃত্যুর আগে মৃত্যুর পরের জীবনের ওপর বিশ্বাস না রাখা এক জীবন কাটাচ্ছিল। এই বিশ্বাসে ধস নেমেছে। এতটুকুই। উলটো পৃথিবীর আর তাবৎ ক্ষমতালোভী শাসকেরা যা করে তিনিও তাই করেছেন। নির্দ্বিধায় লোকদের খুন করে, মেয়েদের ধর্ষণ করে, ভিন্ন ধর্মের ভিন্ন গোত্রের এলাকায় নিজের সৈন্যদের নামিয়ে সেই এলাকার সম্পদ লুঠ করে তিনি সাজলেন পয়গম্বর, ওড়ালেন ইসলামের

বিজয় নিশান। আমার মতে– এই ধর্ম কখনো আধ্যাত্মিক কিছু ছিল না, ছিল মেয়েদের বন্দি করার, দেশ আর জনপদ দখলের রাজনৈতিক হাতিয়ার।

বৌদ্ধধর্মের গৌতম বুদ্ধ, তিনিও কি কম? তিনি তো নারীকে ধ্যানের ক্ষেত্রে বাধা হিসেবেই ধরেছেন। আবার নিজের সম্পর্কে খালাকে নিয়েও ধ্যান করেছেন। কারণ তিনি মহামতি বুদ্ধ, তার ক্ষেত্রে দর্শন ভিন্ন!

অথচ ধর্মের ইতিহাস পড়ার পর থেকেই আমার মতে সব পয়গম্বরই এক। যারা ইচ্ছেমতো লুঠ, খুন, দখলের পর এসে সাফাই গেয়েছেন সৃষ্টিকর্তার। বলেছেন– সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছাতেই এমন হয়েছে। আল্লাহ্ খুন করতে বলেছেন। হিটলার যেটাকে 'গ্রেটার গুড' বলে চালিয়েছেন, সমস্ত সমস্যার মূলে ইহুদিদেরকে দুষেছেন, প্রতিটি পয়গম্বরই এর থেকে সামান্য কম ছিলেন না। বরং অনেকে ছিলেন আরও বেশি ভয়ংকর, এমনকি হিটলারের চেয়েও। কারণ হিটলার কখনো 'পয়গম্বর' হয়ে ওঠেননি, তিনি ধর্মের বিষকে রাজনীতিতে রূপান্তর করেছিলেন। ইহুদিরাই জার্মান জাতির পিছিয়ে থাকার অন্তরায় বলে চালিয়েছিলেন। অন্যদিকে ধর্মগুলোও তাই। ঈশ্বর নিজের মুখের কথা নিজে বলতে পারেন না, বলেন পয়গম্বরদের। আবার সেই কথা বলারও কত ফ্যাঁকড়া। ঈশ্বরের পক্ষ থেকে আসেন দেবদ্যুতেরা। বলেন– হে দেবদূত, তুমি আমার হয়ে তমুককে অমুক কথা বলো।

একারণেই ধর্মগুরুদের মাঝেমধ্যে রাশিয়ার এককালের শাসক সম্রাট চতুর্থ ইভানের জাতভাই বলেও মনে হয়েছে। এই ইভানকে আরেক নামে ডাকা হয়– ভয়ংকর ইভান বা ইভান দ্য টেরিবল। এই ইভান নিজের ছেলের মাথায় হাতুড়ির বাড়ি মেরে হত্যা করেছিলেন। ধর্মীয় পয়গম্বরেরা যেমন ধর্মপ্রচারের জন্য হত্যা, লুঠ সব জায়েজ হয়ে গিয়েছিল কথিত দৈব নির্দেশে, সেরকম ইভান দ্য টেরিবলের প্রতিটা যুদ্ধ জয়ের পর একটা করে ক্যাথিড্রাল নির্মাণের বাতিক হয়ে গিয়েছিল। এরই ধারাবাহিকতায় ১৫৫৫ থেকে ১৫৬০ সাল পর্যন্ত ইভান দ্য টেরিবল রাশিয়ার বিখ্যাত সেন্ট বাসিল ক্যাথিড্রাল নির্মাণের নির্দেশ দেয়। এই নির্মানকাজ শেষ হওয়ার পরে এই ক্যাথিড্রালের প্রধান স্থপতি ইয়াকবলেভের চোখ নষ্ট করে দেয় যেন পরবর্তীতে সে আর কিছুতেই অন্য কোনো দেশে গিয়ে এরচেয়ে সুন্দর ভবন না বানাতে পারে!

ধর্মগুরুরা নিজেদের জন্য জাগতিক কোনো সুখেরই কমতি রাখেননি। এককালে অটোমানরা, চীনের মিং সম্রাটরা নিজেদের হারেম বানিয়েছেন, হারেমের এক ডজনেরও বেশি স্ত্রী আর দাসীর সাথে কাটানোর জন্য রাত

ভাগ করে নিয়েছেন। প্রতিটি পয়গম্বরই যৌনাচারকে বলেছেন– যা হয়েছে সৃষ্টিকর্তার আদেশেই হয়েছে।

সৃষ্টিকর্তা চেয়েছেন বলেই তারা সাথে শুয়েছেন!

আবার ব্যতিক্রমও হয়েছে। যেমন ছিল আরবের আয়েশা। আয়েশা ছয় বছর বয়সে বাপের পুরুষতান্ত্রিক সিদ্ধান্তে বলি যেমন হয়েছিল তেমনই আবার বাকিটা আদায়ও করে নিয়েছিল। সবচেয়ে বেশি হাদিস বর্ণনাকারী ছিল সে, এমনকি ইসলামের মতো এমন ধর্মের ইতিহাসে সবচেয়ে নারীবান্ধব হাদিসগুলো ওই আয়েশারই দেওয়া। রাষ্ট্রীয় পলিসি থেকে শুরু করে অন্দরের কূটচাল সবই আয়েশার ম্যাজিক। ওই আমলের ইসলামের খলিফাদের দিকে তাকালেই বোঝা যায়, আয়েশা কে! মোহাম্মদের মৃত্যুর পরে ক্ষমতায় বসা লোকটা আবু বকর ওরফে আয়েশার বাবা। এরপর যে ক্ষমতায় ছিল সেই ওমর টেকনিক্যালি মোহাম্মদের আরেক শ্বশুর, হাফসার বাবা। পরেরজন সেই ওসমান যে কি না মোহাম্মদের আরেক মেয়ের জামাই, আর শেষজন 'আলী' যে কী না মেয়ে ফাতেমার জামাই। আয়েশা আলীর সাথে যুদ্ধ করতে তরবারি হাতে সৌদি থেকে ইরাক পর্যন্ত গিয়েছিল। যার জন্য গিয়েছিল সেই ওসমানও বিভিন্ন সময়ে আয়েশার বিরুদ্ধে পরকীয়ার অভিযোগ আনতে ভোলেনি।

চৌষট্টি বছর বয়সে যে আয়েশা মারা গিয়েছিল, কিন্তু যতটা পেরেছিল ততটাই সে করেছিল মেয়েদের জন্য। ওই নারীবিদ্বেষী আরবের সমাজ ও সংস্কৃতিতে সে ছিল আলোর মতোই। প্রাচ্য তখন একই পথের পথিক, আর পাশ্চাত্যে তখন মেয়েদের ডাইনি উপাধিতে পোড়ানোর উৎসব।

কিন্তু সেসব বাদ দিলেও প্রতিটি ধর্মই যেমন নারীকে শত্রু জ্ঞান করেছে, তেমনই সেসবের বিচারও বড় ভয়াবহ। বোন ভাইয়ের অর্ধেক পাবে সম্পত্তিতে, মেয়েটিকে যুদ্ধের মধ্যে ভোগদখল করে ডাকা হবে 'গণিমতের মাল'। ধর্ষণকে ওই ধর্মে ডাকা হয় ব্যভিচার। সেই ব্যভিচারের শাস্তি ধর্ষিতাকে পাথর মারা! অবশ্য আব্রাহামিক অন্য ধর্মগুলোও তাই, এককালে ডাইনি বলে এই ইউরোপের রাস্তায়ই জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছে, সে কথা ভুললে চলবে? ভালো কাজ করলে পুরুষটিকে মৃত্যুর পর দেওয়া হবে ৭২ জন শয্যাসঙ্গী আর নারীটিকে দেওয়া হবে তার সেই পুরাতন স্বামী! এই হলো বিচার!

অবশ্য ধর্মের ইতিহাস চিরকালই আমার আগ্রহের বিষয়। জানাশোনা আর পড়াশোনার বদৌলতে বুঝেছিলাম– পৃথিবীতে যত ধর্ম এসেছে

সবখানে নরকের বর্ণনা আবহাওয়ার সাথে সম্পর্কিত। ইসলামের জন্ম মধ্যপ্রাচ্যে বলেই কি না, ওই ধর্মে নরক হিসেবে দেখানো হয়েছে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড। আবার নর্ডিক বা উত্তর মেরুর আশেপাশের দেশগুলোতে যেসব ধর্ম জন্মেছে তাদের সবার নরক বিভীষিকাময় ঠান্ডা!

যেমন আবার আমার বিবেচনায় দান্তের অতিবিখ্যাত গ্রন্থ ডিভাইন কমেডিতে যে দোজখের বর্ণনা আছে সেটা ইসলামের স্বর্গ কিংবা বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থার চেয়ে হয়তো অনেক ভালো। দান্তের ডিভাইন কমেডি কাব্যে পাপ তিন প্রকার— যথাক্রমে আদি পাপ বা লিপ্সা, মধ্যম পাপ বা সন্ত্রাস আর বিকৃত ক্ষুধা, তিন নম্বর পাপ হলো প্রতারণা। অথচ আমি নিশ্চিত বাংলাদেশের সেন্সরশিপে ভরা সংবাদপত্রগুলোতে যেসব খবর প্রকাশিত হয়, সেসব জেনে দান্তের পাগল হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। যেমন ধরেন— এক বাবা তার মেয়েকে নিয়ে রেললাইনে ঝাঁপ দিয়েছে, কারণ মেয়ে তার ধর্ষিত হয়েছিল। চেয়ারম্যান ধর্ষকের সাথে কথা বলে মিলেমিশে এক নাটক সাজিয়েছিল, সেই লোক দেখানো বিচার শেষে বিচার পাবে না জেনে সেই বাবা আর মেয়ে দুজনেই রেল গাড়ির নিচে মাথা পেতে দিয়েছে।

পুলিশের হেফাজতে গনধর্ষণের শিকার হয়েছে বহু নারী, স্বামী খুন করে রেখে গেছে স্ত্রীকে, পরকীয়ায় জড়িয়ে স্ত্রী খুন করেছে স্বামীকে, রাজনৈতিক কোন্দলে জড়িয়ে জনসম্মুখে পিটিয়ে মারা, মায়ের কোলের মধ্যে থাকা শিশুর গায়ে অতর্কিতে ছোড়া বুলেট লাগা, সড়কে প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনা, ফিটনেসবিহীন গাড়ি চলা, ড্রাইভিং লাইসেন্স না থাকা, পাচার করার সময় দালাল গ্রেপ্তার, চাকরির লোভ দেখিয়ে পতিতালয়ে বিক্রি, শ্বাসরুদ্ধ করে মারা, নদীর পানিতে লাশ ফেলে দেওয়া কিংবা বস্তাবন্দি লাশ উদ্ধার, ফ্লাইওভারের কাজ চলাকালীন সেই ফ্লাইওভারের গার্ডার পড়ে নিহত হওয়া, নিয়ম না মেনে কেমিক্যাল রাখার পর ভয়াবহ বিস্ফোরণে শত শত মৃত্যু— এইগুলো বাংলাদেশের প্রতিদিনের সংবাদপত্রের ঘটনা। সব দুর্ঘটনা ধরা পড়েনি, সব অপরাধ লেখা হয়নি, তারপরও এটা দান্তের দোজখের চেয়ে কোটিগুণ ভয়াবহ।

স্বর্গ—নরকের বর্ণনা ফেলে এসব থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো— বাংলাদেশ নামের রাষ্ট্রটি আদতে কোনো রাষ্ট্র না, কোনো ধর্মান্ধতাই যেমন আদতে আর কোনো ধর্ম নয়! দান্তের মতানুযায়ী বাংলাদেশ আজ যেমন লুটেরাদের স্বর্গ আর সাধারণ মানুষের জন্য দোজখ। সেই সাধারণ মানুষও যে ধোয়া তুলসীপাতা, তাও না। জীবন ধারণের সুবিধা করতে সেও

দায়ের কোপ মারার তালে আছে। যেমন রিকশাওয়ালা হলে, সে দুই টাকা বেশি চাইবে গন্তব্য না চেনা যাত্রীর কাছে, দোকানদার হলে দাম হাঁকবে প্যারিসের কোনো ভালো ব্র্যান্ডের কাপড়ের সমান, মুদি দোকানি হলে তেলের দাম, পেঁয়াজের দাম দুটাকা বেশি বলবে। এটা এক সামগ্রিক অভ্যাস। তোষামোদির এই সংস্কৃতি যেহেতু রন্ধ্রে রন্ধ্রে তাই আজ বাংলাদেশের ছোট্ট শিশুটিও জানে— বাংলা নববর্ষের কথা জিজ্ঞেস করলে তাকে ক্ষমতাসীন দলকে তুষ্ট করতে মুখে জাতির প্রধান নেতাটির নাম নিতে হবে! বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রটিও জানে, পরীক্ষায় ভালো নম্বর পেতে দরকার হলে বিভাগের সভাপতি শিক্ষকটির জুতো পালিশ করতে হবে।

ইংরেজিতে একে বলে— এক্সপ্রয়েটেশান, বাংলায় বিনষ্টকরণ। রাষ্ট্রীয়, ধর্মীয় এবং সামাজিকভাবে ভালোমন্দের ধারণা যেহেতু সামগ্রিক, তাই এই রাষ্ট্র ও তার লুটেরাবাহিনী এর অধিবাসীদের ভালোমন্দের ধারণাও নষ্ট করে ফেলেছে। ফলে দেশ ভরে গেছে পীরে, ধর্মীয় বইয়ের বিক্রি বেড়ে গেছে, মসজিদ বানানো হচ্ছে দেদারসে, কিন্তু চারদিকে তাও কেবল অনৈতিকতা।

কোনো সমাজ যখন ভেতরে ভেতরে অনৈতিক, অনিয়মের চূড়ান্ত হয় তখন তাদের মুখে কেবল নৈতিকতার বাণী শোনা যায়। বাংলাদেশও তেমন। এখানে মুখে মুখে ধর্মের বাণী, চোখের সামনে দেশপ্রেমের প্রচারণা হলেও বাংলাদেশ মূলত দান্তের দোজখ।

এজন্য আজকাল বাংলাদেশের কেউ যখন পশ্চিমের দুর্নাম করে তখন বুঝে নিতে হয়— ও মূলত পশ্চিমে আসার সুযোগ পাচ্ছে না বলেই দুর্নাম করছে। যে কারণে শ্রেণি বিভাজন আর সমাজতন্ত্রের কথা বলা বাম নেতাদের পরিবার পরিজনও সুযোগ পেলেই পশ্চিমের ওই পুঁজিবাদী সমাজেই খুঁজে পাওয়া যায়! ফলে সমাজতন্ত্র চাপা পড়ে যায় সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞাপন ছাপা পুঁজিবাদী সমাজের বিলবোর্ডে! যেমনটা ঘটে সেইসব ধর্মপ্রাণ বলে পরিচিত তথাকথিত লোকদের ক্ষেত্রে যারা রোজ আমেরিকা ইউরোপকে গালি দেয়, হজ করতে সৌদি আরবে যায় কিন্তু আমেরিকার ভিসা পেয়ে 'আলহামদুলিল্লাহ' লেখে!

কারণ দেশ-কাল-ধর্ম-গোত্র নির্বিশেষে প্রতিটি ভণ্ডই হলো সেই লোক যে কি না যা মুখে বলে তা বিশ্বাস করে না আর যা বিশ্বাস করে তা বলে না! কারণ বায়বীয় বিশ্বাস সব সময়ই মুলো দেখায়, কিন্তু মূল্য পরিশোধ করে না কখনোই।

আদালত

বাংলাদেশের আদালতে গিয়ে বুঝেছিলাম, যে আদালত নাটক—সিনেমায় দেখায় সেই আদালত কেবলই প্রহসন। সত্যিকারের আদালত যদি বাংলাদেশের কোনো সিনেমা—নাটকে দেখানো হতো তাহলে সেই সিনেমা-নাটকের আদালতকে ওদেশের আদালতের কাঠগড়ায় উঠতে হতো!

দেখেছিলাম বাংলাদেশের আদালতে ঘুষখোর যে লোকগুলো তাবেদারিতে সবচেয়ে পটু তারা হলো বিচারক আর পাবলিক প্রসিকিউটর। প্রতিটি বিচার নামক প্রহসন শেষে এই লোকগুলো বত্রিশটি দাঁত বের করে আমার কাছে নির্লজ্জের মতো টাকা চাইত। আমি দিতে বাধ্য হতাম কারণ তদ্দিনে জেনেই গিয়েছি— আদালত মানে মূলত ওটা টাকার খেলা, আর নষ্টদের আখড়া। ওইখানে দাঁড়িয়ে চিৎকার করলে সেই চিৎকারকেও আদালত অবমাননা বলা হবে ওই দেশে, এমনই দুর্দশা!

আর ধান্ধাবাজ কেবল বিচারকই না, স্বয়ং উকিলরাও। যেমন আমাকে পালিয়ে থাকার পরামর্শ দিয়েছিলেন জ্যোতির্ময় বড়ুয়া, ডাকসাইটে উকিল। বেশ নাম আছে মানবাধিকার নিয়ে কাজ করার। কিন্তু সেই তার কাছেই যখন আমি পলাতক থাকতে বাধ্য হওয়া আত্মসমর্পণকারী আমার পরিবারটি গেল, তখন তিনি বলেছিলেন— ক্ষমা চেয়েছেন আপনারা যারা মামলা করেছে তাদের কাছে? আপনারাই মীমাংসা করেন গা তাহলে!

এরপর পরামর্শ দিয়েছিলেন নিম্ন আদালতে গিয়ে আত্মসমর্পণ করার। জ্যোতির্ময় বড়ুয়া কি জানতেন না যে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে আমার নামে মামলা হয়েছে, সেই আইনে জামিন দেওয়ার ক্ষমতা শুধুমাত্র দেশের উচ্চ আদালত ছাড়া আর কারোর নেই? আজও ভাবি— জেনেও তিনি এই ভুল পরামর্শ কেন দিয়েছিলেন? তিনিও কি চেয়েছিলেন সরকার দলের

লোকদেরই চাওয়া মতোন যেন আমার একটা শিক্ষা হয় এবং আমি অ্যারেস্ট হয়ে জেলে যাই? এরপর পুলিশের যৌন হয়রানি কিংবা ধর্ষণের শিকার হই?

সাংবাদিক তাসনীম খলিলকেও ওই পলাতক থাকতেই দ্বিতীয়বারের মতো ফোন করেছিলাম এক গোপন আস্তানা থেকে। তিনি বলেছিলেন– আপনি যে নিজে থেকে মাফ চাননি, আপনার হয়ে আপনার পরিবারের সদস্যরা চাইছে, এতে তো আপনার মাথা কাটা গেল! এটা মিথ্যা বলে ঘোষণা দেন!

আমার বলতে ইচ্ছে করেছিল– আহা তাসনীম, আপনি কি জানেন না বাংলাদেশে কোনো বিচারই নেই? যেদেশে আইনই আছে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কর্তাব্যক্তির সমালোচনা করলে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা করা যাবে, সেখানে আমাকে রেপ করা বা খুন করার জন্য যারা উদ্যত, তাদের ক্ষেপিয়ে দিয়ে কি পেতাম আমি আবারও মামলাটা সক্রিয় করে তোলা ছাড়া? জীবন নিয়ে বেরোতে পারতাম ওদেশ থেকে? আপনি কি জানেন না বাংলাদেশে টাকা ছাড়া গাছের পাতাও নড়ে না? জেনেশুনে এমন আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার বুদ্ধি কেন দিয়েছিলেন?

আমি তো কখনোই মরে গিয়ে হিরো হওয়ার স্বপ্ন দেখিনি! কেবল স্বপ্ন দেখেছি সেই সমাজের যে সমাজ মানুষের কথায় শেকল পরাবে না! এজন্য আত্মহত্যা করতে হবে?

ওই একটা লাশ পেলে বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থা ভালো হয়ে যাবে?

সত্যি কথা বলতে কী, ভীষণ হতাশ হয়েছিলাম তখন। তাসনীম সাংবাদিক, সাহসী সাংবাদিক হিসেবে আমি তাঁকে সম্মান করি। কিন্তু তিনি খুব ভালো করে জানেন, ওখানে আমার কিছুই নেই। যে দেশের স্বাধীন বিচারব্যবস্থা দখল হয়ে গেছে, সেখানে বিচার আশা করার মতো নির্বুদ্ধিতা আর কী হতে পারে?

স্বার্থ ছাড়া ভিক্টিমের জায়গা থেকে দুনিয়া দেখা কবে শিখব আমরা? কবে জানব– একজন মানুষের আত্মত্যাগের চেয়ে জরুরি হলো ত্যাগ না করে বিপ্লবটা জারি রাখা?

আমি বারবারই বলি– যেকোনো পুরুষতান্ত্রিক সমাজের জাতীয় পতাকার নাম ভার্জিনিটি। আদালতের প্রতীক তুলাদণ্ডের প্রতিকৃতি না রেখে সেখানে রাখতে বলতে ইচ্ছে করে মেয়েদের ভ্যাজাইনার ওপর হাইমেন ওরফে সতিচ্ছেদ নামক পর্দার ছবি। কারণ আমি জেনেছি দেশ মূলত সেই হাইমেন নামের পর্দা যার বাজারদর ঠিক করে ওই দেশ যে সন্ত্রাসীদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাবলে মাথায় তুলে রাখে। তাদের কথাই আইন।

আর বাংলাদেশে যেকোনো ক্ষেত্রেই একটা অভূতপূর্ব চর্চা আছে, সেই চর্চার নাম– সামাজিকভাবে বেশ্যাকরণ। কোনো মেয়ের গায়ের কাপড় সমাজের মনমতো না হলেই সমাজ সাফ জানিয়ে দিতে পারে– ও একটা বেশ্যা।

কিছুদিন আগেই দেখলাম বাসের মধ্যে এক মেয়ের টিশার্ট পরা নিয়ে হেনস্থা করেছে এক নারী। আরেকবার দেখলাম নরসিংদীর রেলস্টেশনে এক মেয়েকে কেবল স্লিভলেস টপ আর জিন্স পরায় হেনস্থা করেছে বোরখা পরা এক নারী! বাংলাদেশের উচ্চ আদালতের দুই বিচারক আবার এতে বলেছে– সভ্য সমাজে কি কেউ এমন পোশাক পরে? অর্থাৎ বাংলাদেশের আদালত মূলত ওই বখাটেদের পক্ষেই থাকল যারা রাস্তাঘাটে মেয়েদের টিজ করে, নোংরা কথা বলে!

তাই বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি বিকোয় মেয়েদের জীবনের কলঙ্ক। এই কলঙ্ক করতে হলে পুরুষ প্রভুদের কথার অবাধ্য হওয়াই যথেষ্ট।

যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন একবার খুব শখ হলো বাণিজ্য মেলায় যাই, গেলামও আমার বন্ধুর সাথে। কিন্তু ফেরার পথে বাসের মধ্যে ঘটল এক জঘন্য ঘটনা। তিল পরিমাণ ঠাঁই নেই, কিন্তু আবিষ্কার করলাম কে যেন আমার জামার মধ্যে দিয়ে হাত দেওয়ার চেষ্টা করছে শরীরে! এমনই ভিড় বাসে যে ঘুরব সেই সুযোগও নেই। টানা দুই মিনিট ওই জঘন্য স্পর্শ সহ্য করার পরে যখন সামনের লোকটা নামল, ঘুরে প্রথমেই দিলাম এক চড়! জিজ্ঞেস করলাম– তুই আমার গায়ে হাত দিচ্ছিস কেন? লোকটা কি বলল জানেন?

বলেছিল– আপনি এমন পোশাক পরছেন কেন?

ও ধরেই নিয়েছে একটি মেয়ে শার্ট-প্যান্ট পরলে তার গায়ে হাত দেওয়ার অধিকার ওর আছে! ও নিশ্চিত, মেয়েটিই ওকে প্রলুব্ধ করেছে।

আমি যদিও বলেছিলাম– আমি ন্যাংটা হইয়ে ঘুরলেও তুই আমার গায়ে হাত দিবি না, তবুও দমে গিয়েছিলাম। সেই যাত্রায় বাসের এক বয়স্ক ভদ্রলোক এগিয়ে এসেছিলেন এই লোকটাকে তিরস্কার করতে।

কিন্তু এই বাস্তবতা সব জায়গায় সমান না। হাটে–বাজারে বাংলাদেশের অনেক জায়গায়ই মেয়েদের কাপড় আর চলাফেরা নিয়ে সামাজিকভাবে লজ্জা দেওয়ার কর্মসূচি চলে, ওই মেয়েদের পাবলিক শেমিং করা হয়, অনলাইনে ফেসবুক বা ইনস্টাগ্রামে যত্রতত্র যেকোনো মডেল আর নায়িকার শরীর নিয়ে বিশ্রী মন্তব্যে ভরে যায় কমেন্ট থ্রেড। অথচ যারা মন্তব্যগুলো করে তারা কিন্তু ওদের দেখতেই এসেছিল!

অবশ্য ওই হতচ্ছাড়া যৌনলিপ্সুকেই বা কী বলব?

আমার বড় ভাইয়ের সাবেক বউয়ের বোনের সেই ছেলে সম্পর্কে ছিল আমার মামা। সেই মামাটিই যখন হাতাতো আমায়, তখন আমিও কুঁকড়ে গিয়েছি! কতবার ঘেন্না লেগেছে নিজের শরীরের ওপর ওই জঘন্য স্পর্শ পড়ার পর, সে কথা কেমন করে ভুলি?

কেমন করে ভুলি বয়ঃসন্ধিকালে সেই জঘন্য লোকটির উদ্দেশ্যপ্রণোদিত শাসানো? যেখানে লোকটি আমাকে বলত— সে যে আমার গায়ে হাত দেয় সেই অভিযোগ আমার মা—বাবাকে জানালে কেউ বিশ্বাস করবে না!

কী দুঃসহ সব দিন গেছে!

এইসব সাহস কি আমার একদিনের? না, এ তো ক্ষোভের ফসল! যখন দেখেছিলাম ক্লাসের পড়া বুঝিয়ে দিতে আসা শিক্ষকটিও গায়ে হাত দিতে নিশপিশ করে! এ এমনই এক ব্যাধি যা নারী শরীর দেখলেই ভুলিয়ে দেয় সকল মানবিক আচরণকে! বেরিয়ে পড়ে পাশবিক এক কুৎসিত রূপ। এই রূপের সংস্কৃতি কি একদিনের?

এমনকি বাংলাদেশ থেকে পাড়ি জমাবার কিছুদিন আগেও, এই তো সেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকতেই দেখেছিলাম আমাদের অসুস্থ হয়ে পড়া এক বান্ধবীকে গায়ে হাত দিয়ে মলেস্ট করেছিল আমাদের মেয়েদের হলের এক দ্বাররক্ষক! ভেবেছিল অচেতন হয়ে গেছে! ফলে অ্যাম্বুলেন্সে তোলার ছুতোয় অসাড় হয়ে যাওয়া ওর শরীরে হাত দিয়েছিল ওই বিকৃতমনস্ক লোকটা! আমাদের সেই বান্ধবী যখন প্রতিবাদ জানাল সুস্থ হওয়ার পরে তখন দেখি ওরই নামে কুৎসা ছড়াচ্ছে ওই দ্বাররক্ষীর প্রিয়ভাজনরা, বলছে— ও একটা নষ্টা! এমনকি সেই দ্বাররক্ষীর স্ত্রী প্রায়ই আমার সেই বান্ধবীকে কল দিয়ে বলত— আমার স্বামী ভুল কইরা ফেলছে, মাফ কইরা দেন আফা! আবার একইসাথে সেই দ্বাররক্ষীর স্ত্রী বলেছিল— মেয়েটার (আমার বান্ধবীর) স্বভাব—চরিত্র ভালো না!

আহা, আমার সাধের সমাজ, সেই সমাজের নারী প্রতিনিধি!

যা-ই হোক, বারবার শুনানিতে উচ্চ আদালত থেকে নিম্ন, সবখানেই ঔপনিবেশিক সেই আচরণ! বাংলাদেশের আদালতেই দেখেছিলাম— রাষ্ট্রের চোখে অপরাধী আরেক অপরাধীর উকিল বিচারককে কেবল 'মি লর্ড' না ডাকায় শুনানি পিছিয়ে গেছে এক হপ্তা। আদালতে প্রথমবার যাওয়ার আগে জেনেছিলাম আদালতের বিচারক নাকি আমার গায়ের কাপড় দেখে আমার মূল্য নির্ধারণ করবে! আমার এক আত্মীয় বলেছিল, আমি যেন 'শালীন জমা পরি' অর্থাৎ 'হাতাকাটা পোশাক না পরে যাই'!

আমি বুঝেছিলাম বাংলাদেশের আদালত মূলত মধ্যযুগীয় বর্বর দাসীদের চায়। চায় ধর্ষণ করার রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা। মানসিকভাবে প্রতিনিয়ত ধর্ষিত হওয়ার কী-ই বা বাকি ছিল আমার? শারীরিক ধর্ষণের চেয়ে কমই বা কী ছিল যেখানে ধর্ষণ করতে ইচ্ছুকদের সাথে আমার পরিবার বাধ্য হয়েছিল সন্ধি করতে? অথবা 'আমার ভালোর জন্য' বলে আপোসে বাধ্য করতে?

ফলে বুঝে গিয়েছিলাম– এই আদালত, এই রাষ্ট্র, এই সমাজ এমনকি পরিবারও– কিছুই আমার না! এমনকি সেই মায়েরও না যে ধর্ষিত মেয়েকে কোলে করে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালতের সামনে অনশনে বসেছিল। সেই বাবারও না যে বিচার হবে না জেনে মনের দুঃখে পাথর হয়ে নিজের ধর্ষিতা মেয়ের সাথে স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করেছিল চলন্ত ট্রেনের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে!।

সেই সব গ্রাম্যনারীরও না যাদেরকে ধর্ষিত হওয়ার পর সামাজিক চাপে ধর্ষককে বিয়ে করতে বাধ্য করা হয়েছিল যেন ধর্ষকরা বিচার এড়িয়ে অসীম সময়ের জন্য ধর্ষণ করার বৈধ লাইসেন্স পেয়ে যায়।

পরবর্তী অসংখ্য শুনানি আর 'কেন লিখেছি' বলার সেই অপমান চোখে আঙুল দিয়ে এভাবেই বাংলাদেশের আদালতকে চিনিয়েছিল, বুঝিয়েছিল সমাজ ও রাষ্ট্র বলে যা চিনেছি ও পড়েছি তার সবই ভ্রম, মিথ্যা। একমাত্র সত্য হলো মানুষ হিসেবে ন্যায়ের পক্ষে আমার কেবল আমিই আছি– একা এবং অসহায়!

অথবা একা কিংবা নিজেই নিজের ঈশ্বর!

নির্বাসিত

তসলিমা নাসরিন ছাড়া নির্বাসিত শব্দের সাথে আমার পরিচয় ছিল না মোটেই। লেখক তসলিমা নাসরিন যখন দেশ ছেড়েছেন, তখন থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত নির্বাসিত বলতে বুঝতাম তাঁকেই। জানতাম দাউদ হায়দারের কথাও, যিনি এক কবিতা লেখার কারণে নির্বাসনে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। দুজনেরই এক অপরাধ, ধর্মের অবমাননা। ভাবতাম– এ কেমন ধর্ম, যাকে এত সহজেই অবমাননা করা যায়? এ কেমন ঈশ্বরের দল, যারা নিজেদের রক্ষা করতে জানে না কথার চাবুক থেকে?

তবে সবদিক থেকেই তসলিমা নাসরিন ছিলেন মিডিয়ার আলোয়, সম্ভবত নারী বলে। পরবর্তীতে আমি তাঁকে নিয়ে লিখেছি, তাঁকে দেশে ফিরতে দেওয়ার আবেদন করেছি। তার দ্বিচারিতা, ইসলামোফোবিয়া, পক্ষপাত নিয়ে সমালোচনাও করেছি। তিনি আমার ওপর রেগেছেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্লক করেছেন। কিন্তু নির্বাসন বলতে তাঁকেই বুঝতাম। জানতাম তার মাথার দাম ঘোষণা করেছিল মোল্লারা, কেবল তিনি বলেছিলেন– ধর্মগুলো পুরুষদের লেখা, সৃষ্টিকর্তা একজন পুরুষ! কিন্তু কেউ কি সৃষ্টিকর্তাকে আজতক দেখেছে? তবুও সৃষ্টিকর্তার নাম শুনেই বুকের রক্তে জিহাদের জয়গান ওঠে যাদের, তাদের ভয় পাওয়া কি অমূলক? আজও যখন ইউরোপে একটি বই প্রকাশিত না হওয়ায়ও আমি একটি বক্তৃতা দিতে গিয়েছি, তখনও আমাদের আবেদন করতে হয়েছে নিরাপত্তার। সেও কি কম?

আমি যখন এই বই লেখার কাজ শেষ করব করব করছি তখনও ইরানে চলছে বিক্ষোভ, তারও কিছুদিন আগে লেখক সালমান রুশদিকে প্রকাশ্যে স্টেজের ওপর কোপানোর চেষ্টা করে গ্রেপ্তার হয়েছে এক যুবক। লেখক সালমান রুশদীর বিরুদ্ধে অভিযোগও ঘুরেফিরে এক– ধর্ম অবমাননা। অথচ সালমান রুশদী লিখেছেন এক নিরীহ বই। প্রায় ত্রিশ বছর আগে তিনি লিখেছেন এই বই– স্যাটানিক ভার্সেস। আমি নিশ্চিত জানি যারা সালমান রুশদির বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়েছে, ইরানের যে ধর্মান্ধ সরকার তার মাথার

দাম ঘোষণা করেছে, ওরাও কেউ এই উপন্যাসটি পড়েনি। যদি পড়ত তবে দেখতে পেত একটা নিরেট উপন্যাস যেখানে এক কল্পিত ধর্ম আর তার ঈশ্বর ও অনুসারীদের নিয়ে গল্প ফাঁদা যায়! সেই গল্প হয়ে উঠতে পারে এক তেজদীপ্ত সাহিত্য খণ্ড! কিন্তু ধর্মান্ধতার চশমায় সবই বুঝি ধর্মের অবমাননা!

এমনকি এই মুহূর্তে ইরানে যে বিক্ষোভ চলছে, সেই বিক্ষোভের জন্যও যে কারণে সেটাও ধর্ম অবমাননা, সেই পুরাতন ইসলাম অবমাননা!

ঘটনাটা ব্যাখ্যা করা যাক। ইরানের পশ্চিমাঞ্চলে থাকত ২২ বছরের সদ্য যৌবনে পা রাখা একটা মেয়ে, মেয়েটার নাম মাসা আমিনি। ইরানের পশ্চিম থেকে রাজধানী তেহরানে এসেছিল সে ঘুরতে এক আত্মীয়ের বাসায়। সেটাই কাল হয়েছিল তার। পোশাক ঠিক নেই, মাথায় দেওয়া হিজাবের ফাঁকে একগুচ্ছ চুল দেখা গেছে অজুহাতে ইরানের ধর্মরক্ষাকারী পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়েছিল তাকে। মাসার ছোট ভাইটি হাতজোড় করেছিল পুলিশের কাছে, বলেছিল– আমরা তেহরানে থাকি না। তেমন কাউকে চিনিও না। আমার বড় বোনকে ছেড়ে দেন আপনারা। ধর্ম রক্ষাকারী নীতিপুলিশ তার কথায় কর্ণপাত করেনি। ছোট ভাইটিকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে মাসাকে তুলেছিল পুলিশ ভ্যানে। সেখান থেকে নিয়ে যায় এডুকেশন অ্যাডভাইস সেন্টারে।

এই এডুকেশন মূলত পিটিয়ে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়ার এডুকেশন! ফলে সেখানেও মাসাকে পিটিয়েছিল তারা। মারটা এতই নির্মম ছিল যে মাসা কোমায় চলে যায়, হাসপাতালে নেওয়া হয় তাকে। এরপর সে মারা যায়। তখন ইরানের কথিত ওইসব ধর্মরক্ষকরা বলে, মাসা মারা গেছে হার্ট অ্যাটাকে! কিন্তু অন্যদিকে মাসার পরিবার জানায় হার্টের সমস্যাই ছিল না এই মেয়েটার। মূলত তাদের মেয়েকে মেরে ফেলেছে ইরানের পুলিশ। শুরু হয় একটানা বিক্ষোভ! নারীদের স্বাধীনতার জন্য বিক্ষোভ!

যদিও হিজাব নিয়ে কড়াকড়ি আর এর জন্য নির্মম শাস্তি এই প্রথম নয় ইরানে। যখন বাংলাদেশে ছিলাম, আমার নামে মামলা চলছিল তখনও দেখেছি প্যারিসে আশ্রয় পেয়েছিলেন নারগিস সতুদেহ। হিজাবের বাধ্যবাধকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলায় ইরানের শরিয়া কোর্ট তাকে তেত্রিশ বছরের জেল আর একশো আটচল্লিশটা দোররা মারার নির্দেশ দেয়! নাসরিন হয়ে ওঠেন কথিত দেশের শত্রু!

তবে ইতিহাস জানাটা গুরুত্বপূর্ণ।

ইতিহাস বলে– ১৯৭৯ সালে ইরানে যে বিপ্লব হয়েছিল সেই বিপ্লব থেকেই মেয়েদের পোশাকের ওপর কড়াকড়ি নির্দেশিত হয়। শুরু থেকে

বলতে গেলে বলতে হয় পাহলোভী রাজবংশের কথা। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রেজা শাহ পাহলভী. ১৯২৫ সালে তিনি এই রাজবংশের সূচনা করেন। মূলত তিনি ছিলেন পার্সিয়ান কসাক ব্রিগেডের এক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল। রেজা শাহ টানা ক্ষমতায় থাকেন ১৯৪১ সাল পর্যন্ত। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মিত্রবাহিনী তাকে ক্ষমতা থেকে সরালে সিংহাসনে বসেন তার ছেলে মোহাম্মদ রেজা শাহ। এদিকে ইরানের রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়। সেই আন্দোলনে বাম, ডান, মধ্যম সকল পন্থিরাই অংশ নেয়। শুরু হয় রাজতন্ত্র সরাবার গণ আন্দোলন। এদিকে আমেরিকান মদদের চক্করে পড়া রাজবংশের কান্ডারি রেজা শাহ্ একের পর এক প্রধানমন্ত্রী বদলাতে থাকেন। কিন্তু আন্দোলন নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না। সরকার আর্মি প্রশাসনের কর্মকর্তারা শাহের পতন টের পেয়ে পালাতে থাকে এবং অবশেষে ১৯৭৯ সালের জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি তিনি বাধ্য হয়ে নিজেও নির্বাসনে চলে যান। এই নির্বাসনের সাথে সাথেই বীরবেশে ফ্রান্স থেকে ফিরে যান আয়াতুল্লাহ খমেনি! ইরানে শুরু হয় এক নতুন সময়।

পাহলভীদের ওপর সাধারণ মানুষের রাগের কারণ এই যে– ইরানের রক্ষণশীল সংস্কৃতিকে জোর করে বদলাটে চাওয়া আর সেইসাথে আমেরিকার মদদ, দুইয়ের সাথে যুক্ত হয়েছিল রাষ্ট্রীয় দুর্নীতি। এই দুর্নীতিতে জর্জরিত দেশের মানুষ এমনই বিরক্ত হয়েছিল যে সকল রাগ গিয়ে পড়েছিল শাহ বংশের লোকদের প্রতিটি কাজকর্মের ঘাড়ে। আর সেটিরই সুযোগ নিয়েছিলেন খোমেনি।

এদিকে ইরানের শাহ ক্ষমতায় থেকে গেলেও সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ ছিল শাহের নেতৃত্বের আর্মির হাতে, সারা শহর কার্ফিউ। কিন্তু খোমেনি জনগণকে বীরের মতো নির্দেশ দেন এই কার্ফিউ–এর মধ্যেও আন্দোলন জারি রাখতে। তারা সেই নির্দেশে বাড়ির ছাদ থেকে 'আল্লাহু আকবর' শ্লোগান দিতে। আর্মি তখনও বশ মানেনি খোমেনির। তখনও তারা বিদ্রোহ দমনের তালেই ছিল। কিন্তু ফেব্রুয়ারি মাসে আর্মিও বশ্যতা মেনে নেয়, খোমেনি মেহেদি বাজারগানকে প্রধানমন্ত্রী করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করেন। ইরানের রাস্তায় খোমেনির সমর্থক ইসলামি কমিটির সদস্যদের দেখা যেতে থাকে, গোয়েন্দা বাহিনীর সদস্য এর আগের রাজতন্ত্রের শাহের অনুগত বা আনুগত্যর লেশ পাওয়া প্রতিটি লোককে জেলে ভরা হয় অথবা মারা হয়। ইরানে শুরু হয় ইসলামের বিপ্লবের জয়ধ্বনি!

খোমেনির প্রত্যাবর্তনের পর ইরান নিজেকে ইসলামি প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করল, নাচ-গান, সিনেমা সহ সকল সংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, মেক-আপ,

নেইলপলিশ, পারফিউম, মদ থেকে শুরু করে ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম সবকিছুকে নিষিদ্ধ করা হলো। এগুলো না মানলে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হলো। আমার প্রিয় প্রবাসী লেখক ফরিদ আহমেদের কাছ থেকে জেনেছিলাম 'প্রিজনার অফ তেহরান' নামের বইটির কথা। খোমেনি ফেরার পর ইরানের অবস্থা জানতে মারিনা নিমাত নামের একজন প্রত্যক্ষদর্শীর লেখা এই বই পড়ে আমি চোখের পানি আটকে রাখতে পারিনি। মারিনা নিজে মার খেয়েছিলেন হঠাৎ করে আরোপিত ধর্মীয় আইন আর বিধান মেনে না নেওয়ায়, ধর্ষিত হয়েছিলেন জেলের মধ্যে, পাড়ি জমিয়েছিলেন কানাডায়– মূলত এই এক টুকরো কাপড়ের জন্য!

যা-ই হোক, যেহেতু মেয়েদের মাথার চুল দেখানোর জন্য ইরানের ধর্মরক্ষা পুলিশ মাসা আমিনিকে মেরে ফেলেছে। ফলে এতদিনের ধর্মের নামে মেয়েদের ওপর অত্যাচারের ক্ষোভের আগুন দাউদাউ করে জ্বলে উঠেছে ইরানে। ইরানের এই আন্দোলনকে সমর্থন দিতে প্রকাশ্যে চুল কেটেছেন প্যারিসের মেয়র, ইউরোপীয় পার্লামেন্টের প্রতিনিধিরা। অথচ কয়েক দশক আগে এই ফ্রান্সই যে খোমেনিকে আশ্রয় দিয়েছিল, সেটির জন্য ইরানিরা আজও কম দুষছে না ফ্রান্সকে। যে ধর্মীয় আইনকে দুর্নীতি সরাতে ওরা মেনেছিল, আজ সেই আইনই সিন্দাবাদের ভূতের মতো চেপে বসায় সেই একই ইরানের ভেতর চলছে তুমুল বিক্ষোভ। আমি নিজে গিয়ে আমার আর্টিস্ট রেসিডেন্সির ইরানি প্রগতিশীল বন্ধুদের সমর্থন দিয়ে এসেছি, জোরে জোরে ফ্রেঞ্চ আর পার্সিতে বলেছি– ফেম, ভি, লিবার্তে! জিন, জীয়ান, আজাদি! যার মানে হলো– নারী জীবন, স্বাধীনতা!

আজ স্লোগান দিতে দিতে আমার ভয় হয়– আমরা সম্ভবত বাংলাদেশে ইরানের পথেই আছি। ইরানের শাহের মতোই আসন গেঁড়ে বসে আছে এক ক্ষমতার পাতে তেল দেওয়া ব্যবস্থা আর হর্তাকর্তারা। ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে সন্ধি হয়েছে মৌলবাদী দলটির সাথে, হেফাজতে ইসলামি নামের শরিয়া চাওয়া দলটি শেখ হাসিনাকে ঘোষণা করেছে কাওমি জননী!

অথচ আমরা জানি ধর্মান্ধতা পুঁজি করা দলটি যদি কখনো সুযোগ পায়, তবে প্রথমেই আয়াতুল্লাহ খোমেনি সেজে বসতে তাদের সময় লাগবে না। কিন্তু আশার কথা হলো বাংলাদেশের ধর্মের সৈন্যরা নিজেরাও সামগ্রিক দুর্নীতির শিকার। ইরানের মৌলবাদী শতকরা ১০০ ভাগ মৌলবাদী, কিন্তু বাঙালি মৌলবাদী শতকরা ৮০ ভাগ মৌলবাদী, বাকি ২০ ভাগ ভণ্ড। দেখা যাবে সে মেয়েদের স্বাধীনতা না পাওয়ার ব্যাপারে কট্টর, মেয়েদের যেন সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা হয় সেই ব্যাপারে কঠোর, মেয়েদের হিজাব পরাতে বাধ্য করার

ব্যাপারে একমত কিন্তু সে চুরি করলে হাত কাটা যাওয়ার মতো শরিয়া আইনের সমর্থন দেবে না নিজের স্বার্থেই! না হলে যদি নিজের হাতই যায়?

মূল ক্ষমতার কর্তাব্যক্তিরা সম্ভবত একথা জানেন। আর জানেন বলেই ক্ষমতার রাজনীতি বলে বেছেবেছে তার স্বার্থরক্ষাকারীদেরই বসানো হয়েছে সবখানে। মৌলবাদের ঝান্ডাধারীদের বশে রাখতে তাদের ওই ২০ ভাগ তত্ত্বমিই যথেষ্ট। ফলে যে বা যারাই ধর্মীয় বিপ্লব দেখানোর চেষ্টা করে, এই সিস্টেম তাকে আটকে ফেলে নানান ছুতোয়। তবে যে ব্যবস্থা বিচারব্যবস্থা ধ্বংস করা বিষাক্ত সাপদের পেলেপুষে রাখে, জানা কথা সেই সাপেরা একদিন সেই ব্যবস্থাকেই ছোবল দেবে। সমস্যা হলো ছোবলটা খাবে তারাও যারা সংস্কৃতি আর প্রগতির কথা বলতেন আর অন্যদিক দিয়ে নিজের আখেরও গোছাতেন। অবশ্য কতই বা হবে তাদের সংখ্যা? লেখক, শিল্পীরা সব দেশেই এবং সব সমাজেই সংখ্যালঘু। আবার সব লেখকই যে ক্ষমতার রাজনীতির বিপক্ষে– তাও নয়, অনেকেই আছেন ক্ষমতার পক্ষেই তোষামোদি করছেন, করে ক্ষমতাকেন্দ্রিক বিশ্বাসভাজনদের মতো হয়ে হাতিয়ে নিচ্ছেন বাড়ি, গাড়ি আর টাকা। কারণ তারা জেনে গেছেন আদর্শের কথা বলে হাততালি মিলতে পারে, কিন্তু বেঁচে থাকার রসদ মেলে না! বেঁচে থাকার রসদ মেলাতে যদি আদর্শ বিক্রি করা যায় তবে ক্ষতি কী?

অবশ্য নিবিড়ভাবে এই ক্ষমতার গতি–প্রকৃতি নির্ধারণ করা ছাড়াও আমার জীবনে পুরুষতান্ত্রিক নারীর সংখ্যায় কম নয়। এদিকে আমার জীবনে দেখা প্রথম পুরুষতান্ত্রিক নারী আমার দেশের নারী প্রধানমন্ত্রীরা নয়, নয় এর কথা ওর কানে দেওয়া পাশের বাসার কর্মহীনা, বরং আমার বড় ভাইয়ের সাবেক বউ যার নাম ছিল দীপালী। দেশ থেকে ফেরার আগেও তার অদ্ভুত কীর্তির কারণেই দেখেছি কেমন করে কেবল সম্পত্তির লোভে নিজের হাজব্যান্ডকে মিথ্যা বলে তুলে নিয়ে যাওয়া যায় মাদক নিরাময়ের জন্য বানানো আশ্রমে, যেন সঙ্গীকে মাদকসেবী প্রমাণ করে সকল সম্পত্তি হাতিয়ে নেওয়া যায়। আমি নিজে গিয়ে সেই রিহ্যাব থেকে উদ্ধার করেছি আমার ভাইকে। জানার চেষ্টা করেছি এই জঘন্য কর্মটি সে কেবলই সম্পত্তির লোভে করেছিল কি না! যখন প্রমাণ পেয়েছি, তখন বুঝেছি– ক্ষমতার অপপ্রয়োগই মূলত সমস্যা, সেই ক্ষমতা যার হাতেই থাকুক না কেন!

আর এই ক্ষমতার তারতম্যের সমস্যা যদ্দিন না ফুরাচ্ছে তদ্দিন আমরা পৃথিবীর যেকোনো বালুকাবেলায় ভেসে আসা শামুক–ঝিনুকের সাথে সাথে আয়লান কুর্দির মতো ছোট্ট শিশুর লাশ দেখব পড়ে থাকতে, অনেকে বাধ্য

হবো সত্য কথা লেখায় প্রাণের মায়ায় দেশ ছাড়তে, আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে, বিপ্লব করতে করতে মারা যেতে!

কারণ এখনও পর্যন্ত আমরা যে দুনিয়ায় বাস করছি সেই দুনিয়ায় মানুষরা সবাই তাদের জায়গায় নির্বাসিতই। যে দুনিয়ায় কথা বলার জন্য নির্বাসন দেওয়া যায়, সেই দুনিয়ায় কোন মানুষটা নির্বাসনের বাইরে?

আমি জানি না। শুধু আজকাল এসব ভাবলে মাথা ভারী ভারী লাগে। কেমন এক অদ্ভুত শূন্যতা আমাকে গ্রাস করে। আমি জানি না সেই শূন্যতার শেষ কোথায়। কেবল পৃথিবীর বিপন্ন প্রজাতির উদ্ভিদটির মতো আমার নিজের সমগ্র অস্তিত্ব নিয়ে টিকে থাকতে ইচ্ছে করে। নিজের কানে কানে মন্ত্রণা দেওয়ার মতো নিজেকে ফিলিস্তিনের প্রধান কবি মাহমুদ দারবিশের মতো বলতে ইচ্ছা করে–

যুদ্ধ শেষ হবে
নেতারা হাত মেলাবে
বৃদ্ধারা লিখতে থাকবে তাদের শহিদ হওয়া পুত্রদের জন্য
মেয়েটা তার প্রিয়তম সঙ্গীর জন্য অপেক্ষা করবে
এবং বাচ্চারা অপেক্ষা করবে তাদের হিরো হওয়া বাবার জন্য
আমি জানি না কে আমাদের জন্মভূমি বিক্রি করেছে
কিন্তু আমি জানি কে দাম মিটাচ্ছে!

(The war will end
The leaders will shake hands
The old woman will keep writing
For her martyred son
That girl will wait for her beloved husband
And those children will wait
For their heroic father
I don't know who sold our homeland
But I know, who paid the price!)

মা

মাঝেমধ্যে নিজেকে শেকড়শুদ্ধ তুলে আনা গাছ বলে মনে হয়। মনে হয় দূরদেশে জন্মেছিলাম আমি, কিন্তু আমাকে কেউ তুলে এনেছে আর পেলেপুষে বড় করছে ভিনদেশের মাটিতে। এসব কথা তখনই মনে পড়ে যখন সেই নারীকে মনে করি, যিনি কি না খুব কম বয়সে নিজের অজান্তেই বুনে দিয়েছিলেন এক অদ্ভুত স্বপ্ন! সেই স্বপ্ন বেড়ে বেড়ে মহিরুহ হয়েছে তারই প্রেরণায়! সেই প্রেরণা ঘরকে করেছে পর, দূরকে করেছে নিকট আর মনকে করেছে স্মৃতির জাদুঘর।

স্মৃতির জাদুঘরে আসন পেতে বসে ভাবি, কখনো কেউ যদি জিজ্ঞেস করত– বিদেশ জীবনে আপনি সবচেয়ে বেশি মিস করেন কাকে? আমি বলতাম– আমার মা'কে!

এমন প্রথম হয়েছিল যখন ডি ওরসে মিউজিয়ামে হুইসলারের 'মা' নামের ক্যানভাসটা দেখেছিলাম তখন। কেমন অকারণ চিনচিন করছিল বুকের মধ্যে! ছবিটার ইতিহাস ছিল করুণ মায়াবী! হুইসলার বসে ছিলেন মডেলের অপেক্ষায়, কিন্তু মডেল না আসায় মা'কে আঁকেন তিনি। আর কালক্রমে বিখ্যাত হয়ে যায় সেই ছবি। জগতে যে কয়টা 'মা' শিরোনামের শিল্পকর্ম আছে, সেগুলোর একটা হয়ে ওঠে সেটা। আমি জানি না, ওর টানেই কি না আজকাল ডি ওরসে থেকে হেঁটে হেঁটে সেইনের পাড়ে আসি, এসে মধুসূদন দত্তের মতো বলি– "জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে...!" খুব পাগলামি হয় সেটা?

হোকনা! এ তো একক পাগলামি, সমগ্র মহাবিশ্বের কিচ্ছু যায়–আসে না যখন সে জানবে পৃথিবী নামের গ্রহের ফ্রান্স নামের এক দেশের প্যারিস নামের এক শহরের সেইন নামের এক নদীর পাড়ে ভারতবর্ষের তাড়া খাওয়া

দেশ পালানো এক লেখক নিজের দির্ঘশ্বাসটুকু ভাগাভাগি করে নিয়েছিল এই নদীর বাতাসে! এ তার একার সংগ্রাম, একার নস্টালজিয়া, একার দুঃখ ও ক্ষণিকের সুখ!

নদীর পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নোতরদাম গির্জার পাশে আসি। ইতিহাসের পাতার ঝাঁপি খুলে বসে সাথে সাথেই। মন বলে– এই চত্বরেই শপথ নিয়েছিলেন নেপোলিয়ন। আমার মা প্রায়ই মুখস্থ করাতেন তাঁর সেই বিখ্যাত বাণী– "আমাকে একজন শিক্ষিত মা দাও , আমি তাদের একটি শিক্ষিত জাতি দেব!"

এসব ভাবতে ভাবতে আবারও নস্টালজিক হয়ে যাই। প্রায়ই ভাবতে ইচ্ছা করে আমার মা যদি প্যারিসে আসতেন, কেমন আনন্দ পেতেন তিনি?

আমি জানি না। কিন্তু আমি খুব ভালো করে জানি আমার মতো এই যে মিউজিয়ামগুলো বিনাটাকায় দেখার সুযোগ, এই সুযোগটি পেতে পারতেন তিনি একটা সার্টিফিকেট থাকলেই। আহা, সার্টিফিকেট! কী দাম তার! অথচ কোন এককালে আইনস্টাইন বলেছিলেন– "শিক্ষা হলো তাই, যা সকল পড়াশোনা ভুলে গেলেও মানুষের মধ্যে রয়ে যায়!" আমার মা কি তেমনই নন?

১৯৭১ সালে আমার মা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দেখেছিলেন। রূপকথা শোনার বয়সে আমি শুনেছি যুদ্ধের গল্প, শুনেছি সেই শিশুদের কথা– যারা বুঝত না ওই যুদ্ধ কবে ফুরাবে! সে এক মর্মান্তিক বয়ান। আমার ছোট্ট মায়ের জীবনটি বদলে গিয়েছিল সেই যুদ্ধের বছর। স্বজনদের মরতে দেখেছিলেন তিনি, দেখেছিলেন কী সহজেই ঘর ছেড়ে দিতে হয়, দেখেছিলেন সেই বাস্তবতা যেখানে পকেটে টাকা থাকলেও খাবার জোটে না! হেঁটেছিলেন প্রাণ বাঁচাতে, শহর থেকে গ্রামের নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে! গণহত্যার মধ্যে জন্মানোর সময় সেই বিভীষিকা শিশু মনকেও ছাড়ে না। ফলে আমি অবাক হয়ে দেখেছিলাম– যুদ্ধ মানে এক শিশুর কাছে অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তির জন্য সংগ্রাম নয়, বরং নিজের শৈশব চিরতরে হারিয়ে ফেলা– লাশের পাহাড়, না ফেরা স্বজন কিংবা স্কুলের সহপাঠী হারানোর বেদনা!

সেই হারিয়ে ফেলার বেদনা কী তীব্র তা বুঝেছিলাম যখন বই পড়া শিখলাম। মাসশেষে আমার বাবার টাকার মুখাপেক্ষী গরিব মা যখন একটা বইয়ের জন্য আমার আকুতি দেখে বই কিনে দিতেন আর এরিক মারিয়া রেমার্কের 'থ্রি কমরেডস', 'দ্যা রোডব্যাক' পড়ে যখন আরেক শতাব্দীর যুদ্ধে

যাওয়া দেশপ্রেমের বড়ি গেলানো সৈনিকদের দেখতাম, যাদের কাছ থেকে যাদের যৌবনের চমৎকার সময়টা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল।

প্রায়ই ভাবি— কী হতো এমন না হলে?

তার পরক্ষণেই মনে পড়ে— এই যে আমি যেমন, তেমনটা দেখে ক্লান্ত আর হতাশ হচ্ছি, এটাই তো ওরা চায়! যারা জানে, বেশিরভাগ মেয়েই যুদ্ধ করতে চায় না, কারণ ওদের যে যুদ্ধটা করতে হবে বা যুদ্ধটা করা প্রয়োজন, সেই বোধটাই মেরে ফেলা হয়! শেখানো হয় সেই জীবন, যে জীবন স্বাধীন মানুষ হিসেবে বেছে নিতে দিলে হয়তো ও নিতই না। এই কারণেই কৃতজ্ঞতায় চোখে পানি চলে আসে আমার মায়ের প্রতি!

তবে ভয়ও করে। ভয়ের কারণ শীতকালের ডিপ্রেশন, একাকিত্ব— এই নতুন দেশে একলা একলা মরে যাওয়ার ভয়! এই ভয়ের জন্ম হয়েছিল সেইন নদীর সেই মেয়েটার কথা জেনে। জেনেছিলাম অবশ্য বাংলাদেশে বসেই, বরেন চক্রবর্তীর ভ্রমণের বই থেকে।

প্যারিসের সেইন নদীতে সে ভেসে এসেছিল। অদ্ভুত হলো তার গায়ে কোনো আঘাতের চিহ্ন ছিল না, চিহ্ন ছিল না বেদনারও। নদীতে ভেসে আসা বেওয়ারিশ এই লাশটি ছিল মর্গে। যে ডাক্তার প্রথম দেখেছিলেন এই লাশ, তিনি বিহ্বল হয়ে গিয়েছিলেন কারণ তার মুখে ঝুলে আছে এক অপূর্ব হাসি! সেই হাসিকে ধরে রাখতে সেই ডাক্তার চুপিচুপি ডেথমাস্ক বানিয়েছিলেন, কিন্তু কপাল খারাপ হওয়ায় ধরা পড়েছিলেন সহকর্মীদের হাতে। কারোর লাশ থেকে মুখোশ বানাতে হলে সরকারি অনুমোদন লাগে, কিন্তু যে লাশের পরিচয় কেউ জানে না, তার লাশের মুখোশ বানানার অনুমতি কে দেবে?

সেই ডাক্তারের সাজা হয়েছিল। তিনি পালিয়েছিলেন প্যারিস থেকে। কিন্তু এই খবর চাউর হলে শিল্প-সাহিত্যে এই মেয়ে এমনই জনপ্রিয় হলো যে তাকে নিয়ে গান লেখা হলো, উপন্যাস লেখা হলো। এমনকি পানিতে পড়া রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাস চালু করতে যে ডামি বানানো হতো তাও বানানো হলো এই মেয়ের মুখের অনুকরণে। বলা হতে লাগল— দুনিয়ার সবচেয়ে বেশি চুমু পড়া ঠোঁটের মেয়েটিও সে!

মাঝেমধ্যে মনে হয় অমন বিষণ্ন সুন্দর মৃত্যু হতে পারে আমার?

আমি জানি না। কিন্তু নিজের জীবন কেমন এক জলে ভাসা জীবন মনে হয়, যে জীবনে যে ঘর আমার না সেই ঘরের জন্য বুকের মধ্যে হাহাকার লাগে। যে জীবনে যে দেশ কখনো আমার ছিল না, সেই দেশের জন্য ব্যথায় দুমড়েমুচড়ে যেতে ইচ্ছে করে মাঝেমধ্যে!

অবশ্য এইসব কি আমি আগেই জানতাম না?

লেখার একটা দাম আছে তো! সেই দামের কারণেই আমার প্রিয় লেখকরা কেউই যে মাটিতে জন্মেছেন, সেই দেশের মাটিতে মরেননি। এরিক মারিয়া রেমার্ক মরেছেন সুইজারল্যান্ডে, সাদাত হাসান মান্টো মরেছেন পাকিস্তানে, হুমায়ুন আজাদ মরেছেন জার্মানিতে রহস্যময় অবস্থায়! আমার মৃত্যু কীভাবে লেখা হবে?

আমি জানি না। কিন্তু প্যারিসের দিকে তাকালে মনে পড়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ফরাসিরা এই নগরিকে বাঁচাতে হিটলারের কাছে আগেই হার মেনে নিয়েছিল, এমনকি পরে আমেরিকানরাও শত্রু গিজগিজে এই নগরীকে আহত করেনি! অথচ ফ্রাংকফুর্ট বেশি দূরে নয় প্যারিস থেকে, কিন্তু মিত্রবাহিনী বোমা মেরে উড়িয়ে দিয়েছিল ওই শহর! প্রিয়তম এই নগরিকে বাঁচাতে যুদ্ধ লাগার সময়ই অবশ্য ধূসর রঙে ঢেকে দেওয়া হয়েছিল যাতে আকাশ থেকে না চেনা যায় একে! দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ না দেখলেও আজকাল প্রায়ই প্যারিসের আকাশে বিকট শব্দে কদাচিৎ দেখি যুদ্ধবিমান, বাজারে গেলে বুঝি যুদ্ধ লেগেছে মূলত বাজারের তাকে! যুদ্ধ চলছে ইউক্রেনে, যুদ্ধ বাধিয়েছে রাশিয়া, ন্যাটোভুক্ত দেশগুলোরও কম ভূমিকা নেই, কিন্তু এই যুদ্ধে ইউরোপ জড়িয়ে পড়েছে নানানভাবে। ইউক্রেনে যা উৎপাদন হয় সেই ফসল আর ঘরে উঠবে না, সাধারণ মানুষ মরবে আর যারা মরেনি তারা সবকিছুর দাম দ্বিগুণ হওয়ায় বুঝে—সমঝে চলবে! সেই পুরনো বাংলা প্রবাদ মনে পড়ে— "রাজায় রাজায় যুদ্ধ বাধে, কিন্তু প্রাণ যায় উলু খাগড়ার!"

দেশ থেকে আসার সময়ওতো আমার এক যুদ্ধই গেছে। মানুষ বিদেশে গেলে সবাইকে জানায়। আমার এমনই কপাল যে জানানোর সুযোগই পাইনি!

যদি কেউ আরেকটা মামলা করে দেয়? বা যদি সহসাই ফিরছি না ভেবে সরকার এয়ারপোর্টের চৌহদ্দি পেরোতে না দেয়?

মানুষ নিশ্চিত মৃত্যু জেনে যখন সবকিছুর ওপর আগ্রহ হারিয়ে ফেলে, আমি তেমন সহসাই ফিরছি না জেনে গোপনে আমার সমস্ত রঙ ক্যানভাস সবকিছু বিলি করে দিয়ে এসেছিলাম। এতসব জিনিস কিনতে যে পরিশ্রম গেছে তার সিকিভাগও কম পরিশ্রমে আমি আমার সকল রঙ, সকল জামাকাপড় গোপনে ভাগ করে দিই নিজের কাছের লোকদের মধ্যে। দিয়ে শান্তি লাগে, মন খারাপও লাগে। সে এক অদ্ভুত আবেগ। যেন নিজেকেই নিজে বলছি— অধিকার ছাড়িয়া দিয়া অধিকার উদ্ধারের মতো প্রবঞ্চনা আর জগতে নেই! কিন্তু কী করব? এভাবেইতো দৃশ্যপট থেকে বিদায় নিতে হয়!

অবশ্য বিদায় নেওয়ার দায় পেরিয়েই বা কী পেলাম?

যুদ্ধ কি আমার পিছু ছাড়ল?

আজকাল দেখি হয়তোবা যুদ্ধের বাজার বুঝেই নেটফ্লিক্স একের পর এক যুদ্ধের সিনেমা আনছে। এমনকি বাড়ির জানালা থেকেও দেখতে পাই ইউক্রেনের এক দুঃখী আর্টিস্ট জানালায় টাঙিয়ে রেখেছে নিজের দেশের পতাকা! রু দ্য রিভলি ধরে সোজা হেঁটে গেলেও দেখি বড় বড় বিল্ডিংয়ের গায়ে এঁকে আর্টিস্টরা মুণ্ডুপাত করেছে পুতিনের, ইউক্রেন যুদ্ধের। এসব দেখে প্রায়ই মাকে বলতে ইচ্ছে করে– দেখে যাও মা, যুদ্ধের কবল থেকে আমরা কেউ রেহাই পেলাম না!

হাঁটতে হাঁটতে পায়ে ব্যথা হলে বসা যায় পথের ধারের এক রেস্তোরাঁয়। প্রথমদিকে কফির দাম শুনে চমকে উঠতাম। এখন আর উঠি না। বাংলাদেশের মুদ্রার সাথে ভুলেও গুণ করি না ইউরোর দাম। এক ইউরো সমান ১০০ টাকা দেশে প্রায়! এটা কোনো কথা? সাত ইউরোয় এক কাপ ভরা ধূমায়িত কফি নিয়েই প্রথমদিকে মনে হতো– সাতশো টাকা খরচ করছি এক কফি খেতে! তবে এখন আর মনে হয় না। এক কাপ কফি নিয়ে বসে থাকা যায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা। এদেশে খদ্দের তাড়িয়ে দেওয়ার নিয়ম নেই, এমনকি আশেপাশে এসে ওয়েটাররাও ঘুরঘুর করে না। রাস্তায় বাথরুম আছে, প্রতিটি রেস্তোরাঁয় বাথরুম আছে দেখে মনে পড়ে মায়ের কথা, বাথরুমে যাওয়া দুরূহ ভেবে কী ক্ষতিটাই না করেছেন তিনি নিজের।

এমনকি বাংলাদেশের গার্মেন্টসের মেয়েদেরও বাথরুমে যাওয়ার সুযোগ হয় না এই কারণে যে, বাথরুমে গেলে নাকি উৎপাদন কমে যাবে!

একবার রাজশাহীতে বসেই আমার এককালের প্রেমিক ইফতির সাথে বসে সিনেমা দেখেছিলাম– উডি এলেনের 'মিডনাইট ইন প্যারিস'। প্যারিসে আসার পর সেই সিনেমার নায়কের মতো বেরিয়ে পড়ি সহসাই। অনেক রেস্তোরাঁই খোলা থাকে রাত দুটো পর্যন্ত, কিছু রেস্তোরাঁ কখনো রাতে বন্ধ হতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না! আর্টিস্ট রেসিডেন্সির শুরুর দিকের আরেক বন্ধু টিমো থাকাকালে দল বেঁধে আমরা রাতভর ঘুরতাম প্রায়ই। আমাদের দেশের পাটিসাপটা পিঠার মতো ক্রেপ খেয়ে খুব তুচ্ছ রসিকতায় হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়তাম একে অন্যের গায়ে। পর্তুগিজ সোনিয়া উচ্চৈঃস্বরে গান জুড়ে দিত।

বিন্দুবিসর্গ না বুঝলে সেই সুর প্রায় জনমানবহীন রাস্তার এপার–ওপার গড়ি খেয়ে ফিরত। মায়ের মতোই আমার হারিয়ে ফেলা ঘরটিকে কতদিন

দেখি না ভেবে মন খারাপ হতো। এই অদ্ভুত ভাসমান বিবাহিত জীবনটিই বা কে কাটাচ্ছে বিদেশে– ভেবে উদাস হতাম।

কিন্তু আজকাল এই রাতজাগা মধ্যরাতের প্যারিস দেখতে দেখতে আফসোস হয় আমার মা দেখতে পেলেন না একটা শহরে মেয়ে হয়েও নির্দ্বিধায় হেঁটে বেড়ানো যায় ভয়ডর ছাড়াই!

আমি টের পাই, মানুষ আসলে বেশিকিছুর জন্য বাঁচে না। বাঁচে খুব সামান্যতেই। আগে স্বপ্ন দেখতাম মুক্তির, স্বাধীনভাবে লেখার। এখন স্বপ্ন দেখি এই শহরে মায়ের হাত ধরে ঘুরে বেড়ানোর। স্বপ্ন দেখি খুব মদ খেয়ে খুশিমনে ঘরের ভেতর মা অপেক্ষা করছে জেনে বাড়ি ফিরে কাপড় না বদলেই ঘুমানোর। আমার এই স্বপ্ন আমার বন্ধুরা টের পায় কি না জানি না। তবে এসব কথা শুনলে ওরা কেউ কেউ অবাক হয়, হয়তো ভাবে– এত তুচ্ছ স্বপ্ন দেখা যায় কেমন করে? কিন্তু ওরা জানে না, বিদেশের এই মা-বিহীন জীবনটিই আমাকে প্রেরণা দেয় সেসব করতে, যেসব করার সুযোগ আমার মা কখনোই পেলেন না! আর এভাবেই মা আমার আসেপাশেই থাকেন, তার না থাকাটা জুড়ে!

একটি চলমান ভোজসভা

ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরের গাঁজার বাসিন্দা তাকি। বাংলাদেশের রাজশাহী শহরের পদ্মা নদীর জল—বাতাস মেখে আসা এক মেয়ে আমি, গ্রামের বাড়ি সিরাজগঞ্জ জেলায়, জন্মেছি আরেক জেলা মাগুরায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের খাতিরে থাকতাম রাজধানী ঢাকায়। নিজেদের বাড়ি থেকে বহু বহু ক্রোশ দূরের এই আমাদের দেখা হয়ে গেল, প্যারিসে সারা পৃথিবীর শিল্পীদের বাসস্থান— সিটি ইন্টারন্যাশনাল দেজ আর্টে, বাংলা করলে— শিল্পের আন্তর্জাতিক শহরে! এ এক বিচিত্র ও অদ্ভুত যোগাযোগ।

ক্রমান্বয়ে পরিচয় হলো ভিভেকা, যার বাড়ি স্লোভাকিয়া আর থাকে অষ্ট্রিয়ায়, জার্মানির নিনা, ফ্রান্সের লুই, জার্মানির টিমো, ক্রোয়েশিয়ার নিভেস, আফগানিস্তানের ফাতিমা, রয়া, ইরানের আলী, ইতালির আলেসান্দ্রা, রিগা'র টিনাসহ দুনিয়ার তাবৎ দেশের শিল্পী, কিউরেটরদের সাথে। সবচেয়ে অবাক করা ব্যাপারটা ঘটল তাকির সাথে। কী এক বিশেষ কাজে রিসেপশনে গিয়েছি, এমন সময় দেখি তালগাছের মতো লম্বা এক ছেলে এসে বলছে— হ্যালো, তোমার নাম কী?

আমি তার বোঝার সুবিধার্থে কায়দা করে বললাম— প্রীটি!

সে বলল— প্রীটি নেম!

বাড়ি কোথায়?

—বাংলাদেশ!

—আমার বাড়ি প্যালেস্টাইনে। তোমার যদি সময় থাকে তাহলে আমার স্টুডিওতে এসে চা খেয়ে যেতে পারো!

মানুষ শিক্ষার জন্য চীনে যায়, আমি প্রবল উৎসাহে তাকির পিছে পিছে এসে আবিষ্কার করলাম, এই বিশাল আর্টিস্ট রেসিডেন্সিতে ভাগ্যের সুতো ধরে আমাদের ব্যবধান মাঝের দুইটা স্টুডিও!

গিয়ে দেখি হুলুস্থুল অবস্থা! অসংখ্য রাজনৈতিক ছবি সে এঁকে রেখেছে, ইজরায়েলি সেনারা বোমা ফেলছে, ক্যামেরা ভেঙে দিচ্ছে সাংবাদিকদের হাত থেকে নিয়ে, আগুনে বাড়িঘর পুড়ছে, লোকে প্রাণ নিয়ে পালাচ্ছে– এইসব। কথার শুরুতেই সে সাংবাদিকদের সম্পর্কে বলে– প্রত্যেক সাংবাদিকই কারোর না কারোর পেইড এজেন্ট, বুঝলে? আমি চোখ পাকিয়ে বললাম– পুঁজিবাদী দুনিয়ায় কে কার গোলাম তার লিস্টি করলে তুমি কাউকেই বিশ্বাস করতে পারবে না আর যাকে বিশ্বাস করতে পারবে, জানবে যে সেই বিশ্বাসই তার পুঁজি!

সে আমাকে বলল– খাঁটি কথা বলেছ!

খাঁটি কথা বলার পাশাপাশি কথায় কথায় তাঁকে আমি জানালাম– বাংলাদেশের পাসপোর্টে লেখা আছে, এই পাসপোর্ট সব দেশের জন্য প্রযোজ্য কেবল ইজরায়েল ছাড়া!

সে আনন্দে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠতেই তাঁকে জানালাম– কিন্তু সম্প্রতি বাংলাদেশ নিয়ে বের হওয়া আল জাজিরার বহুল আলোচিত ডকুমেন্টারি ফিল্ম 'অল দ্য প্রাইমমিনিস্টার্স ম্যান'–এ দেখা গেছে বাংলাদেশ গোপনে 'ইমজি ক্যাঁচার' (IMSI Catcher) নামের নজরদারির যন্ত্রপাতি কিনেছে আমাদের মতো সমালোচনা যারা করে তাদের ওপর নজরদারি করতে! তাকির মুখ দেখে মনে হলো কেউ ওর মুখে অমৃতের পর বিষ দিয়েছে!

তাঁকে সান্ত্বনা দিতে বললাম– পৃথিবীর প্রতিটি সভ্যতাই চরিত্রহীন, মন খারাপ করো না। সবকিছু তো আমাদের হাতে নেই!

সবকিছু আমাদের হাতে নেই– সান্ত্বনাটি কত কাজে লাগল জানি না। কারণ সেই মুহূর্তে তার মুখ দেখে আসলেই বোঝা গেল না সে কী ভাবছে।

বলে রাখা ভালো, নামে স্টুডিও হলেও আমাদের প্রতিটি স্টুডিওতেই আছে শোয়ার আলাদা স্থান, সুন্দর রান্নাঘর, বাথরুম আর স্টোর রুম, কোটের জন্য আলাদা হ্যাঙ্গার দেওয়া ক্লজিট। রান্নাঘরে রানার বাসনপত্র সবই আছে, আছে মাইক্রো ওভেন, ফ্রিজ। প্রশস্ত স্টুডিওতে আছে প্রয়োজনীয় আসবাব আর হিটিং সিস্টেম। বাংলাদেশে থাকতে যেহেতু আর্টিস্ট রেসিডেন্সি নামের কিছুর নামগন্ধ শুনিনি, তাই এই জীবন শুরুতেই আমার বেশ বিলাসবহুল ঠেকল। ইউরোপের বাড়িভাড়ার চেয়ে ভাড়াও নেহাত কম আর যেহেতু স্কলারশিপ পাই, সেহেতু সেটাও তেমন কিছু নয় আমার কাছে। চিরটাকাল ভাগ্যে অবিশ্বাসী আমি ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিলাম

মনে মনে। কারণ দেশের বন্ধুদের তুলনায় আমি স্বর্গে আছি। কিন্তু দিন কয়েক যেতে না যেতে খুব দ্রুতই এসবে অভ্যস্ত হয়ে উঠলাম।

অবশ্য যেদিন প্রথম এসেছিলাম, সেই ডিসেম্বর মাসের কনকনে ঠান্ডার রাতেও ভাগ্য আমার দিকে মুখ তুলে তাকাতে কমতি করেনি। ম্যাগুলন ক্যাথালা আর ইসাবেল ম্যালেজ নামের দুই মিষ্টি ফরাসি নারী ও ক্ষেত্র বিশেষে দেবী, আমাকে এই আর্টিস্ট রেসিডেন্সিতে মধ্যরাতে রেখে যাওয়ার পরে খুবই আনন্দ পেয়েছিলাম যখন সিকিউরিটিতে থাকা বিশালদেহী আফ্রো ফ্রেঞ্চ এক দৈত্য এসে গমগমে গলায় ভাঙা ইংরেজিতে অতি আন্তরিকতায় বলেছিল– মাদময়াজেল, কী খেতে চাও?

আমার তখন ভাতের জন্য পেটে চলছে ছুঁচোর কেত্তন। আমি তাকে বললাম– ভাত!

সে আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে বলল– চাইনিজ রেস্টুরেন্ট হলে চলবে?

আমি বললাম– অবশ্যই চলবে!

মাংস খেলে শুয়োর, গরু না মুরগি– এইসব শুনে সে ম্যাজিকের এত চলে গেল! এর ফাঁকে আমাকে দেওয়া এক বান্ডিল কাগজ থেকে আমি উদ্ধার করলাম ওয়াইফাই পাসওয়ার্ড। এরপর সোজা ইন্টারনেটে যুক্ত হতেই মা, ভাই আর প্রেমিক! আহা, দেশ থেকে এদ্দূর এসে কী যে স্বস্তি সেইসব স্বর শুনে!

দশ কি পনেরো মিনিট পরেই সেই বিশালদেহী আফ্রিকান মহাপুরুষ আট লিটার পানির আটটি বোতল, সেই বিখ্যাত চাইনিজ ভাত আর খয়েরি সসে ডোবানো ফালি করা গরুর মাংসের তরকারির বাক্স আমার হাতে দিয়ে শেষবারের মতো চাবি দিয়ে দরজা আটকে রাখার পরামর্শ দিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। যাওয়ার আগে গমগমে গলায় বলল– যদি পাশের ফ্ল্যাটের লোক রাতবিরাতে গান–বাজনা করে তখন কি করবে জানো?

– কী করব?

–আমাকে মানে রিসেপশানে কল দেবে।

–তারপর?

–ফোন করে আমি তাদের বলব গান থামাতে।

–ইয়ে, সেটা তো আমিই বলতে পারি...

– না পারো না। আমাকে বলবে। এই দায়িত্ব আমার। আর তাও যদি তারা না শোনে...

–তাহলে কী?

—তাহলে তাদের ইলেকট্রিসিটি বন্ধ করে দেব! অন্ধকারে গান-বাজনা পালিয়ে যাবে...

এই পর্যায়ে আমি হেসে ফেললাম। তাকে বললাম– যা বলার আমিই বলতে পারব।

সে শেষবারের মতো– লিটল উইমেন, জীবন খুবই অদ্ভুত জাতীয় কিছু একটা বলে বিদায় নিল। জীবনের অদ্ভুত অবস্থার সাথে এহেন উপায়ে গানবাজনা বন্ধ করার কী সম্পর্ক তা বুঝলাম না!

দরজা বন্ধ করে আমি সাথে সাথে খাবারের প্যাকেট খুললাম বিপুল উৎসাহে। কিন্তু আমার সকল স্বপ্ন ও ক্ষুধা চুকে গেল যখন দেখলাম এই চাইনিজ ভাত মূলত ক্যাতকেতে আঠালো চালের পিঠার মতো আধা সেদ্ধ ভাত, সয়া ও অন্যান্য সসের মিশ্রণে বিকট গন্ধের গরুর মাংসের পাতলা ফালি দেওয়া তরকারি, তিলের প্রলেপ দেওয়া এক ছোট্ট মিষ্টান্ন। আমার প্রচণ্ড খিদে মুহূর্তেই উবে গেল!

মনে মনে পণ করলাম, আগামীকাল শাকসবজি আর তরকারির দোকান খুঁজে না পাওয়াতক অভুক্ত থাকব।

দেশ থেকে নিয়ে আসা যক্ষের ধনের মতো নানান পদের মশলার কৌটা রান্নাঘরের তাকে সাজিয়ে, সাময়িক স্মৃতিচারণ করতে করতে প্রেমিকের সাথে কথা বলে ঘুমিয়ে গেলাম। ঘুম ভাঙল পরদিন তীব্র মাথাব্যথা আর ভেরোনিকের মেসেজের শব্দে!

দেশ থেকে আসার আগেই জেনেছি ভেরোনিক এই আর্টিস্ট রেসিডেন্সির ম্যানেজমেন্টের দায়িত্বে আছে। তার অসংখ্য কাজের একটা কাজ হলো আমাকে সবসময় সাহায্য করা। বাজারঘাট চেনানো, কোন রঙের ময়লার বিনে কি ধরনের ময়লা ফেলতে হয় সেইসব দেখানো। সেই শিক্ষার সুবাদে শিখলাম– সাদা বিনে কাচের বোতল, সবুজ বিনে পচনশীল খাবার আর হলুদ বিনে ফেলতে হবে কাগজ আর প্লাস্টিক।

দেশে থাকতে দেখেছি এক জায়গায় সব ফেলা হচ্ছে, লোকে রাস্তায় চিপসের প্যাকেট ফেলে দিব্যি নির্বিকারচিত্তে হেঁটে যাচ্ছে, ডাস্টবিন থেকে গন্ধ আসছে। কিন্তু এখানে দেখি রাস্তার মাঝে মাঝেই একেকটা ডাস্টবিন, কিছু ডাস্টবিনে জিনিস ফেলার নিয়ম পায়ের প্যাডেল চেপে, কোথাও গন্ধ নেই, ডাস্টবিনের বাইরে ময়লা নেই। সামান্য হকচকিয়ে গেলাম, কিন্তু কিছুদিন পরেই দেখলাম– এরপরও ফরাসিরা নাক উঁচু করে বলে, প্যারিস নাকি যথেষ্ট নোংরা ফ্রান্সের অন্যান্য জায়গাগুলোর চেয়ে! আমি মনে মনে বলি– বাপু, একবার বাংলাদেশে যাও, এরপর বোলো একথা তখন!

প্রাথমিক শিক্ষা হিসেবে ভেরোনিক আমাকে নিয়ে গেল মাছ-মাংস, ডিম সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের এক দোকানে। সেই দোকানে গিয়ে হকচকিয়ে গেলাম, আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় সুপারশপটি এর অর্ধেকও নয়! কিন্তু পরে অবশ্য ইউরোপের অন্যান্য কয়েকটি দেশ ঘুরে আমার শিক্ষা হয়েছে এমনকি ওই সুপারশপটিও তেমন বড় কিছু না! কিন্তু এই প্রথমদিন মহানন্দে বাজার করে নিয়ে আসার পরে আবিষ্কার করলাম— তেল, ডিম সব কিনে আনলেও যা আনতে ভুলে গিয়েছি সেই জিনিসটির নাম হলো— লবণ, বিশুদ্ধ বাংলায় নুন!

বাংলাদেশ থেকে নিয়ে আসা বিটলবণ দিয়ে রান্না করে আপাতত তৃপ্তি করে নিজের বানানো অখাদ্য খেলাম এবং দেশে থাকতে কী রানির হালে ছিলাম তা প্রথমবারের মতো বোধগম্য হলো!

এরই মধ্যে কোভিড রেস্ট্রিকশন জেনেও ডিসেম্বরের পঁচিশ তারিখ এলো এদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎসব— বড়দিন। প্যারিস শহর তখন খাঁখাঁ করছে। লোকজন কোভিডের কারণে নানান বাধা পেরিয়েও ঈদের সময় যেমন করে বাংলাদেশের লোকেরা রাজধানী ঢাকাকে ফাঁকা করে দিয়ে গ্রামে যায়, সেরকম প্যারিস ছেড়ে ফ্রান্সের অন্যান্য শহরে, আশেপাশের অন্যান্য দেশে আত্মীয়দের সাথে ক্রিসমাস করতে গেছে। আর্টিস্ট রেসিডেন্সিতে তখনও যেসব আর্টিস্টরা রয়ে গেছে তাদের নিয়েই আয়োজিত হলো বড়দিন।

অবশ্য ক্রিসমাসের তিন-চারদিন আগেই যথাযথভাবে আমি বাংলাদেশ থেকে নিয়ে আসা চাবির রিং, আমার বানানো মালা, দুল সব প্যাকেট করে রাখলাম। আশেপাশের বাসায় কলিং বেল বাজিয়ে কিছু বিলিয়ে দিলাম, রিসেপশনের লোকদেরও কিছু দিলাম। বাকি অবশিষ্ট তারপরও বেশকিছু জিনিস থেকে গেল। কিন্তু ওটুকুই। কারণ ক্রিসমাসের দিনে সত্যিই কী ঘটতে পারে তা ভাবিনি।

শীতকাতুরে লোকের মতো মোটামুটি বেলা করেই ঘুমাচ্ছিলাম। এমন সময় শুনি বাসার নিচ থেকে ব্যান্ডপার্টির মতো প্যাঁপু করে বাঁশির সাথে মাইকিং করছে— কাম জয়েন উইথ আস!

আমি তো নাচুনি বুড়ি, ফলে যারা ঢাক বাজাচ্ছিল তাদের দুই বাড়িতেই ঘর থেকে কৃষ্ণের বাঁশি শুনে ব্যাকুল হওয়া রাধার রূপ ধরে গিয়ে উপস্থিত হয়ে গিজ্ঞেস করলাম— তোমাদের সমস্যা কী? কান ফাটিয়ে দিচ্ছ কেন?

দেখি এলাহি কারবার। মদ তো আছেই, সাথে আছে নানা প্রকারের অজানা অচেনা খাবার। বুদ্ধি করে পকেটের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে নিয়ে

আসা চাবির রিং, মালার যে ছোট্ট সব অবশিষ্ট প্যাকেট ছিল তাও ওভারকোটের পকেটে করে নিয়ে এসেছিলাম বলে রক্ষা! কারণ ক্রিসমাসের উৎসবের নিয়ম হলো সব গিফট এক জায়গায় জড়ো করে একে একে গিয়ে যেকোনো একটা প্যাকেট হাতে নেওয়া আর সেই প্যাকেট খুলে দেখানো। সেই গিফট পছন্দ না হলে আগেরটি অন্য কাউকে গছিয়ে নিজে আরেকটা নেওয়ার ব্যবস্থা করা। এ এক মজার খেলা!

যথারীতি পালাক্রমে গিফটের প্যাকেট বেছে নেওয়ার পালা আসার মাইক্রোফোন হাতে নিজের পরিচয় দিলাম– আই এম প্রীটি, আই কেম ফ্রম বাংলাদেশ! এর মাঝে সোনালি চুলের এক ছেলে জোরে বলে উঠল– হেই লেডি, আই নো ইউ আর প্রীটি, হোয়াট ইজ ইউর নেম?

চারদিকে হাসির ফোয়ারা উঠল আর আমি শোরগোলে সামান্য লাল হয়েই বললাম– প্রীটি আমার নাম, বিশেষ্য। সর্বনাম নয়! সেই সোনালি চুলের যুবক ছোট্ট করে শিস বাজাল আর এর মধ্যে অবশিষ্ট উপহারের জায়গায় রাখা সবচেয়ে বড় প্যাকেটটা তুলে নিলাম।

বড় সাইজের ব্যাগ দেখে ভেবেছিলাম ভেতরে মণিমাণিক্য কি না জানি আছে! খুলে দেখি একটা বড় কার্ডবোর্ডের গায়ে আটকানো একটা রঙ মাখানো মূর্তিমান জাঙিয়া! সেই জাঙ্গিয়া আর কারোর না, আমার প্রতিবেশী তাকির! সে শুধু জাঙিয়া আটকেই ক্ষান্ত হয়নি, তার ওপর এক গাদাখানেক রঙ–তুলিও কায়দা করে আটকে দিয়েছে। এমনভাবে আটকেছে যেন বিপজ্জনকভাবে ঝুলে থাকা পুরুষাঙ্গ জাঙ্গিয়া ভেদ করে সকলের দিকে চেয়ে মুচকি হেসে বলছে– কী, কেমন দিলাম?

মানুষ অধিক শোকে পাথর হয়ে যায়, আমি অধিক 'শক' অর্থাৎ ধাক্কা খেয়ে পাথর হয়ে গেলাম। ধাক্কা সামলে মহান এই শিল্পীকে বললাম– ইটস নাইস টু গেট ইউর আন্ডারওয়্যার! কিন্তু মনে মনে বললাম– বদ, তোর জাঙিয়া দিয়ে আমি কী করব?

অবশ্য এই বদের জন্য আমার অন্তরের এক গোপন প্রকোষ্ঠে যে এত মায়া সঞ্চিত ছিল তা বুঝিনি সে বিদায় নেওয়ার আগে। মায়ার কারণ সম্ভবত তার যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ ফিলিস্তিন। ফিলিস্তিনের জাতীয় কবি মাহমুদ দারবিশ আমার অতি প্রিয় বলেই কি না জানি না, তাকি আমার হৃদয়ের খানিকটা জয় করে নিল। জীবনে প্রথমবারের মতো ফিরনি রান্না করে কাচের গ্লাসে ভরে প্যাকেটের গায়ে 'শুভ জন্মদিন' লিখে তাকে উপহার দিয়ে এলাম।

আবার একবার আশ্বস্ত হলাম এই শুনে যে, সে নিজে একফোঁটা মদ না খেলেও মদাক্রান্ত নারীরা তাকে বিশেষ ভরসা করে কারণ সে বন্ধু হিসেবে

চমৎকার। যেমন ভিভেকা মদ খেয়ে হুঁশ হারিয়ে ফেলার পর বার থেকে বাসা অবধি সেই বিশ্বস্ত বন্ধুর মতো পৌঁছে দিয়েছে।

এরই মাঝে সেই যে সোনালি চুলের স্লোভেনিয়ান যে শচীন দেব বর্মণ নিচের তলায় বাঁশি বাজায়, যে কি না আমাকে প্রীটি বলে তারিফ করেছিল, ভগ্ন হৃদয়ে দেখলাম সে নাকি মাত্র উনিশ বছর বয়সি। নাম ভিক্টর। ভিভেকা হেসে কুটিকুটি হয়ে চোখ পাকিয়ে বলল– প্রেমিক রেখে এখন আবার ফষ্টিনষ্টি করছ? আমি চোখ পাকিয়ে বললাম– তুমি কি আমাকে সেক্সলেস অর্গাজমের সুযোগও দেবে না? এরপর হেসে গড়াগড়ি খেতে খেতে সে বলে– প্রীতি, তুমি একটা...

–কী?

আমি একটা কী, তা এই যাত্রায় জানা না হলেও ভিভেকা আমার দেখা সবচেয়ে উদার হৃদয়ের নারীদের একজন। তার সবচেয়ে অপূর্ব গুণ হলো যে-কাউকেই আপন করে নেওয়া। সেই আপন এক অদ্ভুত মায়ার বন্ধন, পরিচিত হলাম সোনালি চুল আর নীল চোখের টিমোর সাথে, খাড়া নাকের নিনা আর লুইসহ একদল তরুণের সাথে। পরিচয়ের পর থেকেই মাঝে মাঝে আমরা হুটহাট বেরিয়ে পড়ি সেইনের পাড়ে, রু দ্য রিভলির সারি সারি বারের উদ্দেশ্যে। একেকদিন একেক রকমের বারে যাওয়া হয়, এদেশে সমকামীদেরও বার আছে। তাই যাওয়া হয় গে বার আর লেসবিয়ান বারেও। সেই সুবাদে রোমাঞ্চ হয় অদ্ভুত কারণে। রোমাঞ্চ হয় ভেবে এককালে আমার প্রিয় লেখকরা এই শহর দাপিয়ে বেড়িয়েছেন। তিন মাস্কেটিয়ারের জনক আলেকজান্ডার দ্যুমা, জা পল সাঁথরে, গিয়ম এপলোনিয়ার, শার্ল বদলেয়ার, আর্নেস্ট হেমিংওয়ে, স্কট ফিটজেরাল্ড, এজরা পাউন্ড, গার্ট্রুড স্টাইন। জাঁক প্রেভের লিখেছেন বিশুদ্ধ প্রেমের কবিতা। সেরকম রেনে শাঁর যুদ্ধ থেকে ফিরে দাপিয়ে বেড়িয়েছেন প্যারিসের পথঘাট, কিন্তু যুদ্ধ করে এসেও কখনো যুদ্ধকে টেনে আনেননি কবিতায়। বলেছেন– কবিতা এত বিশুদ্ধ আবেগ যে ওর মধ্যে যুদ্ধ টেনে আনলে তা না হয় যুদ্ধ, না হয় অস্ত্র কিংবা না হয় কবিতা!

আমি যদিও সেকথা পুরোপুরি মানি না।

কারণ যুদ্ধ না থাকলে এই ফ্রান্সেরই আরেক কবি পল এলুয়ার কখনো লিখতেই পারতেন না ফরাসি সাহিত্যের সেই বিখ্যাত 'লিবার্তে' কবিতাটা। যেখানে তিনি বারবার– ঘাসে, আকাশে, ফুলে, তুষারের ওপর লিখতে চেয়েছেন একটি শব্দ– স্বাধীনতা! আমার ধারণা বাংলা ভাষায় শামসুর

রাহমানের লেখা 'স্বাধীনতা তুমি' মূলত পল এলুয়ারের স্বাধীনতা তুমি'রই বাংলা রূপান্তর! অথচ শামসুর রাহমান কি স্বীকার করেছেন সেকথা?

পল এলুয়ারের কবিতা আর আমার জীবন মাখামাখি হয়ে গেছে কারণ প্যারিসে আসার পর প্রতি পদে আমি যা অনুভব করেছি সেটা হলো মুক্তির আনন্দ। দেশে যে জীবন আমি কল্পনা করতেও ভয় পেতাম সেই জীবন আমার চোখের সামনে মূর্তমান হয়ে উঠেছে এই শহরের আলোয়। তাই সুযোগ পেলেই চলে গিয়েছি সমস্ত মিউজিয়ামে আর কবরখানায়। শুনতে অবাক শোনাতে পারে, কিন্তু ল্যুভ মিউজিয়ামে গিয়েছি উঁ'ওরসে মিউজিয়াম দেখার পর! ফরাসিরা একথা শুনে চোখ কপালে তুলে বলেছে– থে বিয়া! ফরাসি ভাষায় এর মানে হলো– ভেরি গুড। বিয়া মানে ভালো, বিবাহ নয়!

মনপারনাস সিমেট্রিতে গিয়ে ভাঙা ফরাসি আর ইংরেজি মিলিয়ে সিমেট্রির এক মালীকে ধরে খুঁজে বের করেছিলাম শার্ল বোদলেয়ারের কবর। কবরের সামনে আশ্চর্য লিলির গুচ্ছ ঘ্রাণ ছড়াচ্ছে দেখে যারপরনাই বিমোহিত হয়েছি।

প্যারে লাশেজ সিমেট্রিতে গিয়েও খুঁজে বের করেছি লম্বা গলার মেয়েদের ছবি আঁকা বেপরোয়া সেই ইতালীয় শিল্পী আমেদিও মডিগ্লিয়ানি থেকে শুরু করে, বিখ্যাত নাট্যকার মলিয়ের, বলজাক, এককালের সাড়া জাগানো কিংবদন্তি সংগীতশিল্পী এডিথ পিয়াফ– কে।

বাংলার যেমন রবীন্দ্রনাথ তেমনি ফরাসিদের জা ককত। তিনি একাধারে কবি, গল্পকার, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক। উপন্যাস লিখেছেন, সিনেমা–নাটক দুই–ই বানিয়েছেন, এমনকি অভিনয়ও করেছেন। এডিথ পিয়াফ ছিলেন ককতর বান্ধবী। দুজন অসুস্থ হয়েছিলেন একসাথে, মারাও গিয়েছিলেন প্রায় একসাথে– কী সেই ঐতিহাসিক প্রয়াণ, সেকথা বলতে বলতে আমার ফরাসি বন্ধুদের চোখ চকচক করে ওঠে, ফুলে ওঠে কণ্ঠনালি!

পিয়াফ ছাড়াও কে নেই এখানে! আছেন আমার সাধের গিয়ম এপলনিয়ার! ভারতীয় মিথের শকুন্তলাকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন যিনি!

অবশ্য প্রায়ই অনেককে ইয়ার্কি করতে দেখেছি– ফরাসিরা সুযোগ পেলে মিশরের পিরামিডগুলোও তুলে আনত! ভারী অতিরিক্ত বলে সম্ভব হয়নি!

কিন্তু ফরাসিদের দুর্নাম আর সুনাম যা-ই করা হোক, একথা অনস্বীকার্য যে ফরাসি দেশ কালে কালে লেখক–শিল্পীদের মিলনমেলা হয়ে উঠেছে এর উদারনৈতিকতারই জন্য। অসংখ্য লেখক নির্বাসনে এসে এই দেশে থেকেছেন, অসংখ্য শিল্পী রাজনৈতিক আশ্রয় পেয়েছেন, মন খুলে লিখেছেন

অনেকেই যাদের বই নিষিদ্ধ হয়েছিল অশ্লীলতার দায়ে। এমনকি যে সাধের সমাজতন্ত্রের সাধ আজও বাংলাদেশের বাম বিপ্লবীরা দেখে, সোভিয়েত রাশিয়ায় কম্যুনিস্ট শাসন চলাকালে অতিষ্ঠ হয়ে এসেছিলেন ভ্যাসিলি কান্দিনেস্কি আর মার্ক শাগালের মতো গ্রেট আর্টিস্টরা এই শহরেই! কারণ সোভিয়েত সরকার সারাক্ষণই ভয়ে থাকত এই বুঝি বিমূর্ত কিংবা ফর্মালিস্টিক চিত্রকলার নাম করে তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকানো হচ্ছে!

আবার যেমন– ডিএইচ লরেন্স কিংবা জেমস জয়েস। লরেন্সের লেডি চ্যাটার্লিজ লাভার আর অন্যদিকে জয়েসের ইউলিসিস, দুইই নিষিদ্ধ হয়েছিল অশ্লীলতার দায়ে। তখন হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল এই শহরেরই ছোট্ট এক ইংরেজি বইয়ের দোকান– 'শেক্সপিয়র অ্যান্ড কোম্পানি'। নিষিদ্ধ হওয়া সেসব বই তারা আদরে রেখেছে শোকেসে। যে হেমিংওয়ে এসেছিলেন প্রায় কপর্দকশূন্য হয়ে, থাকতেন এই বইয়ের দোকানের অদূরের ল্যাটিন কোয়ার্টারের কাছে, বই পড়তেন ভাড়ায়, সেই তিনি এসেতো ঘোষণাই দিয়ে বসেছেন– প্রত্যেক লেখকেরই দুইটি দেশ– একটি প্যারিস আর অন্যটি তার জন্মভূমি! লিখেছেন প্যারিস নিয়ে তার নস্টালজিয়ায় ভরা ছোট্ট সেই বই– আ মুভেবল ফিস্ট বা একটি চলমান ভোজসভা!

সম্ভবত হেমিংওয়ে বেঁচে না থাকলেও তারই দৈব প্ররোচনায় আমি খড়ের গাদায় সুচ খুঁজে বের করার উৎসাহ নিয়ে আমি খুঁজে বের করেছি কার্লোস ফুয়েন্তেসের কবর, সিমন দ্য বুভয়া আর সাঁৎরের কবর। দেখেছি কবরের ওপর আজও তাদের ভক্তদের রেখে যাওয়া ট্রেনের টিকিটের সারি, কারণ এককালে এই মহান দার্শনিক সাঁৎরে লিখেছিলেন– তাঁর কাছে জীবন হলো সেই ভ্রমণ, যে ভ্রমণের ট্রেনে তিনি উঠে পড়েছেন টিকিট ছাড়াই!

আমার অদ্ভুতভাবে মনে পড়ল বাংলাদেশের ট্রেনের মাঝে আমি এক অদ্ভুত করুণ মৃত্যু দেখেছিলাম। আমার চোখের সামনে লুটিয়ে পড়েছিলেন সেই ভদ্রলোক। ট্রেনে থাকা ডাক্তাররা সেই ভদ্রলোকের সাথে থাকা তাঁর পুত্রকে জানতে দেয়নি– তিনি আর নেই! একটি ভ্রমণ থেকেই তিনি উঠে পড়েছেন অন্য ভ্রমণে এবং সাঁৎরের মতে সেটিও টিকিট ছাড়াই!

ল্যুভ মিউজিয়ামে প্রথমে না গিয়ে ডি'ওরসেতে গিয়ে যে ফরাসি বন্ধুদের চোখে প্রশংসা ও নাম কুড়ালাম তা মূলত আমার প্রিয় ইম্প্রেশনিস্টদের কৃতিত্ব। আমি জানতাম প্রি র‍্যাফেলাইট ছবিতে আমার তেমন একটা মন নেই। আমার প্রিয় মনে, মানে, পিসারো, পল সেজান, রেনোয়ার আঁকা ছবিতে রঙের ঝলকানি। একথা জেনে বার্লিনের সুজান বলেছিল– আচ্ছা! তাহলে তুমি সোসিয়েত অ্যানোনিমের ভক্ত!

জানলাম আমরা যে দলটাকে ইম্প্রেশনিস্ট বলে ডাকি, ওর নাম ছিল– সোসিয়েত অ্যানোনিম বা নামহীন সংঘ! শিল্পীদের বন্ধু কবি বোদলেয়ার দিয়েছিলেন এই নাম। লোকে ইম্প্রেশনিস্ট দলটাকে গালি দিয়েছিল ইম্প্রেশনিস্ট বলে। কারণ এই গরিব শিল্পীদের দলের একজন ক্লদ মনে, সে নিজের আঁকা এক ছবির নাম রেখেছিল– ইম্প্রেশান, সানরাইজ। লোকে বলেছিল, ওর মধ্যে কেবল ইমপ্রেশানই আছে, সূর্যোদয় আর নেই! কেউ কেউ বলেছিল রঙ গুলে ছুড়ে মেরেছে ওরা ক্যানভাসের মুখে!

লোকের দেওয়া এই গালিকেই ওই শিল্পীরা মাথা পেতে নিয়েছিল। নিজেরা না খেয়ে থাকবে, তবু লোকের ফরমায়েশের ছবি আঁকবে না! এমনকি এই দলের যে এক প্রদর্শনী হতে পারে, সেটাই তো অনিশ্চিত ছিল! একমাত্র এদুয়ার মানে ছাড়া কেউই এই শিল্পীদের মধ্যে বড়লোক ছিল না। এদুয়ার মনের বাবা কী চেষ্টাই না করেছেন ছেলের ছবি আঁকার বাতিক ছুটাতে! কিন্তু কাজ হয়নি।

বরং গরিব শিল্পীদের বড়লোক বন্ধু এদুয়ার মনে প্রভাবশালী বাবাকে দিয়ে চিঠি লিখিয়েছিলেন সরকারি সোঁলোতে প্রদর্শনের জন্য বাদ পড়া সমস্ত ছবি পুনর্বিবেচনা করতে। ক্ষমতায় ছিলেন তখন তৃতীয় নেপোলিয়ন, চারদিকে নানান গোলমাল চলছে। তার সিংহাসনই বেশ নড়বড়ে। ফলে শিল্পীদের বাতিল পড়া ছবিগুলোকেও তিনি প্রদর্শনীর জন্য আলাদা জায়গা দিয়েছিলেন।

এত জায়গা দিয়েও শেষতক ওই গরিব শিল্পীরা রেহাই পায়নি, লোকের হাসাহাসিও কমেনি। তবে কালক্রমে এই প্রাথমিক ইম্প্রেশনিস্টদের এই দলে পরবর্তীতে যোগ দিয়েছিলেন ভ্যান গগ, বার্থ মারিসো, মারি কাসাট, পল গগ্যারা। পল গগ্যার দ্বারা মহা প্রভাবিত আমাদের অমৃতা শেরগিলই কি কম যান! ভারতীয় শিল্পকলার এই রাজকন্যার কাছে গগ্যা ছিলেন গুরু। যে বছর রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার মুখ উজ্জ্বল করতে নোবেল প্রাইজ পেলেন, সেই ১৯১৩ সালেই শিক বাবা আর হাঙ্গেরিয়ান মায়ের ঘরে জন্মেছিলেন অমৃতা। বিস্ময়কর প্রতিভা দেখিয়ে জায়গা করে নিয়েছিলেন ফ্রান্সেরই একাদেমি দ্য বোজার্টের সোঁলোতে। তবে বেঁচে থাকতে অমৃতার ছবিরও গুরু গগ্যার মতোই দশা ছিল, টাকা দিয়ে কেনার মতো লোক ছিল না।

গরিব এই শিল্পীরা কী কষ্টই না করেছে, অথচ এখন ওইসব ছবি ইউরোপের সব প্রধান মিউজিয়ামে ঝুলছে। লোকে কত টাকা খরচ করেই না দেখছে!

গগ্যা তো প্যারিস ছেড়ে দিয়েছিলেন, বলেছিলেন– প্যারিস তার অনুভূতি শুষে নিচ্ছে! বলেছিলেন– প্যারিসে থাকে কৃত্রিম মানুষেরা! নাগরিক জীবন ফেলে সোজা গিয়ে উঠেছিলেন তাহিতি দ্বীপে। সেখানে বসেই দ্বীপের তামাটে আর তাঁর কল্পনায় হলদে মানুষদের নিয়ে এঁকেছিলেন সেই বিস্ময়কর ক্যানভাস– আমরা কে? এলাম কোত্থেকে? যাবই বা কোথায়?

গগ্যার ক্যানভাসে লাল আর হলুদের যে ছড়াছড়ি, তা দেখলে আমাদের দেশের প্রকৃতিতে সরষে ওঠার মরসুম এক ধাক্কায় মনে পড়ে যায়! চারদিকে কী বিস্ময়কর সুন্দর চোখ ধাঁধানো হলুদ থাকে তখন! আবার কি কখনো শীতের দিনে মাটির রাস্তায় উঁচু–নিচু পথে যেতে যেতে বাংলাদেশের হলুদ প্রান্তর দেখা হবে?

ফরাসি আর্টিস্ট বন্ধুদের কাছে আমার শিল্পরুচির প্রশংসা পেয়েই সম্ভবত ল্যুভের আগে দেখতে গেলাম বাড়ি থেকে সামান্য দূরের পিকাসো মিউজিয়াম, রোমাঞ্চ বোধ করলাম এই শহরেরই একটি কোণে বসে পিকাসো এঁকেছেন দুই হাতে, হয়েছেন তুমুল জনপ্রিয়। বন্ধু জর্জ ব্র্যাকের সাথে মিলে উদ্বোধন করেছেন শিল্পকলার ইতিহাসের নতুন এক অধ্যায়– কিউবিজম!

কিউবিক ঘরানার চৌকো মুখ আর পাইপের মতো নাকের মানুষ আঁকা ছবিগুলোর পাশাপাশি আমাকে আবেশে আটকে রাখল এমনকি বাড়ির পাশেরই আরেক মিউজিয়াম, যার নাম– ম্যুজে দু কানাভ্যালে। এই মিউজিয়ামে আছে প্যারিসের গোঁড়াপত্তনের ইতিহাস। প্যারিসে আসার পর পরম বন্ধু আর শুভানুধ্যায়ী হিসেবে পাওয়া স্টেফানি মেইসনের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল আরেক প্রিয় ফ্রেঞ্চ লেখক মার্সেল প্রুস্তের ব্যবহার করা পোশাক, খাট থেকে শুরু করে ওর কাজের প্রদর্শনী দেখার। তখনও একরত্তি ফ্রেঞ্চ বুঝতে না পারায় সেই প্রদর্শনী দেখা সার হলো। কিন্তু মুগ্ধ হয়ে গেলাম ফরাসি বিপ্লবের বিস্তৃত ইতিহাস আর ফ্রান্সের রাস্তাঘাট নিয়ে গত কয়েক শতাব্দীতে আঁকা বেশ কিছু গ্রেট মাস্টারের কাজে!

রোদের দিন দেখলেই চনমন করতে করতে বেরিয়ে পড়ার কারণেই রেসিডেন্সিতে আমার প্রথম বন্ধু তাকি চলে যাওয়ার পর ওই একই প্যালেস্টাইনের স্টুডিওতে আগত ইমরানিকে রাজি করিয়ে ফেললাম একদিন ভাস্কর রদ্যাকে নিয়ে যে মিউজিয়াম, সেই– মুজে রদ্যাতে যাব।

গিয়ে যেন বহুদিনের স্বপ্ন পূর্ণ হলো! 'দ্যা থিংকার' নামের চিন্তাশীল লোকটির ভাস্কর্যের সামনে গিয়ে বিহ্বল হলাম, গ্রামের লোক শহরে প্রথম এসে যে মুগ্ধতা দেখায় সেই মুগ্ধতা ফোঁটা ফোঁটা হয়ে গড়িয়ে পড়ল আমার

আগ্রহে ভরা মুখমণ্ডল বেয়ে। সবচেয়ে অবাক হলাম রদ্যার বন্ধু ক্যামিল ক্লদেলের বানানো ভাস্কর্য দেখে। কথিত আছে রদ্যা নাকি হিংসে করতেন ক্যামিলকে। অবশ্য ক্যামিলের যে কাজ দেখেছি তাতে হিংসে করাই স্বাভাবিক। আমার অতি সাধারণ ধারণা জহুরি কোনো ভাস্করকে এনে ছেড়ে দিলেও সে ঠাহর করতে পারবে না কোনটা রদ্যার বানানো আর কোনটা ক্যামিলের! অবশ্য রদ্যার তুলনায় আকারে অনেক ছোট ক্যামিলের বেশিরভাগ ভাস্কর্যই।

ইমরানির সাথে ঘুরে বেড়ানো এক অদ্ভুত আনন্দের ব্যাপার ছিল আমার কাছে কারণ প্রায় ইশারা–ইঙ্গিতে আমরা যোগাযোগ করতাম! গুগল কোম্পানিকে হিন্দু দেবতার মতো প্রণাম করতে ইচ্ছে করে কারণ আরবিভাষী এই ছেলের কথার বিন্দুমাত্র উদ্ধার করা হতো না যদি না আরবি থেকে ইংরেজি আর ইংরেজি থেকে আরবিতে রূপান্তর করা যেত। আমরা যেহেতু ফ্রেঞ্চ ক্লাসে একইসাথে যাই ফলে তখন অদ্ভুত ইংরেজিতে আমি শুধাই– ডু ইউ ওয়ানা ইট পেতি দেজুর্নে? ফ্রেঞ্চ ভাষায় 'পেতি দেজুর্নে' মানে সকালের নাশতা। কিন্তু ইমরানির কানে সম্ভবত একটা রিফ্রেক্টর সেট করা ছিল যার ফলে সে কোনো কথা একবার বললেই জিজ্ঞেস করত– হোয়াট! আমি আবারও ইমরানিকে বোঝাতাম, দেজুর্নে মানে দুপুরের খাবার। ফ্রেঞ্চ ভাষায় পেতি মানে– লিটল বা ছোট। অর্থাৎ পেতি দেজুর্নে মানে লিটল লাঞ্চ ওরফে সকালের নাশতা!

প্রচুর পরিমাণে আউট বই পড়ার কারণে আমি জানতাম দুই শতাব্দী আগে প্যারিসে শিল্পী–সাহিত্যিক গিজগিজ করত। কিন্তু আর্টিস্ট রেসিডেন্সিতে থাকায় দেখতে পাই এখনও সেই সংখ্যাটা কম না। খোদ ইউরোপেও যেকোনো শিল্পী আজও প্যারিসে কাজ করে বলে এক ধরনের আত্মশ্লাঘা বোধ করে বলে আমার বিশ্বাস।

এমনকি প্যারিসে আমার জীবনের শুরুর চার–পাঁচ মাস প্রায় প্রতি সপ্তাহে দুই তিনবার মিউজিয়ামে যাওয়ার বদৌলতে দেখতাম মিউজিয়ামেরই দরজার সমান ফ্রেঞ্চ উইন্ডোর সামনে দাঁড়িয়ে এক মনে স্কেচ করছে আর্ট কলেজের কোনো এক শিল্পী। আমি আর ইমরানি অবশ্য হাসাহাসিও করেছি এই বলে যে, এই ভিরের মধ্যে এক কোণে দাঁড়িয়ে ও আঁকছেই বা কী আর দেখছেই বা কী?

প্রায়ই আমি আর ইমরানি নিশ্চিত হতাম ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পীদের মতো আমাদের ভাত–কাপড়ের আর থাকার জায়গার অভাব নেই। এমনকি

মপার্নাস সিমেট্রিতে শুয়ে থাকা আমার প্রিয় কবি বোদলেয়ার ইম্প্রেশনিস্টদের পক্ষে লিখেছিলেন যখন তখনও তিনি ধারের জ্বালায় অস্থির। বিধবা মায়ের কাছ থেকে টাকা নেন নানান ছুতোয়, যে বেশ্যার কাছে যান সেখানেও বাকি পড়ে গেছে।

এদিকে আরেক বিখ্যাত ফ্রেঞ্চ কবি, লেখক এমিল জোলার বন্ধু ছিলেন আরেক ইম্প্রেশনিস্ট পল সেজান। জোলা সাধ্যমতো লিখতেন বন্ধু সেজান আর তার দলের বাকিদের আঁকার ব্যাপারে, কিন্তু কেউ তেমন একটা পাত্তা দিত না ওদের।

সেদিক দিয়ে আমাদের কপাল ভালো। আমরা নিজেদের দেশ থেকে নির্বাসিত, কিন্তু প্যারিসের কেউ কেউ আমাদের চেনে, আমরা ছবি আঁকছি, হাত ভরে লিখছি– সেই বা কম কীসের! ইমরানির কল্যাণেই আমি জেনেছিলাম নির্বাসিত লেখক আর শিল্পীদের নিয়ে যে সংস্থা 'আতেলিয়ার দেজ আর্টিস্ট এন এক্সাইল'–এর কথা। আমরা ফ্রেঞ্চ শিখতে শুরু করেছিলাম ওখানেই। অবশ্য শুরুতে আমাদের ফ্রেঞ্চ শুনে ফ্রেঞ্চরাই ইংরেজিতে কথা বলত। কিন্তু আমি ইমরানিকে উৎসাহ দিয়ে বলতাম– ওই যে সিগমুন্ড ফ্রয়েড, এই জগৎবিখ্যাত ডাক্তার আর দার্শনিকটিও ফ্রেঞ্চ বলতে পারতেন না আমাদেরই মতোন। একবার প্যারিসে এলেন বক্তৃতা দিতে। এসে দেখেন সিংহভাগই ইংরেজি বোঝে না। ফলে তিনি সেবার বক্তৃতা না দিয়েই ফিরলেন। তিন বছর সময় নিয়ে ফ্রেঞ্চ শিখলেন। তিন বছর পর এদেশে এসে ফরাসি ভাষায় বক্তব্য দিলেন। যেখানে ফ্রয়েডের মতোন লোক এদ্দিন লাগিয়েছেন এই ভাষা শিখতে, সেখানে আমরা কোন ছার?

ইমরানি ফ্রয়েডকে ভালো করে চেনে না। কিন্তু আমার কথার মূল বক্তব্যের সাথে একমত হয়ে ঘনঘন মাথা নাড়তে কসুর করে না। তবে সেই ইমরানিই যখন আর্টিস্ট রেসিডেন্সির নির্দিষ্ট মেয়াদ যখন শেষ হলো আর রেসিডেন্সি ছেড়ে আরেক শহরের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমাল তখন খুব কষ্ট পেয়েছিলাম। আমার বর ও সঙ্গীটি তখনও আমার মাথার ওপর ছায়া হয়েছিল। সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল– জীবন এমনই!

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলাম এই বলে– যে-ই আপন হতে শুরু করে, তাকেই আমি হারিয়ে ফেলি!

মনে পড়ে আমি, ভারতের সুরাট থেকে আসা খুশবু আর ইমরানি শেষ রাতটিকে স্মরণীয় রাখতে হেঁটেছিলাম সেইন ধরে নাক বরাবর। স্মৃতিচারণ করেছিলাম আমাদের পরিচয়ের। দুই মাস পরে খুশবুও পাড়ি জমাল ভারতের

উদ্দেশ্যে। আমি এর মধ্যে ঘুরলাম নরওয়ে আর পোল্যান্ডের বেশ কিছু শহর। দেখা হলো জনপদ আর ভিন্ন ভাষার অসংখ্য মানুষ।

আর্টিস্ট রেসিডেন্সি আমাকে শেখাল– জীবন মূলত গতিময় এক ভ্রমণ। হয়তো তাই একদিন এরই মাঝে বাংলায় আদর করে বিশ্ব কবি ডাকা রবিঠাকুরের সুরে সুরে সেইনের পাশের পন লুই ফিলিপের পাশে বসে বিকেলের অস্ত যাওয়া সূর্যের লাল আলোর রেখাকে সাক্ষী করে প্যারিসের প্রতি কৃতজ্ঞতাপাশে নিজেকেই বলেছিলাম–

"কত অজানারে জানাইলে তুমি
কত ঘরে দিলে ঠাঁই,
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু
পরকে করিলে ভাই!"

হ্যালো মিস্টার পামুক!

'পরকে ভাই করা'র পণ নিয়েই সম্ভবত প্যারিস আমার কাছে ঝাঁপি মেলল। তবুও কেউ যদি জিজ্ঞেস করে প্যারিসে আসার পর আমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দময় ঘটনাটা কী?

আমি কালবিলম্ব না করে বলব— আমার বিয়ে এবং ওরহান পামুকের সাথে দেখা হওয়া!

নোবেলবিজয়ী এই লেখকের সাথে দেখা হওয়া এত সহজ অবশ্য ছিল না। সুযোগটি পেয়েছিলাম স্টেফানির কারণে। স্টেফানির কথা বিশদভাবে বলা দরকার।

স্টেফানি মেইসনের আমার প্যারিস জীবনে পাওয়া সবচেয়ে দারুণ মানুষদের একজন। প্যারিসের প্রায় সত্তরটি লাইব্রেরির সম্মিলিত পরিচালক সে। প্যারিস শহরের কর্তৃপক্ষ যখন যোগাযোগ করেছিল আমার ব্যাপারে তখন সে সম্মত হয়েছিল আমাকে এদেশের সাহিত্যের উঠোনে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার। সেই ধারাবাহিকতায় পরিচিত হলাম তার সাথে, আমার লেখা আর আঁকার সংগ্রাম তাঁকে ছুঁয়ে গেছে জেনে খুব আপ্লুত হয়েছিলাম। সে জিজ্ঞেস করেছিল— তোমাকে কোথায় খাওয়াতে নিয়ে যাব, বলো তো?

আমি তখন প্যারিসের কিছুই চিনি না। সে সহজ করে দিতে বলেছিল— ভিয়েতনামী, ফ্রেঞ্চ নাকি চাইনিজ রেস্তোরাঁ?

ভিয়েতনামের লোকেরা ভাত খায়, ফলে রাজি হয়েছিলাম ভিয়েতনামী রেস্তোরাঁয় যাওয়ারই। সেখানেই বসে জেনেছিলাম স্টেফানির সঙ্গী একজন ফিল্ম ক্রিটিক। 'কান' চলচিত্র উৎসবে তার নিয়মিত যাতায়াত। কথায় কথায় জেনেছিলাম ভারতের তিতলি নামের সিনেমাটার পরিচালক কানু বেল স্টেফানি আর তার সঙ্গীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বিস্তারিত জানি না, তবে এই সিনেমার ফান্ডের একটা অংশ ফ্রেঞ্চ গভর্নমেন্টেরই দেওয়া।

নির্ভেজাল হাসিখুশি এই নারীটি আমার প্রথম ওপেন স্টুডিও প্রদর্শনীতে এসেছিল তার শিশুকন্যাকে সাথে নিয়ে একটা কেক সমেত। আমি কথাচ্ছলে বলেছিলাম– এই শহরে কি পাওলো কহেলো কিংবা ওরহান পামুকের আসার সম্ভাবনা আছে?

কাকতালীয়ভাবে এরই তিনদিন পর সে মেইল পাঠাল।

ব্যাপক উত্তেজনা নিয়ে দেখলাম সেখানে লেখা– এখানে ঝটপট রেজিস্ট্রেশন করে ফেল দেখি! তোমার প্রিয় ওরহান পামুক এই শহরে আসছেন!

আমি রেজিস্ট্রেশন করলাম এবং নির্দিষ্ট দিনে গুগল ম্যাপ দেখে গিয়ে দাঁড়ালাম প্যান্থিওনের সামনে। দেখলাম, উত্তেজনায় দুই ঘণ্টা আগে এসে পড়েছি! এখন?

এদিকে ওরহান পামুক আসবেন দুই ঘণ্টা পরে, কিন্তু এক দাররক্ষী বলে– তোমার রেজিস্ট্রেশন কোড তো মিলছে না হে!

আমাকে রিসেপশনে গিয়ে যোগাযোগ করতে বলতেই রিসিপশনের লোকটি বলল– তুমি এই ইভেন্টে সাইন করা প্রথম লোক যে কি না সবচেয়ে আগে এসেছ!

আমি দাঁত বের করে হাসি দিয়ে বললাম– দ্বাররক্ষীকে বোঝাও তার জানার বাইরেও দুনিয়া আছে, সে প্রথমে আমাকে ঢুকতেই দিচ্ছিল না!

অন্য সময় হলে এই লোকের তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠার কথা, কিন্তু আমার বলার ভঙ্গিতে হেসে ফেলল সে। অটোমেটিক দরজা খুলে গেল আর আমি প্রবেশ করলাম প্যান্থিওনে!

প্রথমেই মুখ দিয়ে যে শব্দটা বেরোল সেটা হচ্ছে– ওয়াও!

প্যান্থিওন ঠাসা আছে কয়েক শতাব্দীর বিখ্যাত সব আর্টওয়ার্ক দিয়ে। সেসব দুর্লভ দেওয়ালচিত্রে সরাসরি আলো ফেলা হয় না, লুকানো প্রকোষ্ঠ থেকে একটা নির্দিষ্টমাত্রার আলো এসে পড়ে বহুমূল্য ওসব ছবির গায়ে। যেহেতু প্যান্থিওন নামটাই রোমানদের থেকে নেওয়া সুতরাং আর্কিটেকচারের দিক থেকেও এটা প্রায় কাছাকাছি। মাঝখানে এক প্রকাণ্ড পেন্ডুলাম, সেটা ঝুলছে ছাদ থেকে, এদিক–ওদিক দুলছে। সেই দোলাদুলি দেখতে ভিড় লেগেই আছে।

পেন্ডুলামকে সাক্ষী রেখে দেওয়ালের ছবির সারি দেখতে দেখতে ক্রিপ্ট নামের মাটির তলার ডানজনে নেমে দেখি সেখানে শুয়ে আছেন ভলতেয়ার, রুশো, মেরি কুরি, পিঁয়েরে কুরি, আন্দ্রে মারলো, জসেফাইন বেকার,

আলেকজান্ডার দ্যুমা, ভিক্টর হুগো, এমিল জোলা! আমার শৈশব ও কৈশোরকে আলোকিত করা এই গ্রেটদের কখনো সামনে থেকে দেখা হবে একসাথে, মনে মনে তাদের বলা হবে 'আমি এসেছি তোমাদের কাছে' এই কথাই কি কখনো ভেবেছিলাম?

ভলতেয়ারের কবরের সামনে তাঁর আঙুল তোলা এক অবক্ষ মূর্তি আছে, আঙুল এভাবে তুলতে দেখেছি একজনকেই, তিনি বাংলাদেশের মহান নেতা শেখ মুজিবুর রহমান। আমি দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। কালক্রমে তার কন্যা শেখ হাসিনা যদি একনায়ক না হয়ে উঠতেন তাহলেই বরং এই নেতার জন্য ভালো হতো, মানুষ তাঁকে মন থেকে স্মরণ করত। কিন্তু এখন হয়েছে উলটো। তিনি হয়ে উঠেছেন একনায়কের হাতিয়ার।

সে যাকগে। ভলতেয়ারের কবরের সামনে দাঁড়িয়ে যখন ফিসফিসিয়ে উচ্চারণ করছি বাক্‌স্বাধীনতা নিয়ে তাঁর শতাব্দীশ্রেষ্ঠ বাণী "আমি তোমার মতামতের সাথে হয়তো একমত হবো না, কিন্তু তোমার কথা বলার অধিকারের জন্য আমি জীবন দিয়ে দিবো" তখনই গার্ড এসে তাগাদা দিল– প্যান্থিওন বন্ধ হয়ে যাবে!

সেকী!

প্যান্থিওন বন্ধ হলে পামুকের সাথে দেখা হবে কেমন করে?

গার্ডদের নেতাকে দেখালাম আমার কার্ড, সে বলল– মাদমোয়াজেল, আপনি বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করবেন। ইভেন্ট শুরুর পনেরো মিনিট আগে খুলে দেওয়া হবে দরজা। তার কথামতো বাইরে চলে এলাম। কিন্তু তখন মনে মনে আবেগে মাখামাখি দশা।

আলেকজান্ডার দ্যুমা আমার কৈশোরের প্রেম। তাঁর লেখা 'থ্রি মাস্কেটিয়ার্স', 'ভাইকাউন্ট দ্য ব্র্যাগেলো' কিংবা 'ম্যান ইন দ্য আয়রন মাস্ক' ফরাসি সাহিত্য তো বটেই, বরং বিশ্বসাহিত্যের সবচেয়ে বিখ্যাত ক্লাসিকগুলোর এক সিরিজ। এই ঘটনার পরে একবার স্টেফানির কল্যাণে আমার প্রিয় বই নিয়ে বলার এক ইভেন্টে গিয়েও আমি বলেছি এই বইয়ের কথা। ওদের জানিয়েছি এইসব দ্যুমা সাহিত্য আমি পড়েছিলাম বাঙলায়। বাংলায় সেবা প্রকাশনী থেকে বের হওয়া অনুবাদ গিলেছিলাম গোগ্রাসে। দ্য থ্রি মাস্কটেটিয়ার্সের দারতায়া, এথোস, পার্থোস আর আরামিস– এই চার মাস্কেটেয়ার্সের কথা ভুলি কেমন করে?

'কাউন্ট অফ মন্টেক্রিস্টো' কিংবা 'দ্যা ব্ল্যাক টিউলিপ' আমার পড়া দ্যুমার লেখা সেরা বই। এত প্রিয় লেখক আমার সামনে সমাধির মধ্যে শুয়ে

আছেন, চুপচাপ দেখছেন আমাকে– এ এক অদ্ভুত আবেগ! এমিল জোলা কিংবা ভিক্টর হুগোর কথাই ভুলি কেমন করে! হ্যাঞ্চব্যাক অফ নতরদামের সেই কুঁজো লোকটার কথা এমন করে আর কে–ই বা বলতে পারতেন হুগো ছাড়া? সেই হুগো, জোলার উপন্যাসের ভবঘুরেরা আর দ্যুমা যেন একত্রে আমার সামনে!

এমন আরেকবার হয়েছিল নেপোলিয়নের সমাধির সামনে গিয়ে। বিশাল সেই সমাধি কমপ্লেক্সের দেওয়ালে দেওয়ালে কেবল নেপোলিয়নের বাণী, চারদিকে ভাস্কর্য আর মাঝে সেই প্রকাণ্ড তামাটে খাটের মতো সমাধি। যদিও নেপোলিয়ন সেই খাটের মধ্যে নেই, বরং আছে মাটির আরও নিচে।

নেপোলিয়নকে নেপোলিয়ন ডাকে না ফরাসিরা, ডাকে বোনাপার্ট। কারণ ফ্রান্সের ইতিহাসে নেপোলিয়ন মূলত তিনজন আর বোনাপার্ট কেবল একজন। প্রথমজন বোনাপার্ট, দ্বিতীয়জন তাঁর ছেলে। এই ছেলে সম্রাট হয়েছিল মাত্র ১৫ দিনের জন্য! ১৫ দিনের মাথায় সে মারা যায় যক্ষ্মায়। তিন নম্বর নেপোলিয়ন হলো বোনাপার্টের ভাইপো। সে ছিল ফ্রান্সের প্রথম প্রেসিডেন্ট।

যা-ই হোক, বোনাপার্টে রক্তে ফ্রেঞ্চ না হয়েও শুধু ফ্রেঞ্চদের হিরোই না, কর্সিকান এই মানুষটিকে ফরাসিরা শ্রদ্ধা করে প্রাণ ভরে কারণ ফ্রান্সের জন্য এমন অকাতরে কেউ নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে দেননি। যদিও আমার কাছে দেশপ্রেম এক অন্ধ আবেগ, তবুও ফ্রেঞ্চদের এই আবেগ আমি কিছুটা বুঝতে পারি।

আজও সেনানায়ক হিসেবে তিনি দুনিয়ার যেকোনো সেনাবাহিনীর রোল মডেল।

আর্টিলারির সৈনিক হিসেবে হাতেখড়ি হয়েছিল তাঁর। এরপর ১৭৯৮ সালে যোগ ইতালিতে ফ্রেঞ্চ বাহিনীর কমান্ডার হিসেবে।. নিয়োগ পাওয়ার দ্বিতীয় বছরেই তিনি মিশর শাসিত অটোম্যান রাজ্য জিতে নেন। এদিকে দেশে চলতে থাকে ফরাসি বিপ্লব। অবশ্য নেপোলিয়ন মিশর জেতার আগেই রাজা ষোড়শ লুইকে গিলোটিনে হত্যা করা হয়। রাতারাতি বিপ্লবে নেতৃত্ব দেওয়া ম্যাক্সিমিলান রবেস্পিয়ের আর জ্যাকোবিন ক্লাব হয়ে ওঠেন বিপ্লবের মূল নায়ক। কিন্তু ক্ষমতায় আসার পরই রবেস্পিয়ের শুরু করেন আরেক গণহত্যা, অনেকটা জারদের শাসনের অবসানের পর সমাজতন্ত্রের বিপ্লবীদের হাতে রাশিয়ায় যে অবস্থা শুরু হয়েছিল সেরকমই। রাজার সাথে সামান্য সম্পর্ক ছিল এমন সবাইকে নির্বিচারে হত্যা শুরু হয়, অনেক নিরীহ মানুষও মারা পড়ে। এদের মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে বিখ্যাত হলেন আতোয়ান

ল্যাভয়সিয়ে। রসায়ন নিয়ে পড়াশোনা করেছে এমন কেউ নেই যে ল্যাভয়সিয়েকে চেনে না, তাকে বলা হয়— আধুনিক রসায়নের পিতা। কেবলমাত্র সন্দেহের বসে বিপ্লবীরা ল্যাভয়সিয়েকে আটক করে এবং তারপর হত্যা করে গিলোটিনে।

ফ্রান্সের জাতীয় সংগীতও দুনিয়ায় সবচেয়ে বেশিবার ব্যান হওয়া জাতীয় সংগীত সম্ভবত! একারণেই কি এরা বাক্‌স্বাধীনতা নিয়ে তুলনামূলক ভাবে অন্যদের চেয়ে আজ একটু বেশিই সোচ্চার?

জানি না।

তবে ফ্রান্সকে একটা মানুষ কল্পনা করলে তার ভাগ্য কতটা অদ্ভুত তা টাহর করা যায়, যখন জানতে পারি গিলোটিন আবিষ্কার করেছিলেন গিলোটিন নামের এক ফ্রেঞ্চ ডাক্তার, কিন্তু হায়— তিনি কি জানতেন সেই গিলোটিনে এত মানুষ মারা হবে আর চিকিৎসার জন্য বানানো সেই যন্ত্রই হয়ে উঠবে আতঙ্কের নাম?

কিন্তু দিনে দিনে হত্যাযজ্ঞের এই অস্থিরতায় ফরাসিরা ক্লান্ত ও আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। আতঙ্কিত হওয়ার কারণও ছিল, যেমন রবেস্পিয়ের নিজেই খুন হয়ে গিয়েছিলেন সেসময় নিজের দলের লোকদের হাতে। মূলত সেই অবস্থা থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন বোনাপার্ট। তিনি হয়ে উঠেছিলেন প্রজাতন্ত্রের সম্রাট! নিজের নামেও মুদ্রা চালু করেছিলেন সেসময়। আমি অবশ্য ফ্রেঞ্চ বন্ধুদের সামনে প্রায়ই হাসি 'প্রজাতন্ত্রের সম্রাট' নামটায়। ওরা বেশিরভাগই মুখ গম্ভীর করে রাখে, কারণ ওদের মতে, সেসময় বোনাপার্ট ছাড়া কেউই ফরাসিদের অমন উদ্ধার করতে পারতেন না।

অবশ্য সে নিয়ে তর্ক থাকলেও তিনি খাঁটি সম্রাটই হয়েছিলেন। যেকোনো সম্রাটের মতোই বোনাপার্টেরও ছিল দেশ জয়ের নেশা এবং যুদ্ধজয়ের বাতিক। ক্রমেই তিনি একে একে জয় করে নেন আশেপাশের দেশগুলো, ফলে ভয় পেয়ে যায় আশেপাশের সবাই। একবার ইংরেজদের হাতে তিনি বন্দি হন, তাকে নির্বাসন দেওয়া হয় এলবা দ্বীপে। কিন্তু সেই দ্বীপে বসেও তিনি অভ্যুত্থান ঘটিয়ে বিনা রক্তপাতে ফিরে আসেন ফ্রান্সের সিংহাসনে! ইংরেজদের পুতুল অষ্টাদশ লুই আবার পালান সিংহাসন ছেড়ে।

অবশ্য এই শাসন টিকেছিল মাত্র একশো দিন। ইংরেজরা ভয় পেত নেপোলিয়নকে। ফলে ব্রিটিশ আর মিত্ররা মিলে আবার ডাক দেয় যুদ্ধের, সেই যুদ্ধ হলো বেলজিয়ামের ওয়াটারলুর প্রান্তরের সেই বিখ্যাত যুদ্ধ 'ব্যাটেল অফ ওয়াটারলু'। অবশ্য দ্বিতীয়বার আর ইংরেজরা ভুল করেনি। তাকে

দ্বিতীয় ও শেষবারের মতো নির্বাসন দেয় সেন্ট হেলেনা দ্বীপে। এই নির্বাসনে থাকাকালেই ইংরেজরা জানায় বোনাপার্ট মারা গেছেন পাকস্থলীর ক্যানসারে, কিন্তু রটনা ছিল বোনাপার্টকে তারা মেরে ফেলেছে আর্সেনিকের স্লো পয়জনিং করে। অবশ্য এই রটনার পেছনে ঘটনাও ছিল।

প্রথমে নেপোলিয়নকে কবর দেওয়া হয়েছিল সেন্ট হেলেনা দ্বীপেরই উইলো উপত্যকায়।

বিশ বছর পর তাঁর দেহাবশেষ ফিরিয়ে আনতে প্রিন্স জয়েনভ্যালির সাথে যারা গিয়েছিল সেখানে, তারা দেখে ২০ বছর পরও সম্রাটের শরীরে তেমন পচন ধরেনি! এ কথা কে না জানে, আর্সেনিক হলো সেই প্রিজারভেটিভ যা দিয়ে বছরের পর বছর সংরক্ষণ করা যায় মৃতদেহ। সেই থেকে ফরাসিদের সাথে ইংরেজদের নতুন রেষারেষির শুরু। আমার অতি জাতীয়তাবাদী ফ্রেঞ্চ বন্ধু বলেছিল– ইংরেজরা কখনোই ভালো হলো না।

আমি ওকে বলেছিলাম– তোমরা দুই জাতিই আমার কাছে এক রকম। কেউই কম যায় না। সাম্রাজ্যবাদী এবং একই মানসিকতার। ফরাসিরা কলোনি করেছে আফ্রিকায়, ইংরেজরা এশিয়ায়। ভারতীয় উপমহাদেশ তো তোমরাই ভাগবাটোয়ারা করেছিলে বিনা রক্তপাতে। রাজত্ব করতে, নাম দিয়েছিলে– ভার্সাই চুক্তি। এমনকি এখনও অস্ত্র বিক্রিতে সেরা ফ্রান্স, জার্মানী তথা ইউরোপ।

আমার বন্ধু আলেসান্দ্রা বলে– কিন্তু ওই সময় কেউ না কেউ জিতেই নিত ওই ভূখণ্ড। ওই সময়ে ঠেকানোর ক্ষমতা তো ছিল না ভারতবর্ষের হাতে।

আহা, সম্রাটদের কথা শুনলেই আমার মাথার মধ্যে নিজের অজান্তেই তুলনা চলে আসে লেখক আর শিল্পীদের সাথে। এই তো সেদিন, ল্যুভ মিউজিয়ামের চত্বর থেকে বাম দিকে ফিরলেই যে দেলাক্রয়ার বাড়ি– মেজো দেলাক্রয়া, সেখানে গিয়েছিলাম ফ্রেঞ্চ ক্লাসের সঙ্গীদের সাথে। দেলাক্রয়া সম্ভবত সবচেয়ে জনপ্রিয় শিল্পী ফ্রান্সের ইতিহাসে, ফরাসি বিপ্লব নিয়ে তাঁর বিশাল ক্যানভাসে আঁকা 'লিবার্টি লিডিং দ্য পিপল' এর তুলনা নেই। আচ্ছা, বোনাপার্ট কি ওঁর চেয়ে বেশি জনপ্রিয়?

আমার ফ্রেঞ্চ শিক্ষক বলেছিলেন– শিল্পের দুনিয়ায় তুলনা দেওয়া চলে না কাউকেই কারোর সাথে। কিন্তু দেলাক্রয়া এমন একজন যাকে শ্রেষ্ঠদের তালিকায় ফেললে অন্যায় হবে না। তাঁর তুলনা সম্রাটদের সাথে কেন?

ল্যুভর মিউজিয়ামে দাঁড়িয়ে এমন তুলনার ভ্রম হয়েছিল আরেকজনের কাজ দেখে, থিওডোর গ্যারিকোল্ট। গ্যারিকোল্টের আঁকা প্রমাণ সাইজের

এক ছবি আছে ল্যুভরের এক দেওয়াল জুড়ে, ছবির নাম– র‍্যাফট অফ মেডুসা। এই ছবি আঁকা হয়েছে এক জাহাজডুবিকে কেন্দ্র করে। সেই জাহাজের লোকেরা একে অন্যকে খেয়ে ফেলতে বাধ্য হয়েছিল খাবার না পেয়ে। খুবই হৃদয়বিদারক দৃশ্য। কিন্তু এই হৃদয়বিদারক দৃশ্যকে এমন দারুণ করে কেউ আঁকতে পারেন তা বিশ্বাস হতোনা ওই ছবিকে দেখলে। আমার ব্যক্তিগত এই তালিকায় অবশ্য আরেকজনও ঠাঁই পাবেন, তিনি গুস্তাভ কুরবে। ফ্রেঞ্চ মাস্টার গুস্তাভ কুরবের আঁকা পেইন্টারের স্টুডিও, আমার দেখা সবচেয়ে দারুণ পেইন্টিংগুলোর একটা। আরেকটা আছে, সেটা হলো এক গ্রামের এক লোকের দাফনের দৃশ্য নিয়ে আঁকা– বেরিয়াল এট অরনান্স। সেই ছবিতে দেখা যায় অরনান্স নামের এক গ্রামের অধিবাসীরা একজনের দাফনের সময় উপস্থিত হয়েছে। যার দাফন নিয়ে এই ছবি সে কুরবের চাচা। আর এই গ্রাম বিখ্যাত হয়েছে এই কারণেই যে সেখানে কুরবে জন্মেছেন!

কিন্তু এই ছবি নিয়ে ওসময় খুব এক তোলপাড় হয়েছিল। রোমান্টিসিজমের যুগ চলছে তখন। বেশিরভাগ চিত্রসমালোচকরা ব্যঙ্গ করেছিল এই ছবি নিয়ে। বলেছিল– সাধারণ গ্রামবাসী নিয়ে ছবি আঁকার কী হলো? সমালোচকদের ধারণা ছিল– দেবী, ভার্জিন মেরি, দেবশিশু কিংবা সুন্দরী কাউন্টেস, ডাচেসদের ছাড়া ওই চাষাভুষোর ছবি কে দেখবে?

কুরবে তাতে একটুও দমলেন না, বরং ক্ষেপে গিয়ে তিনি দম্ভের সাথে বললেন– অরন্যান্স গ্রামে দাফনের ছবি হলো রোমান্টিসিজম পিরিয়ডের দাফন! এরপর কুরবের হাত ধরেই ফ্রান্সে যে যুগের সূচনা হলো তার নাম– রিয়ালিজম বা বাস্তব চিত্রকলা!

আহা, একজন লেখক কিংবা শিল্পী ছাড়া একটা যুগকে টিকিয়ে রাখতে পারেন আর কে-ই বা এমন করে? সম্রাটরা পারে?

ওরহান পামুকও কি সাধে আমার প্রিয়? যে বছর তিনি নোবেল প্রাইজ পেলেন তার আগের বছর পড়েছি ওর লেখা। কি অপূর্ব সেই লেখা! ইস্তাম্বুলের রাস্তাঘাট, হাজিয়া সোফিয়া কিংবা ভূমধ্যসাগর কী এত প্রিয় হয়ে উঠত তিনি ছাড়া? পামুক হতে চেয়েছিলেন একজন চিত্রশিল্পী। ফলে চিত্রকলা নিয়ে তার জ্ঞানের মূর্ছনা প্রতিধ্বনিত হয় উপন্যাসের পৃষ্ঠায়, তার লেখা 'আমার নাম লাল' আমার কী সাধে এত প্রিয়?

পামুকের দারুণ দিক হলো তিনি প্রতিবাদীও। নোবেল প্রাইজ পাওয়ার আগেই একবার বলেছিলেন– দেড়শো বছর হয়ে গেছে, তবুও তুরস্কের ক্ষমা চাওয়া উচিত আর্মেনিয়ার গণহত্যার জন্য। অটোম্যানরা চলে গেছে তাতে

কী, প্রতিটি ভাবমূর্তি রক্ষাকারী দেশের মতোই গায়ে লেগেছিল তুরস্ক সরকারের এবং পামুককে দাঁড়াতে হয়েছিল আদালতে। হায়রে বাক্‌স্বাধীনতা!

সে যা-ই হোক, নির্দিষ্ট সময়ের পনেরো মিনিট আগে দেখি প্যান্থিওন চত্বরে লাইন হয়ে গেছে। ওরহান পামুকের গুণমুগ্ধ যারা রেজিস্ট্রেশন করেছিল তারা সবাই সেই লাইনে দাঁড়িয়েছে। এই লাইনে থেকেই পরিচয় হলো পামুকের আরেক পাগলা ভক্তের সাথে। তার নাম ফেদেরিক। ফেদেরিককে নিজের পরিচয় দিলাম, খোশগল্প করলাম বেশ কিছুক্ষণ। গল্প করতে করতেই লাইন ধরে এগিয়ে যতক্ষণে প্যান্থিওনে ঢুকলাম, ততক্ষণে খানিকটা চিনে গিয়েছি ওকে। জেনে গিয়েছি ও একজন ভিডিওগ্রাফার এদেশের এক টিভি চ্যানেলের। পামুকের প্রেমে পড়ে সে বহুদিন কাটিয়েছে তুরস্কে, ভূমধ্যসাগরের আলো–বাতাসে মাখামাখি হয়েছে, হেঁটেছে সান্তিয়াগো দে কাম্পাস্তলা নামের তীর্থযাত্রীদের রাস্তায়। জানাল সেখানে এক জিগরি দোস্তও আছে তার। আমি জানালাম আমার পাশের বাসায় থাকা তুরস্কের বন্ধু দিদেমের কথা। দিদেম ছিল অভিনেত্রী, পাকেচক্রে এখন পুরদস্তুর গবেষক ও শিল্পী।

কথায় কথায় জানলাম– ফেদেরিকের মা'র বাড়ি আর্জেন্টিনা। আর্জেন্টিনার নাম শুনেই আমার মনে পড়ে গেল ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর মুখ, আমাদের রবিঠাকুরের সেই বান্ধবী যাকে আদর করে রবি ডাকতেন– বিজয়া! আর্জেন্টিনা মানে আমার কাছে কথাসাহিত্যিক হোর্হে লুই বর্হেসের মুখ, সেকথাও বললাম ফেদেরিককে।

দ্বিতীয়বার প্রবেশের পর সন্ধ্যার ঘনায়মান আঁধারে আধো আলো–ছায়ায় প্যান্থিওনকে আরও রসহ্যময় লাগল এবং এর মধ্যেই মনে হলো– আরে, আমি কি ঠিক দেখছি!

আমার থেকে দেড় দুই হাত দূরে বিশাল কলামের পাশে সাদা চুলের যে ভদ্রলোককে দেখলাম, তিনিই ওরহান পামুক! তবুও গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম– আর ইউ ওরহান পামুক? সে মিটিমিটি হেসে বলল– ইয়েস আই অ্যাম!

সেই কৈশোর থেকে যার প্রেমে আমি বিমোহিত, তিনি এত সাধারণভাবে এক লম্বা কলামের পাশে একা একা দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন এটা ঠিক হজম হচ্ছে না তখনও, এরচেয়ে বাংলাদেশের ছোটখাটো চিত্র পরিচালকের আশেপাশে বেশি ভিড় থাকে বোধ হয়।

পশ্চিমের এই ব্যাপারটাই মজার, অনেক বড় স্টার, বিশ্বজুড়ে লাখ লাখ মানুষ চেনে কিন্তু রাস্তায় খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে হেঁটে যাচ্ছে এমন বেশ কয়েকবার দেখেছি। ভেস্টিভ্যাল ডু লিভ্রে বা আমার যাওয়া প্যারিসের প্রথম

লিটারেচার ফেস্টিভ্যাল ওরফে সাহিত্য উৎসবে গিয়ে দেখেছি আগের বছর পুলিতজার পাওয়া লেখককে ঘিরে ব্যাপক ভিড়, কিন্তু পাশে সরকারের কোনো মন্ত্রী দাঁড়িয়েও পাত্তা পাচ্ছেন না! এ কথা কি বাংলাদেশে ভাবা যায়? আমি তো দেখেছি দেশের বইমেলায় মন্ত্রীরা আসায় উলটো লেখকরাই তার সামনে গিয়ে হাত কচলাচ্ছেন!

আমি গিয়ে আন্তরিকভাবে নিজের পরিচয় দিলাম, জানালাম তিনি আমার কাগজে সাইন করেছিলেন পেন ইন্টারন্যাশনালের প্রেসিডেন্ট হিসেবে, আমি তখন মামলার কারণে নিয়মিত আদালতে দাঁড়াচ্ছি। এরপর প্যারিসের মেয়রের পক্ষ থেকে আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন– তুমি এখানে নিরাপদ বোধ করছ?

আমি বললাম– হ্যাঁ, প্যারিস আমার কাছে নতুন আশ্রয়। ফেদেরিক দেখি মন দিয়ে আমার কথা শুনছে। তাকে অনুরোধ করলাম– আমাদের ছবি তুলে দাও প্লিজ! সে আন্তরিক ভঙ্গিতে আমাকে ছবি তুলে দিল পামুকের সাথে। পামুক নিজেও সেলফি তুললেন আমার সাথে।

এর মধ্যেই সময় হয়ে গেল পামুকের বক্তব্যের।

তিনি মঞ্চে উঠলেন। দেখি কী চমৎকারভাবেই না তিনি বলছেন বাক্‌স্বাধীনতা নিয়ে, সারা দুনিয়ার মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে! সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল যখন আগামী বইয়ের কথা বললেন তিনি, বহুবার উচ্চারণ করলেন– ভিভে লা লিবাখতে! চট পড়ে মনে পড়ে গেল নীনার কথা। আমার জার্মান বান্ধবী নীনা, যে কি না খুব কম সময়েই আপন হয়ে উঠেছিল আমার। আমরা দুজনে গিয়েছিলাম ট্যাটু করতে, চামড়ার ওপর খোদাই করে লিখেছিলাম– ভিভে লা লিবার্তে ডি এক্সপ্রেশন, বাংলায়– বাক্‌স্বাধীনতার জয় হোক! সেই আরাধ্য বাক্‌স্বাধীনতার কথা শুনে কার না ভালো লাগে!

মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনলাম।

পামুকের সামনে বসে বসেই এক পাতায় লিখলাম এই অপূর্ব অনুভূতির কথা! মনে হলো কৈশোরের প্রেমিক প্রেম নিবেদন করছে আর আমি সেই প্রেম নিবেদনের ঘটনা লিখছি মুহূর্তটা একটু পরেই অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার ভয়ে!

একপ্রকার ছেলেমানুষি পাগলামি হলো কি? হোক না!

ফেরার পথে ফেদেরিকের সাথে বসলাম মুজে ক্লুনি নামের মধ্যযুগীয় জিনিসপত্রে ঠাঁসা জাদুঘরের কাছাকাছি এক কাফেতে, তাকে এতক্ষণ

জানাইনি দেশে কী ভয়াবহ সময় পার করে এসেছি আমি। সে মন দিয়ে শুনল, সহানুভূতি জানাল। কিছুদূর হেঁটে আমরা একে অপরকে আলিঙ্গন করে বিদায় নিলাম, কথা দিলাম– একদিন আবার দেখা হবে!

মেট্রোতে ফিরতে ফিরতে দেখি একজন মেট্রোর ভেতর নেচে নেচে গান গাইছে আর হাত পাতছে হ্যাট উলটো করে। যারা গান শুনে খুশি তারা হাসিমুখে কয়েন ফেলছে সেই হ্যাটের ভেতর।

স্টেশন থেকে বেরোতেই মাথার ওপর পাতা খসল বেশ কিছু। সেইসব পাতার ওড়াউড়ি ছেড়ে রিসেপশন পেরিয়ে বাড়ির করিডরে এসে দাঁড়াতেই দেখি ক্রোয়েশিয়ার মিষ্টি মেয়ে নিভেস যাকে আমি আদর করে ডাকি– দারুচিনি! আমাকে দেখেই সে বলল– ডিনার করেছ? না করলে এক্ষুনি চলে এসো আমার স্টুডিওতে! আমি ব্যাগপত্র রেখে আসার প্রতিশ্রুতি দিলাম।

ঝটপট ব্যাগপাতি রেখে তার বাসায় গিয়ে দেখি এলাহি কারবার! ইতালীয় আর তিউনিশিয়ান খাবারের সাথে ফ্রেঞ্চ রুটি বাগেত মিলে এক উদ্ভট ডিশ দাঁড়িয়েছে! আমাদের দেশে ডিম ভেঙে যে ডিমের সালুন রাঁধে, তিউনিশিয়ায় তেমনই এক খাবার শাকশুকা। এই খাবার রেঁধেছে আমাদের তিউনিশিয়ার মাজদ আর প্যালেস্টাইনের ক্রিস্টিন, দুজনের মুখে তখন গোলাপি প্রেমের আভা। ক্রিস্টিনকে আমি খুব পছন্দ করি একারণেই যে ওর মাঝে প্যাঁচ বলে কিছু নেই। সে হলো আমার মতোই এক ঘাড়ত্যাড়া লোক যে স্কুলে পড়ার সময় ভার্জিন মেরির ভার্জিনিটি নিয়ে হাসাহাসি করে এসেছে অতি খ্রিস্টানদের পিত্তি জ্বালিয়ে।

অবশ্য মোটামুটি আমাদের সবারই মিল হলো আমাদের একেকজনের কাছে ধর্ম এক রূপকথার বাক্স। সেই রূপকথা নিয়ে হাসতে হাসতে পাস্তার সাথে ডিম আর সবজি দিয়ে রান্না করা তিউনিশিয়ার শাকশুকা আর ফরাসি বাগেত দিয়ে পেটপুরে খেতে খেতেই খোলা হলো চমৎকার স্বাদের বোর্দোর ওয়াইন, উম উম শব্দ করে খাওয়া পাস্তা আর ওয়াইনের স্বাদ ছড়িয়ে পড়ল ঘরময়। মনে হলো এক চমৎকার কবিতার মতো দিনের সমাপ্তি অনুষ্ঠান চলছে!

ইতোমধ্যেই কাউচে অর্ধেক গা এলিয়ে নিভেস ঘোষণা দিল– প্রীতি আজ ওর ক্রাশের সাথে দেখা করে এসেছে!

হইহই করে উঠল ক্রিস্টিন আর জোনাস– সে কী, কার সাথে!

আমি লাল হওয়া কিশোরীর মুখ নিয়ে বললাম– ওরহান পামুকের সাথে!

–এজন্যই প্রীতির মুখে এমন আলো!

আমি এইসব ছাপিয়ে জিজ্ঞেস করলাম— কিন্তু তোমরা কি জানো আজ একটা বিশেষ দিন?

_কীসের জন্য?

_আজকে আন্তর্জাতিক বই দিবস, আর...

_আর কী?

_আজকে ইন্টারন্যাশনাল ভ্যাজাইনা এপ্রিসিয়েশন ডে!

সবাই হো-হো করে উঠল আর নিভেস আফসোস করল— রাত বারোটা বাজতে আর চার মিনিট বাকি। আজও আমার ভ্যাজাইনাকে উৎসাহ দেওয়ার লোক খুঁজে পেলাম না! আমি বললাম— তোমার হাতকে বলো উৎসাহ দিতে!

ফিনল্যান্ডের তুষারের মতো দেখতে ফিনিশ জোনাস হেসে উঠে বলল— এইসব উদ্ভট দিবসের খবর তোমাকে কে দিয়েছে হে?

ক্রিস্টিন মুখের কথা কেড়ে নিয়ে দুষ্টুমির গলায় বলে উঠল— আমি জানি কে ওকে এই খবর দিয়েছে!

–কে?

–কেন! প্রীতির প্রিয় লেখক— ওরহান পামুক!

দেশের বাইরে দেশ

প্যারিসে আসার পর প্রথমবারের মতো ইউরোপের অন্য যে দেশে পা রাখলাম সেই দেশটির নাম পোল্যান্ড। আমার কাছে পোল্যান্ড মানে মেরি কুরির জন্ম, যার জন্ম থেকেই বিজ্ঞানের ইতিহাসে জন্ম নিয়েছিল আরেকটি মৌল যার নাম– পলোনিয়াম। কিংবা পোল্যান্ড শুনলেই চোখে যা ভাসে তা হলো এটি– লেস ওয়ালেসার দেশ, পোলিশরা উচ্চারণ করে– লেখ ওয়ালেসা। আজ তিনি জীবন্ত কিংবদন্তি।

এই কিংবদন্তি হওয়া লেস ওয়ালেসাকে দেখতে পেলাম পোল্যান্ডে আসার কারণেই, আইকর্নের জেনারেল এসেম্বলি নামের বিশাল জমায়েতের মধ্যে তিনি ভাষণ দিলেন, বললেন তাঁর সংগ্রামের কথা। বললেন কেন সমাজতন্ত্রকে গ্রহণ করতে পারেননি তারা তাদের মতো করে। সে এক অদ্ভুত উপাখ্যান। যদিও আমি ভাবি– শুধু সমাজতন্ত্রই কেন, যেকোনো তন্ত্রই কি মানুষের হতে পেরেছে পুরোপুরি? গণতন্ত্রের কথা বলা জাতিগুলোর মধ্যেই কি গণতন্ত্রের লেশ আছে? নাকি শেষ পর্যন্ত সেই 'রাজা–রানি, খাতাম কাহানি'ই মূল কথা?

শার্লি হেবডোর কথাই ধরা যাক। ফ্রান্সের রম্য ম্যাগাজিন শার্লি হেবডোর ওপর হামলার ঘটনা নাড়িয়ে দিয়েছে পুরো ইউরোপকে। প্যারিসে এই পত্রিকা অফিসে এই দিয়ে তিনবার হামলা হয়েছে। প্রত্যেকবারই সেই একই অভিযোগ– ধর্মানুভূতিতে আঘাত, কার্টুন ছাপা। এমনকি আজও বাক্‌স্বাধীনতার কথা যখনই আসে, তখনই ধর্মানুভূতি দেওয়াল তুলে দাঁড়ায়। কিন্তু এই যে ধর্মানুভূতি, এর থেকে মুক্তি কোথায়?

আমি তো নিজেও ছিলাম ধর্মানুভূতির ভীতিতে। দেশে থাকতে কখনো হাঁটতে পারিনি রাতের বেলা, সর্বক্ষণই ভয় কখন এসে কেউ যদি ঝাঁপিয়ে

পড়ে ঘাড়ে! যেমন করে প্রকাশ্যে খুন হয়েছিলেন অভিজিৎ রায়, নীলয় নীল, ওয়াশিকুর রহমান বাবু, অনন্ত বিজয় দাস কিংবা সমকামিতাকে ঘেন্না করার সমাজ আর রাষ্ট্রে 'রূপবান' পত্রিকার সম্পাদক– জুলহাস মান্নান।

সেই ভয় পাওয়া ভীতু আমিই একদিন দেখি প্যারিসের মেট্রোর মধ্যে চমকে উঠেছি বোরখা পরা এক মেয়েকে দেখে। ইসলামোফোবিয়া নামের যে গুঞ্জন সে তো ভুল নয়। একজন নিরীহ ইসলাম মানা লোককেও নইলে আমার ভয় লাগবে কেন?

অবশ্য পরক্ষণেই ভাবি– ভয় পাবই বা না কেন? এই পোশাক পরে কি কম অপরাধ হয়েছে? কে বোরখার মধ্যে একটা চকচকে ছোরা নিয়ে অপেক্ষা করছে আমার জন্য কেমন করে জানব?

জীবনের প্রথম উপন্যাস বের হওয়ার পর যখন আনন্দে একবার বইমেলা থেকে বের হচ্ছিলাম তখই তো দেখেছিলাম আমার স্টল থেকে তিন হাত দূরে যে কিশোরকে আটক করেছিল পুলিশ, সে সাদা পাঞ্জাবির তলায় ব্যান্ডেজ করে নিয়ে এসেছিল চকচকে কিছু চাপাতি! এখনও যদি দুঃস্বপ্ন দেখি তখন আমি দেখতে পাই সে দৃশ্য!

আজও সেই আতঙ্কের রঙ জীবন্ত।

তবে পার্থক্য একটাই– আজ যখন দেশের দিকে তাকাই মনে হয় ওই দেশ আমার কখনো ছিল না। যখন রুহশানের সাথে পরিচয় হয়েছিল তখন জেনেছিলাম– একজন নারীও আমাকে পুরুষের মতো ভালোবাসতে পারে! আমার সেই সাধ্য ছিল না, আমার পুরুষ শরীর ছাড়া অন্য আকর্ষণ নেই, তাতে কী! তাই বলে কি রুহশানের সেই প্রেম ফেলতে পারি?

আমি জেনেছিলাম সমকামিতার খুঁটিনাটি। জেনেছিলাম– একজন পুরুষও একজন পুরুষকে, একজন নারীও অপর নারীকে বংশবৃদ্ধির তোয়াক্কা না করে ভালোবাসতে পারে, তাকে নিয়ে জীবন কাটানোর স্বপ্ন দেখতে পারে!

আমি যে সমাজে জন্মেছিলাম সেই সমাজে নারী–পুরুষ প্রেম হলেও ধনী–গরিব, ফরসা, কালো, পরিবারের স্ট্যাটাসের তুলাদন্ড দিয়ে যেখানে প্রেম ভালোবাসার হাতে পায়ে শেকল পরানো হয়, সেখানে সমলিঙ্গের মানুষের ভালোবাসা কে বুঝবে?

আমি বুঝেছিলাম, ক্লাস সিক্সে উঠে যখন জেনেছিলাম, আমার স্কুলের হোস্টেলে আমাদের দুই বান্ধবীকে 'আপত্তিকর অবস্থায়' পাওয়া গেছে! কেমন আপত্তিকর?

–খুব আপত্তিকর! ওদের গায়ে কাপড় ছিল না!

অবশ্য, কখনোই জানা হয়নি এই আপত্তি আর অনাপত্তির পাহারাদার কারা! শুধু দেখেছিলাম– তনুকে হত্যা করা হয়েছিল বাংলাদেশের ক্যান্টনমেন্টের মধ্যে। ছিন্নভিন্ন যোনিতে থাকা মেয়েটাকে রেপ করার প্রমাণ কখনো মেলেনি, কিন্তু সারা শরীরে তার ছিল ধর্ষণের আলামত। এতে কেউ আপত্তি জানায়নি!

কল্পনা চাকমা নামের যে আদিবাসী নারী নেতা ছিলেন তাকেত খুঁজেই পাওয়া যায়নি! এমনকি আজও তাঁকে নিয়ে শব্দ উচ্চারণ করতে ভয় পায় অনেকেই। এই মেয়েরা একেকটা সংখ্যা, কিন্তু এদের মৃত্যু অমীমাংসিত ছোটগল্পের মতো। দেশে থাকতে এমনই এক আশঙ্কাই কী করতেন না আমার মা?

আজ যখন প্যারিসের লাইব্রেরিগুলোর ডিরেক্টররা আমাকে দাওয়াত দেন তখন সেই জীবনকে দুঃস্বপ্ন বলে ভ্রম হয় আমার। সেই জীবনের অস্তিত্ব কেবল টের পাই তখন যখন অস্ত্র হাতে প্যারিসের রাস্তায় কোনো পুলিশ সদস্যকে দেখি। অস্ত্রের ভীতিকর কুৎসিত চেহারা আমাকে প্রচ্ছন্ন হুমকি দিতে থাকে যেন! সম্ভবত প্যারিসের আর্মি মিউজিয়ামে গিয়ে নাজি বাহিনীর পতাকা আর যুদ্ধে মারা যাওয়া সৈনিকের গুলিবিদ্ধ ক্ষতবিক্ষত পোশাক দেখে সে-কারণেই আমার মন হাহাকার করছিল– জীবনের কী নিদারুণ অপচয়...

বলে রাখা ভালো– প্যারিসে আসার পর প্রথম দাওয়াতটি আমি পাই ইমানুয়েল আজিজির কাছ থেকে। জেনেছিলাম এই শহরের প্রায় সবগুলো লাইব্রেরিই নাকি উনি চালান। আমি গিয়ে ইসাবেলের সাথে তার হাত থেকে চা খেয়ে আসি দ্বিতীয় সপ্তাহেই। নিজেকে খুবই অকিঞ্চিৎকর লাগে।

প্যারিসে আসার পর প্রথম দুই সপ্তাহ যখন মোবাইল ফোনের সিমকার্ড ছিল না তখন আমার রেসিডেন্সির ওয়াইফাই ইন্টারনেটই ভরসা। আমি অন্ধের যষ্টির মতো আগে থেকেই ম্যাপ বের করে ইন্টারনেট থেকেই ছবি তুলে রাখি। নিজেকে মনে হয় আধুনিককালের ভাস্ক দ্য গামা। এমনও হয়েছে বাড়ির আশেপাশের খুব কাছের রাস্তায়ই হারিয়ে গিয়ে ঘুরপাক খাচ্ছি, কিন্তু বাড়িঘর খুঁজে পাচ্ছি না!

যেহেতু এসেছিলাম শীতকালে, সেহেতু শীত তাড়াতে জোরে জোরে রাস্তায় হাঁটি। শিশিরের চেয়ে একশোগুণ ছোট বিন্দুর মতো ঝিরিঝিরি বৃষ্টি দেখি। দেশে থাকতে বর্ষাকাল নিয়ে যত রোমান্টিক কবিতা পড়েছিলাম তার বেশিরভাগই এই স্বল্প বৃষ্টিতে ধুয়েমুছে যায়! গাল ফাটা, হাতের চামড়া ফাটা আর খুশকিতে আক্রান্ত মাথার ত্বক চাপা পড়ে থাকে মোটা কাপড়ের তলায়।

পথেঘাটে শুয়ে থাকা গরিব লোকদের দেখে কষ্ট পাই। অনেকেই অনেকবার বলেছে এদের বেশিরভাগই নাকি সরকারের ভাতা পেতে এমন দুস্থ জীবন কাটায়। কিন্তু আমার বিশ্বাস হতে চায় না। কে অমন ঠান্ডায় স্বেচ্ছায় শুয়ে থাকে ফুটপাতে কিংবা নদীর একপাশে করা ভ্রাম্যমাণ তাঁবুতে?

এখানে যত লাইব্রেরি, ফ্রেঞ্চ ভাষায় সেগুলোকে বলে– বিবলিওটেক। একবার ইসাবেলের সাথে গেলাম বিবলিওটেক মার্গারেট ডিহতে, জানলাম মার্গারেট ডিহ ফ্রান্সের নারীবাদী আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা। তিনি নিজে এক পত্রিকা বের করতেন, সেই পত্রিকার সব কাজ করত মেয়েরাই। সেসময় মেয়েরা ভোট দিতে পারত না, মেয়েদের অ্যাবরশন করার অধিকার ছিল না। বাংলাদেশে আজও মেয়েদের অ্যাবরশন করার অধিকার নেই, ফলে আমার কাছে মার্গারেট ডিহ কল্পিত চরিত্র নন। মূর্তিমান বর্তমান! আমার নিজেরই মনে আছে এক মেয়ে জানিয়েছিল প্রেমিকের কাছ থেকে প্রেগন্যান্ট হয়ে যাওয়ার পর তাকে অ্যবরশন করিয়ে এনেছিল সেই প্রেমিকের মা। অথচ মেয়েটা চেয়েছিল বাচ্চাটা বাঁচুক!

সবচেয়ে করুণ যে ঘটনা মনে পড়ে সেটা ছিল আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে। এক মেয়ে প্রেগন্যান্ট হয়েছিল, বোরখা পরত বলে পেট লুকিয়ে রাখাও সহজ হয়েছিল। সন্তান জন্মানোর পরে সেই সন্তানকে সে বিবাহ বহির্ভূত সন্তান বলে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিল কাপড় রাখার ট্রাংকের মধ্যে। কিন্তু যখন শিশুটিকে সে বের করার চেষ্টা করেছিল তখন সে দেখেছিল বাচ্চাটা ওই দমবন্ধ ট্রাংকের মধ্যে মরে গেছে! অথচ ও কোন পরিস্থিতিতে বাচ্চার মা হতে বাধ্য হয়েছে?

মেয়েটাকে ঘিরে কত জঘন্য কথাবার্তা চলছিল চারদিকে। কিন্তু মেয়েটার শূন্য চোখে মৃত সন্তান হাতে ছবিটা দেখে কী ভয়াবহ অসহায়ই না আমার লেগেছিল!

মনে হলো– আহা, ফ্রান্সের মেয়েরা কত ভাগ্যবান, ওদের একজন মার্গারেট ডিহ ছিল!

প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি– বিবলিওটেক মার্গারেট ডিহ মূলত একটা স্পেশালাইজড লাইব্রেরি। এখানে এত পুরাতন সব কাগজ আছে যে সেগুলো সাধারণ লোকের স্পর্শের বাইরে। যারা গবেষণা করছে তাদের গবেষণার নিমিত্তে কদাচিৎ এই লাইব্রেরির মাটির নিচের ব্যাঙ্কের ভল্টের মতো দেখতে প্রকোষ্ঠে ঢোকার অনুমতি মেলে! অথচ লাইব্রেরির ডিরেক্টর আমাকে মহা ধুমধামের সাথে সেই প্রকোষ্ঠে নিয়ে গেলেন। দেখলাম দুশো বছর আগের

নারীবাদী আন্দোলনের সময়কার ব্যানার, হাতে আঁকা পোস্টার থেকে শুরু করে আরও কতকিছু! এমনকি ভোটের দাবিতে এই দেশের মেয়েরা জরিপ করেছে, সেইসব কাগজের একটি বা দুটি কপি আছে এদের কাছে। এরা কী পরম যত্নেই না রেখেছে! সেইসব কাগজ হাতে নিয়ে দেখে শিহরন জাগে শরীরে! কথায় কথায় লাইব্রেরির ডিরেক্টরের আন্তরিকতায় আমি খুলে বলি আমার মায়ের কথা, গ্রাম থেকে শহরে আসা আর ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার জন্য তার একার সংগ্রামের কথা। লাইব্রেরির ডিরেক্টর নারীটি আমার হাত ছুঁয়ে বলেন– তিনি ছিলেন বলেই তুমি আজ ফ্রান্সে, আমাদের কাছে। আমরাও তোমাকে দেখে আশা পাই!

এরপর গেলাম আরেক বিশাল লাইব্রেরি, বিবলিওটেক মিডিয়াটেক ক্যানপিতে। মিডিয়াটেক কেন? কারণ এদের কাছে কেবল বই-ই নেই, আছে আরও নানারকম অডিও-ভিডিও মাধ্যম। এরা সেমিনার আয়োজন করে, তরুণদের নিয়ে সেশান করে, বাচ্চাদের খেলনা দেওয়ার ছলে বই পড়ায়, বইয়ের রিভিউ লেখার প্রতিযোগিতা করে, গাছ লাগানো, বীজতলা তৈরি করা, দুনিয়াকে সবুজ রাখা, লাইব্রেরির টয়লেটে মেয়েদের জন্য পিরিয়ড চলাকালীন স্যানিটারি প্যাড ডোনেট থেকে শুরু করে হেন কাজ নেই, যা তারা করে না! এই লাইব্রেরির ডিরেক্টর সোফি লাইব্রেরি ঘুরিয়ে আমাকে এক কাপ কফি হাতে দিয়ে বলেছিল– তুমি কি জানো তোমার আঁকা ছবিগুলোর বিশেষত্ব কী?

–কী?

ও আমাকে অবাক করে দিয়ে বলেছিল– তুমি মেয়েদের বিষণ্ন সব মুখ এঁকেছ সব আনন্দের রঙে!

আমি নিজেই চমকে উঠলাম– সত্যিই তো! আমি এসিড ভিক্টিমের ঝলসে যাওয়া, রেপ ভিক্টিমের বিষণ্ন মন মরে যাওয়ার অবয়ব, মুখ আর শরীরের ছবি এঁকেছি দুনিয়ার সমস্ত উজ্জ্বল রঙে! লাল নীল সবুজ হলুদের সব উজ্জ্বল বর্ণে বিবর্ণতাও হয়ে গেছে বর্ণময়!

একবার গিয়েছিলাম বিবলিওটেক ডেলা ফর্নিতে। ভাবলে হাসি পায় পুরাতন ওই বিল্ডিংকে আগে কতবার ভেবেছিলাম গির্জা! সবচেয়ে বেশিবার গিয়েছিলাম আমার বাসার পাশের লাইব্রেরি আর্থার রিবুতে। ক্যাঁচক্যাচ করে ওঠা কাঠের মেঝেতে পা টিপে টিপে অল্প কিছু ইংরেজি বইয়ের সারি থেকে পছন্দের বইটা বুকে জড়িয়ে ধরে সামনের চত্বরের ভেতরের কাঠের বেঞ্চিতে বসে নিজেকে বড় অদ্ভুত লাগত প্রথম প্রথম। মনে হতো, বিদেশের এই

জীবনটি আমার দ্বিতীয় জন্ম। সেই জন্মের সবচেয়ে দুঃখজনক স্মৃতি একটাই– বাংলাদেশকে ভুলতে না পারা!

যা-ই হোক, পোল্যান্ডের গাদানস্ক শহরে গিয়েছিলাম আইকর্নের কনফারেন্সে। যাওয়ার পথে ওরশো শহরে বিমান বদলাতে গিয়ে দেখি বিকট শব্দে যুদ্ধবিমান যাচ্ছে। আমার সাথে থাকা আমার কোঅর্ডিনেটর ম্যাগুলন দেখেই বলল– এই বিমান সম্ভবত আসছে কিয়েভ থেকে। ইউক্রেনের কিয়েভ। যেখানে যুদ্ধ লেগেছে রাশিয়ার সাথে। পোল্যান্ড ইউক্রেনকে সাহায্য করছে, সে–কারণেই এই যুদ্ধবিমানের আনাগোনা।

যুদ্ধবিমান দেখে তাই দীর্ঘশ্বাস ফেললাম।

আবার সেই যাত্রায় ফেরার পথে গেলাম নরওয়েতে।

নরওয়ে মানে আমার কাছে ন্যুট হামশুনের দেশ। বাংলাভাষার জনপ্রিয় লেখক হুমায়ূন আহমেদ যে লেখকদের দ্বারা মহা অনুপ্রাণিত তাঁদের একজন হলেন ন্যুট হামশুন। হুমায়ূন আহমেদের লেখা অতি জনপ্রিয় চরিত্র 'হিমু' মূলত হামশুনের 'ভ্যানাবন্ড' উপন্যাসেরই সফল বাংলা রূপান্তর, সেকথা বলেছেন অনেকেই।

অবশ্য ন্যুট হামশুনকে নিয়ে নরওয়েতে বিরাট বিতর্ক আছে। তিনি একদা নাজিদের কর্মকাণ্ডকে সমর্থন করেছিলেন বলে। এমন আছে এজরা পাউন্ডকে নিয়েও, এমনকি জার্মানিতে আমার প্রিয় গুন্টার গ্রাসকে নিয়েও।

কিন্তু সেকথা থাক। নরওয়েতে গিয়ে অসলো বিমানবন্দরে নেমেছিলাম মধ্যরাতে। সেই কনকনে ঠান্ডার মধ্যরাতে আমাকে উদ্ধার করেছিলেন মৃণাল দা এবং তার বউ। উনাদের চিনতাম না আগে। কিন্তু অসলোয় নামব শুনে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন রতন দা, তিনিও থাকেন নরওয়েরই আরেক শহর– বার্গেনে। নরওয়েতে গিয়ে কী দেখলাম বলার চেয়ে বলা উচিত কী দেখলাম না!

সকাল হতেই বিশাল সব পাহাড়, গিরিখাদ, ঝরনা মুগ্ধের মতো ক্ষুধার্থ চোখে গিললাম। জার্মানি থেকে ঠিক একই সময়ে তাহসিব ভাই আর জয়াদির বাসায় ছুটি কাটাতে এসেছিলেন অর্নব দা, অতি উৎফুল্ল আড্ডাবাজ মানুষ। অসলোয় প্রবাদপ্রতিম নরওয়েজিয়ান শিল্পী এডভার্ড মুংকের নামে যে বিশাল 'মুংক মিউজিয়াম' আছে, সেটি ঘুরলাম তার সাথেই। একজন শিল্পী যে একটা জাতির শিল্পের সমস্ত সত্তাকে আলোকিত করতে পারেন তা মুংকের কাজ না দেখলে বিশ্বাস হতে চায় না! তার সবচেয়ে বিখ্যাত ছবি সম্ভবত– দ্য স্ক্রিম, বাংলায় চিৎকার।

এ যেন নরওয়ের মোনালিসা!

প্যারিসের ল্যুভরে মনালিসার চারপাশে, মুংকের 'চিৎকার' নামের ছবির চারদিকেও সেই একই ভিড় লেগে থাকে সর্বক্ষণ। ছবির বিষয় হলো এক ভূতুড়ে বেঁকে যাওয়া রাস্তাঘাটের বেঁকে যাওয়া মুখের মধ্যে থেকে গোল গোল হয়ে যাওয়া চোখ–মুখ আর নাকের ফুটোসমেত এক টাকমাথা ভূত চিৎকার করছে কান চেপে ধরে। মজার ব্যাপার হলো– এই ছবি দেখলে মনে হয় আসলেই ক্যানভাসের সেই ভূতের মতো চেহারার লোকটি চেঁচাচ্ছে!

অসলো থেকে বো তেলেমার্ক শহরে যাওয়ার পথে দেখলাম ঝলমলে সবুজ মাইলের পর মাইল জমি, পেছনে পাইন সহ যাবতীয় গাছের সারি। বো শহর থেকে নরওয়েরই ডল'স হাউস খ্যাত আরেক জগদ্বিখ্যাত নাট্যকার হেনরিক ইবসেনের শহর খুবই কাছে, কিন্তু গেলাম না ওখানে। বরং মুগ্ধ হয়ে শাড়ি পরলাম ওই ঠান্ডার রাজ্যে কয়েকটা বাঙালিয়ানায় ভরা ছবির লোভে ।

এরই মাঝে ঘটনাচক্রে দেখা পেলাম এক আফ্রিকান কিশোরী মেয়ের। এক নরওয়েজিয়ান দম্পতি দত্তক নিয়েছেন ওকে। চঞ্চল এই কিশোরীকে দেখে বোঝার উপায় নেই ওর মাকে বাবাটি জীবন্ত কুপিয়ে মেরে ফেলেছে। বাবাকে ধরে নিয়ে গেছে জেলে। মেয়ের ঠাঁই হয়েছিল এক ফসটার হোমে, সেখান থেকে দত্তক নেওয়া বাবা–মায়ের কাছে।

এই বাবা–মা'ও যারপরনাই চেষ্টা করছে শৈশবের সেই স্মৃতি ভালোবাসা দিয়ে বাচ্চার মন থেকে মুছে দিতে। কিন্তু সেই দুঃসহ স্মৃতি কি সহজে ভোলা যায়?

জয়াদিদি মানে তাহসিব ভাইয়ের বউ ব্যাখ্যা করেছিল নরওয়ের সবুজ চোখ ধাঁধানো, কারণ এই সবুজটা ক্ষণস্থায়ী। এটা বেরোয় কেবল গরমকালে। বাকি সময় ঢাকা থাকে বরফের চাদরের নিচে। যেহেতু গরমকালে গিয়েছি তাই বো শহর থেকে চিরবৃষ্টির শহর বার্গেন যেতে যেতে ভাবছিলাম– জীবনও তো এই সবুজের মতোই। দূরের এক নিঃসঙ্গ কুটির আর সেখান থেকে ফিয়র্ডের জলরাশির পাশে রাখা নিস্তরঙ্গ জলে ছোট্ট মাছ ধরার নৌকাও উসকে দিয়েছিল সেই ভাবনা। দেখে মনে হয়েছিল– জীবন কি এমনই নিঃসঙ্গ বিষণ্ন সুন্দর না?

ক্ষণস্থায়ী বলেই তো!

এমনটা লেগেছিল ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনের রাস্তায় একা একা হাঁটতে গিয়ে। কোপেনহেগেনের জনমানবহীন শহরতলির চেয়ে শতগুণ জনসমাগম আছে প্যারিসে। গরমকালেও ঠান্ডা বাতাস হুল ফোটায় শরীরে। ওভারকোট ছাড়া এই ঠান্ডায় বের হওয়া আত্মহত্যার সমান।

অথচ ডেনমার্ক মানে আমার কাছে হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান এন্ডারসনের দেশ। তাঁর লেখা কুৎসিত হাঁসের ছানা আমাকে নাড়া দিয়েছিল সেই শিশুকালেই। সেই ডেনমার্কেই আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম মূলত নিজের আগামী বই থেকে খানিকটা অংশ পড়ে শোনাতে হবে– এমন এক ইভেন্টে। যেহেতু বক্তব্য দেওয়ার সম্মানীর সাথে থাকা, যাতায়াতের ভাড়াও আয়োজকরা দেবে তাই 'না' করার সুযোগই নেই।

প্রথমদিন ডেনমার্কে থাকলাম আয়োজকদেরই একজন স্যালির বাবা–মায়ের বাড়িতে। স্যালির বাবা কাজ করেন অক্সফাম নামের সংস্থায়। মুহূর্তেই মনে পড়ে যায়– বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধে অক্সফামের একটা বিরাট অবদান আছে। অক্সফাম নামের এই সংস্থাটি পৃথিবীর সেই সময়কার প্রভাবশালী ষাটজন মানুষের একটা সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন যুদ্ধে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতে আশ্রয় নেওয়া শরণার্থীদের ব্যাপারে বিশ্বের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে। সেই ষাটজোন মানুষের মধ্যে মাদার তেরেসা থেকে শুরু করে বিশ্ববিখ্যাত সব সাংবাদিকরা সমর্থন জানিয়েছিলেন শরণার্থীদের জন্য যেন ফান্ড সংগ্রহ করা হয়। সেই সুবাদেই হয়েছিল কন্সার্ট ফর বাংলাদেশ নামে বিটলস নামের তুমুল জনপ্রিয় ব্যান্ডের শো।

সেসব কথা আর আমার লেখালেখি, সরকারের মামলা নিয়ে অনেক কথা হলো। স্যালির মা'ও খুবই বন্ধু মানুষ। আমাকে দারুণ সব ক্রেন্ডারের চা খাইয়ে নিজেদের বাড়ির অতিথিখানার কাঠের ঘরটিতে থাকতে দিলেন।

কাঠের ছোট্ট ঘর!

এমন ঘরের কথা পড়েছিলাম সেই ছোটবেলায়, লরা ইঙ্গলস ওয়াইল্ডারের শতাব্দীপ্রাচীন আত্মজৈবনিক বই 'লিটল হাউস অন্য দ্য প্রেইরি' পড়ার সময়। আমেরিকার সেই বিস্তীর্ণ প্রান্তরে মাথা গোঁজার ঠাঁই খুঁজে পাওয়ার সংগ্রাম আমাকে খুব নাড়া দিয়েছিল। তেমনই এই কাঠের মিষ্টি গন্ধের ঘরে রাত্রিযাপনকে স্বপ্ন বলে মনে হয়। তবে সেই স্বপ্ন ছুটে যায় বাথরুমে যাওয়ার প্রয়োজন হলেই। ঠান্ডায় জমতে জমতে বাথরুমে গিয়ে জলের কল খুলে অপেক্ষা করতে হয় পানিকে কিছুক্ষণ গরম হতে দেওয়ার। শীতপ্রধান দেশ বলে এখন সবখানেই সব বাথরুম থেকে শুরু করে রান্নাঘরেই গরম পানির ব্যবস্থা আছে। কিন্তু আগেকার দিনে, কয়েকশো বছর আগে মানুষ কেমন করে মধ্যরাতে বাথরুম পেলে জীবন কাটাত তা ভাবলে ভয় করে!

সে যা-ই হোক, সবসময় ইলশেগুঁড়ির চেয়েও গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি ঝরা প্রকৃতিতেও সকাল ভোরে পরদিন তৈরি হয়ে গেলাম স্যালির তাগাদায়। তার

মা আমাকে বাসে তুলে দিয়ে এলেন। সেই বাসে করে কোপেনহেগেনের সিটি সেন্টারে গিয়ে দেখা হলো সাংবাদিক ক্যাথরিনের সাথে। ক্যাথরিন জানাল সে মূলত ডেনিশ ইনস্টিটিউট ফর হিউম্যান রাইটসের হয়ে কাজ করে। সে চায় আমার একটা সাক্ষাৎকার নিতে।

আমি তাঁকে প্রস্তাব দিলাম– আমার আগামী বই থেকে কয়েকটা লাইন পড়ে শোনাই?

সেসব লাইন শোনার পর যেন ম্যাজিকের মতো কাজ হলো!

ক্যাথরিন বলল– প্রীতি, তোমাকে আর সাক্ষাৎকার দিতে হবে না। কারণ তোমার লেখাই তোমার সংগ্রামের সমস্ত সাক্ষ্য দিচ্ছে। আমি ছলছল চোখে কৃতজ্ঞতা ভরে সাক্ষাৎকার দিলাম। সে জড়িয়ে ধরে বিদায় দিল আমাকে।

আমাকে বিশাল এক জিপগাড়িতে করে নিয়ে ডেনমার্কের আরেক শহর অরহুসের দিকে যাত্রা শুরু হলো স্যালি, এলেক্স আর সোনার। বলে রাখা ভালো, এলেক্স হলো বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া এক তরুণ আর সোনা আফগান বংশোদ্ভূত এক ডেনিশ। এদের সাথেই চললাম নতুন শহরের দিকে। ডেনমার্কের অনেকগুলো দ্বীপের মতো অরহুসও একটি দ্বীপ শহর।

এই দ্বীপের দিকে চলতে চলতে কেন যেন ছেলেমানুষের মতো নিজেকে রবিনসন ক্রুসো মনে হলো। পথের মাঝে মাঝে ইলশেগুঁড়ির মতো বৃষ্টি আর রোদের লুকোচুরি দেখতে দেখতে একরের পর একর জমি, সেই জমিতে গরুর পাল দেখতে দেখতে মনে হয় ওয়েস্টার্ন ছবির বুনো পশ্চিমে চলে এসেছি! এখন শুধু কাউবয় হ্যাট আর দোলনা বন্দুক হাতে নিয়ে নায়ক বা খলনায়কের আগমনের বাকি!

অরহুসে যাওয়ার পথের সবচেয়ে দর্শনীয় বস্তু হলো ফেরিতে করে যাতায়াত। ফেরি তো নয়, যেন এক জাহাজ। সেই বিশাল জলযানের পেটের মধ্যে হাজার হাজার গাড়ি আঁটে!

শুধু গাড়ি আঁটাই না, ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে জলরাশির ফেনা কিংবা দূরে মেঘের ওপর লাল রোদ মিলেমিশে এক অদ্ভুত কাব্যময় সন্ধ্যা নেমে আসে। বাতাসে জলের ঘ্রাণ আর আকাশে সূর্যের আলোয় বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি করতে থাকা মেঘের ভেলায় চড়ে সন্ধ্যা আসে। আমরা আবারও ফেরি থামার সময় ফেরির পেটের মধ্যে থাকা গাড়িতে নেমে আসি। যাত্রা শুরু হয় অরহুসের পথে।

পরদিন অরহুস শহরের ইনস্টিটিউট এক্সে অসংখ্য ভিনদেশী মানুষের মধ্যে পড়ে শোনাই এই বইয়েরই মালিকানা নামের অধ্যায় আর ভূমিকাটুকু।

তুমুল করতালি আমার চোখে পানি এনে দেয়। পাকিস্তানি মেয়ে রিমশা এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে। পরিচিত হই টেক্সাসের হানার সাথে, এমনকি বাঙালি একজন যার নাম কি না অর্ক, সে এসে চমকে দেয় আমাকে বাংলায় কথা বলে। জানতে পারি, বাংলাদেশের নয়, সে এসেছে দার্জিলিং থেকে। ওরা সবাই আমাকে বলে– এই বইটার জন্য অপেক্ষা করবে ওরা!

পথের মধ্যে এমন বন্ধুত্বের দেখা মিলবে কে–ই বা ভেবেছিল?

আমি ভাবিনি। কিন্তু প্রকৃতির প্রতি কৃতজ্ঞ হতে কসুর করি না আমি। পেটের মধ্যে বাদ্য বাজে ভাতের ক্ষুধায়। পাকিস্তানের রিমশা তাতে কাঠখড় জোগায়। সে বলে– চলো চলো!

কয়েক মাইলের মাঝেই সাউথ ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট আছে! আমরা দল বেঁধে হইহই করতে করতে যাই। মাঝে দেখি এক জায়গায় একগাদা দারুচিনি গুঁড়ো। এত দারুচিনি গুঁড়ো কেন?

কারণ পঁচিশের পরেও যারা সিঙ্গেল তাদের ওদেশে দারুচিনি দিয়ে গোসল করানোর রেওয়াজ আছে! এ আবার কেমন অদ্ভুত রীতি! এ দেখি বিয়ে দেওয়ার চাপ?

এ দেখে কথায় কথায় এই মেয়েটি আর আমি দুজনেই গুষ্টি উদ্ধার করি আমাদের উপমহাদেশের সমস্ত পুরুষের। তবে দুজনেই হাসতে হাসতে একমত হই এই পর্যন্ত যত দেশের মেয়েদের সাথে দেখা হয়েছে ওরা সবাই বলেছে– ওদেশ বাদে অন্য দেশের ছেলেদের সাথে বন্ধুত্ব আর প্রেম করতে। ব্যাপারটা তাহলে কী দাঁড়াল?

আমেরিকার হান্না বলে ওঠে– ব্যাপারটা দাঁড়াল এই যে, খুব কম ছেলেই মেয়েদের কেবল মানুষ হিসেবে গণ্য করে। এমনকি এই ঘোরতর পশ্চিমেও!

দোসা, বিরিয়ানি, নানারকম উপমহাদেশীয় খাদ্য খাওয়া শেষে আমরা গোলাপ জামুন নামের মিষ্টি গালে পুরে গান গাইতে গাইতে আমার হোটেলে ফেরার রাস্তা ধরি বহু গল্প শেষে। শেষবারের মতো জড়িয়ে ধরি ওদের, কথা দেই– আবার একদিন দেখা হবে আমাদের। মনের মধ্যে তখন দেশি মশলার ঘ্রাণ, আকাশের দিকে চেয়ে দেখি এই ঠান্ডার দেশের মৃদুমন্দ বাতাসে আকাশে দুলছে হাজার বছরের প্রাচীনতম চাঁদটি।

নিজেকে মুহূর্তের জন্য প্রজাপতি মনে হয়। চাঁদের আলোয় স্বপ্নের মতো জোছনায় নিজের হাতের ওপর জোছনা মেখে নাম ভুলে যাওয়া ফ্রেঞ্চ কবির কবিতার মতো নিজেকে বলি– আমার আঙুলের বন্দিত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ছটফটে সেই প্রজাপতি আমাকে দিয়ে গেল সুগন্ধের মুক্তিপণ!

অবশ্যই– বিনে পয়সায়।
কারণ পৃথিবীর অন্যতম সুখগুলো বিনিময়যোগ্য নয়।

অবশ্যই– বিনে পয়সায়।
কারণ পৃথিবীর অন্যতম সুখগুলো বিনিময়যোগ্য নয়।

অল কোয়ায়েট অন্য দ্য ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট!

তুমি কিন্তু দেখতে রিফিউজিদের মতো নও!

এক পার্টিতে বলেছিল এক জার্মান নারী।

তখন সবে এসেছি, মুখের জড়তা কাটেনি। ধবধবে সাদা আর সোনালি চুলের জাতের গর্বে গরবিনি সেই নারীকে জিজ্ঞেস করা হয়নি– রিফিউজিরা দেখতে কেমন? তাড়া খাওয়া আর বিপর্যস্ত?

জানি না। তবে হাসি পায়। দুঃখের হাসি। সেই হাসিও দেখাই না। এই হাসি একান্তই আমার।

মনে পড়ে এমন আরেকবার হয়েছিল। কোভিডের সমস্ত রেস্ট্রিকশন উঠে যাওয়ার পরেও একজন সবার সাথে সৌজন্যের করমর্দন করলেও আমাকে হাত বাড়িয়ে দেয়নি কারণ তার আগেই জেনেছে বাংলাদেশ থেকে তাড়া খেয়ে আসা এক মেয়ে ও, তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্রতম দেশ। দরিদ্র হওয়ার কারণেই হয়তো আভিজাত্য খসে পড়ছিল ওই হীনম্মন্য মেয়েটির। এত ঠুনকো সেই আভিজাত্য যা হাত মেলালেই চলে যায়!

মন খারাপ করা এসব অভিজ্ঞতার কথা মাথা থেকে দূর করতে গেলেই বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের কথা মনে পড়ে, মনে পড়ে তানি আপুর কথা। সে ছিল আমার রুমমেট। বাম রাজনীতি করত। সিগারেট খেত, মাঝেমধ্যে গাঁজা খেয়ে পড়ে থাকত। বাড়ির লোকদের সাথেও তেমন কথা বলত না। এদিকে সিগারেটের ধোঁয়ায় আমার দমবন্ধ হয়ে আসত। সে নিয়ে কত ঝগড়াও হয়েছে আমাদের। কিন্তু যেদিন উনি মাস্টার্স পরীক্ষা শেষে চলে গেলেন, সেদিন আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদলেন। আমি ভুলে গেলাম অতীতে হওয়া সব ঝগড়া, সব দুঃখের কথা।

কেবল মনে রইল যখন তার শাড়ি আমি গায়ে জড়িয়েছি, যখন তিনি আমার কাছ থেকে গালে পাউডার দেওয়া শুরু করেছিলেন সেসব স্মৃতি।

সিজোফ্রেনিয়া নামের কঠিন অসুখের সাথে রীতিমতো যুদ্ধই করেছিলেন তিনি। মুঠো মুঠো ওষুধ খেতেন। এমনও হয়েছে যে আতঙ্কে ঘরের ছিটকিনি আটকাইনি। সব চাকু বা ধারালো কাঁচি, কাঁটাচামচ বালিশের তলায় রেখে ঘুমিয়েছি। কোথায় যেন পড়েছিলাম, সিজোফ্রেনিয়ার রোগীরা হ্যালুসিনেশানের সম্মুখীন হয়। তখন কাউকে খুন করে ফেলে টের পায় না! ফলে বিছানার পাশের আলো জ্বালিয়ে রেখেছি। সেই তিনিই যখন হল ছেড়ে চলে গেলেন, তখন কী যে খারাপ লাগল!

সাহিত্যের ছাত্রী ছিলেন বলে কত তুমুল আড্ডা দিয়েছি, ফুঁকো আর দেরিদার দর্শন কপচেছি– সে তো ভোলার নয়। যেহেতু দুজনেই নাস্তিক, ফলে কত উপহাস করেছি ধর্ম নিয়ে! সেসব কি একদিনে ভুলে যাওয়া যায়?

বাংলাদেশ তো আমার কাছে তানি আপুর মতোই। যার সাথে অভিমান করা যায়। অভিযোগ করা যায়। কিন্তু তাকে ভুলে থাকা যায় না।

কিন্তু সেই বাংলাদেশের ভবিষ্যতের কথা দেশ থেকে এত মাইল দূরে বসে ভাবতে গেলেও ভয় লাগে।

আমার মতো অবস্থা ছিল সম্ভবত নেলসন ম্যান্ডেলার। টানা চব্বিশ বছর কারাগারে থেকেছেন নেলসন ম্যান্ডেলা। কিন্তু তিনি বলেছিলেন– নো ওয়ান ইজ ফ্রি আন্টিল প্যালেস্টাইন ইজ ফ্রি। নিজের দেশে নিজে কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে তিনি এই কথা বলেছিলেন। কেন বলেছিলেন তা তখন ঠাহর করতে পারিনি সহসাই। কারণ বিশ্ব যারা চালাচ্ছে তারা মূলত নতুন দিনের একনায়ক। রাশিয়ার কিম জং উ, ভারতের নরেন্দ্র মোদী, বাংলাদেশের ক্ষমতার কাণ্ডারিরা, বেলারুশের লুকাশ্যাংকো কেউই কারোর চেয়ে কম যান না। সদ্য ইতালিতে তারই ফলশ্রুতিতে উঠে বসেছেন জর্জিও মেলোনি। ডানপন্থি আরেক উগ্রবাদী। নারী বলে ডানপন্থি হয়েও নারীবাদের পতাকা উড়াচ্ছেন ডিক্টেটরশিপের তলায়। অথচ যেকোনো ডিক্টেটরই যে ক্ষমতাতন্ত্রের বাই প্রডাক্ট তাইই বা বলবে কে? কে বলবে, নারী হলেও তারা কতটা পিতৃতান্ত্রিক?

আজও যুদ্ধ শেষ হয়নি প্যালেস্টাইনে। যুদ্ধ চলছে সিরিয়ায়, ইয়েমেনে, কাশ্মীরে, সর্বশেষ যুদ্ধক্ষেত্র ইউক্রেইন। একেকখানে একেক রঙের যুদ্ধ। কোথাও ধর্মের নামে, কোথাও ভূখণ্ডের নামে, কোথাও জাতিগত বিদ্বেষের নামে। এমনকি আমি এই যে বইটা লিখছি, এটা কি যুদ্ধ নয়?

আমার তো কথা ছিল দেশে থাকতে পারার। আমার কথা ছিল দেশে বসে যত প্রতিবাদ করি সেসব নিয়ে সোচ্চার হওয়ার। কিন্তু আমি চলে আসতে বাধ্য হয়েছি। কারণ আমি জানি যেকোনো সময় আমার যেকোনো লেখাই কাল হয়ে দাঁড়াতে পারে আমার বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে! আমি কাউকে খুন করিনি, কখনো একটি পিঁপড়াকেও সজ্ঞানে মারিনি, কখনো যেচে পড়ে ক্ষতি করিনি কারও। কিন্তু আমি কী পেলাম?

পেলাম একগাদা অপমান আর ভয়। এ কি আমার প্রাপ্য ছিল?

আমার এক প্রিয় লেখক লিখেছিলেন– ভালো কাজ করলে সুখী তুমি নাও হতে পারো, খারাপ কাজ করলে অসুখী তুমি হবেই! আমি মাঝে মাঝে নিজেকে জিজ্ঞেস করি– আমি কি সুখী হয়েছি?

–না, আমি সুখী হইনি। বরং হয়তো আমার নামে যে লোকটি মামলা করেছিল সে-ই সুখে আছে! তাকে দেশ ছাড়তে হয়নি, পরিবার ছাড়তে হয়নি, রাতের আঁধারে পালিয়ে বেড়াতে হয়নি শুধুমাত্র লেখার জন্য! লেখাটির সমস্ত কথা যদি মিথ্যা হতো, তাহলে হয়তো নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়া যেত– মিথ্যা লেখায় এই শাস্তি পাচ্ছি আমি। কিন্তু সেই সান্ত্বনা নিজেকে দিই কেমন করে আমি?

আমার প্রিয় লেখকদের প্রত্যেকেই অবশ্য দেশ হারিয়েছেন নানান কায়দায়। সাদাত হাসান মান্টোর বুকের ওপর দিয়ে ছুরির ফলার মতো এফোঁড়–ওফোঁড় করে চলে গেছে ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের নির্মম পরিহাস। অশ্লীলতার দায়ে দাঁড়াতে হয়েছে আদালতে। বলতে হয়েছে– যদি আমার লেখা অশ্লীল আর অসহনীয় বলে মনে হয় তাহলে এই সময়টাই অসহনীয়! মান্টো মরেছেন। মরে বিখ্যাত হয়েছেন। কিন্তু যে দেশে তার কবর সেই দেশে কবরের ফলকের ওপর তার শেষ ইচ্ছানুযায়ী একটা ফলক জোটেনি! কারণ মান্টো চেয়েছিলেন তার কবরের ওপর লেখা হোক– এখানে শুয়ে আছেন সাদাত হাসান মান্টো, গল্প লেখার সব কৌশল আর উপকরণ সঙ্গে নিয়ে। আকাশের দিকে তাকিয়ে তিনি ভাবছেন, কে সবচেয়ে বড় গল্পকার? খোদা না মান্টো?

মান্টোর শেষ ইচ্ছা পূরণ হয়নি, কারণ খোদার কথা বলায় খোদা নামের কেউ হামলা না চালালেও খোদাভক্ত নামের উগ্রবাদীরা হামলা চালাবে। ভেঙে দেবে মান্টোর কবর। বলবে– মান্টো ধর্ম অবমাননা করেছেন!

ধর্মের অবমাননা করতে আসলে বেশি কিছু লাগে না। কেবল একটা মন্দিরে গরু আর মসজিদে শুয়োর কাটলেই ধর্ম তার রূপ দেখায়!

সে যাকগে। আমার আরেক প্রিয় লেখক ছিলেন এরিক মারিয়া রেমার্ক। খুব ছোটবেলায়ই আমি তার লেখা 'অল কোয়ায়েট অন্য দ্য ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট', 'থ্রি কমরেডস', 'দ্য রোডব্যাক'সহ অন্যান্য বইগুলো পড়ি। বইগুলো পড়ে প্রবল নাড়া খাওয়া আমি একদিন জানতে পারি, আমার এই প্রিয় লেখক যখন তার 'দ্য রোডব্যাক' উপন্যাসটি লেখেন তখন নাজি পার্টি দেশের সব বইয়ের দোকান ও লাইব্রেরি থেকে তার বইটা নিষিদ্ধ করে, তাকে নৈরাজ্যবাদী চিহ্নিত করে আদালত থেকে তার নামে হুলিয়া জারি করে তার নাগরিকত্বও বাতিল করে দেয়। প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে আগে সুইজারল্যান্ডে এবং পরে আমেরিকায় তিনি আশ্রয় নেন। প্রতিশোধ নেওয়ার তাগিদে হিটলারকে গালি দেওয়ার মিথ্যা অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়ে রেমার্কের বোন এলফ্রিদকে এবং তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হয়! রেমার্ক লেখালেখি থামাননি। আমেরিকা তাঁকে নাগরিকত্বও দেয়, কিন্তু আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী আচরণে বিরক্ত হয়ে রেমার্ক আবার ফিরে যান সুইজারল্যান্ডে এবং সেখানেই মারা যান।

এমন সব ভয়ংকর লেখকের কাছ থেকে যে প্রেরণা পেলাম, সেসব ভুলি কেমন করে?

আর তাই দেশ ছেড়ে আসার অনুভূতি কেমন সেটা কাউকে ব্যাখ্যা করে সময় নষ্ট করতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু যখন একা একা বসে থাকি কোথাও, তখন খুব অদ্ভুত একটা গল্প করতে ইচ্ছা করে। তেমন আহামরি কিছু নয় অবশ্য।

ইচ্ছে করে কাউকে বসিয়ে যেদিন শেষবারের মতো বাংলাদেশ ছেড়ে আসার আগে বাসে উঠলাম, সেই গল্পটি ধারাভাষ্যের মতো বর্ণনা করতে। যখন বাসে উঠেছিলাম তার কিছুক্ষণ আগে খেয়াল করলাম বাসার ডান পাশে মোড়ের ধারে একটা চায়ের টং দোকান হয়েছে। আমি অবাক হয়ে আমার মাকে বললাম– এই দোকানে আমি কখনো চা খাইনি!

দোকান তখন বন্ধ, আমার খালাতো ভাই তানজিম সান্ত্বনার বাণী দিল– এরা জঘন্য স্বাদের চা বানায়, এই চা খাসনি কারণ তোর কপাল ভালো!

এরইমধ্যে বাস চলে এলো। আমি বাসে উঠে জানালা দিয়ে দোকানটার দিকে তাকালাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাস চলতে লাগল আর দোকানটা সরতে লাগল। সরতে সরতে উধাও হয়ে গেল কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে।

খুবই সাধারণ এক ঘটনা। কিন্তু বাংলাদেশ থেকে আসার পর টানা দেড় দুই মাস ধরে স্বপ্ন দেখলাম– দোকানের সামনের বেঞ্চিতে বসে পা দুলিয়ে চা খাচ্ছি। বিশ্বাস করবে কি না কেউ জানি না, প্যারিসের ডিসেম্বর মাসের কড়া

হাড় কাঁপানো ঠান্ডায় পুরোটা সময় রাতের বেলা ঘুমের মধ্যে আমি সেই ছাইয়ের দোকানের ধোঁয়া ওঠা কেতলি দেখে আর চায়ের ঘ্রাণ পেয়ে কাটালাম!

দেশের জন্য এইসব আবেগ আমাকে মানায় না আমি জানি। আমি জানি ওই দেশের সবচেয়ে ত্যাগী মানুষদেরও ওই দেশ মনে রাখেনি। এমনকি দেশ ছেড়ে আসার আগে শেষ মৃত্যু দেখেছি আমার খালুর। অতি করুণ সেই মৃত্যু। ১৯৭১ সালে দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছিলেন তিনি। সাংবাদিকতা করেছেন। আমি দেখেছি সঠিক চিকিৎসার অভাবে তিনি চোখের সামনে মরলেন, এমনকি মৃত্যুর আগে মাটি পেলেন না ঠিক জায়গায়। তিনি চেয়েছিলেন সহযোদ্ধাদের সাথে শোবেন মৃত্যুর পরে। কিন্তু এককালে বাম দল করতেন বলেই ক্ষমতাসীন দলের এক চেয়ারম্যান বললেন— মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য নির্ধারিত কবরস্থানে জায়গা খালি নেই!

পরে জানলাম, জায়গা ছিল। কিন্তু তিনি ক্ষমতাসীনদের সমর্থন করতেন না বলেই এই সিদ্ধান্ত।

যিনি যুদ্ধ করলেন, তার কবরের জায়গা যদি না থাকে, আমার কি এত অভিমান থাকা উচিত সেই দেশের ওপর?

কিন্তু তবুও কেন যেন যতবারই দেশে ঘটতে থাকা যেকোনো অন্যায় অবিচার নিয়ে কথা বলি তখনই আমার মনে পড়ে ওই চায়ের দোকানের কথা! মনে হয়— পুরো দুনিয়ার সবকিছু একই জায়গায় থাকলেও ওই চায়ের দোকানটা আমার কাছ থেকে কেবলই সরছে আর বহুদূরে চলে যাচ্ছে!

মাঝেমধ্যে ঘুমের মধ্যে গুলির শব্দ শুনি। ঘুম ভেঙে যায় আর প্রচণ্ড মন খারাপ হয়ে যায়। যেদিন ঘুম ভাঙে না সেদিন দেখতে পাই একটা বিরাট যুদ্ধক্ষেত্র, সেখানে অসংখ্য মানুষের লাশ এদিক—সেদিক পড়ে আছে। অদ্ভুত কায়দায় আমি দেখতে পাই লাশগুলোর একটা আমার!

আমার সাইকিয়াট্রিস্ট ডায়ানা আমাকে অভয় দেয়, বলে— তুমি যখন খারাপ ঘটনাগুলোর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলে তখন বুঝতে পারোনি ঠিক কতটা খারাপের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলে। কিন্তু এখন তুমি জানো কী ভয়াবহ সময়ের মধ্যে দিয়েই না তুমি গিয়েছ! তাই এমন ভয়াবহ সব স্বপ্ন দেখো তুমি!

ডায়ানার অভয় শুনি, আমার নতুন জীবনের টানাপোড়েন নিয়ে কথা বলে আসি। কিন্তু মাঝরাতে আবারও আমি দেখতে পাই আমার শরীরে অসংখ্য জখম, কিন্তু সেইসব ছাপিয়ে আমার মুখ তো অক্ষত। সেই অক্ষত মুখে ক্ষতের মতো একটা ব্যঙ্গাত্মক হাসি লেগে আছে। কিছু ঘাস আর ঘাসফুল মৃদু বাতাসে দুলছে আর দূর থেকে শোনা যাচ্ছে— 'অল কোয়ায়েট অন দ্য ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট'।

টানাপোড়েন

একদিন দেখি— বাড়ির ঠিকানা আর কিছুতেই মনে করতে পারছি না! ঘটনাটা ঘটল আনিস ভাইয়ের সাথে দেখা হওয়ার পর। এ এক অদ্ভুত যোগাযোগ। ফেসবুকের সুবাদে আনিস ভাইয়ের শিক্ষক ফাহমিদুল হকের মাধ্যমেই আনিস ভাইয়ের সাথে আমার পরিচয়। আনিস ভাই পড়েছেন জার্নালিজমে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, এখন চাকরি করেন ওয়াশিংটনে। সেই তিনিই যখন প্যারিসে এসে পরিচিত হলেন, সেইনের পাড় ধরে হাঁটতে হাঁটতে গল্প করতে করতে জিজ্ঞেস করলেন— প্রীতি, রাজশাহীতে আপনার বাড়ি কোথায়? দেখি কিছুতেই মনে করতে পারছি না! কী মুশকিল হলো! যে শহরে বেড়ে উঠেছি আমি, স্কুল—কলেজ সব পড়েছি, সেই শহরেই আমি নিজের বাড়ির ঠিকানা মনে করতে পারছি না! এ তো স্মৃতির বেইমানি!

অনেক চেষ্টার পর বাড়ির ঠিকানা বোঝালাম শেষমেশ। সাহায্য করলেন আনিস ভাইয়ের সাথে আসা টিপু ভাই। এরা দুজন একই কনফারেন্সে এসেছেন। দুদিনের প্রথমদিন নতরদাম গির্জা, 'শেক্সপিয়র অ্যান্ড কোম্পানি' আর হোটেল দ্য ভিল ঘুরিয়ে, রাতে সেইনের পাড়ে হেঁটে, রাতের নদীতে দুলতে থাকা বাড়িঘরের ঝিরিঝিরি আলোয় মাখামাখি হয়ে এর পরদিন ক্যাফে দ্য ফ্লুরে নিয়ে গেলাম তাকে। বোঝালাম ক্যাফে দ্য ফ্লুর মানে ফুলের রেস্তোরাঁ। এই ক্যাফে এমন আহামরি কিছুই নয়, কেবল বিখ্যাত কারণ বিখ্যাতরা আসতেন এই রেস্তোরাঁয়, নিয়মিত আসতেন সিমন দ্য বুভয়া আর জা পল সাঁথরে। আড্ডা দিতেন জমায়েত করে বন্ধুদের সাথে ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

ছোটবেলায় স্কুলে থাকাকালীন আমার যেমন, ভূত উঠেছিল নিজেরা নিজেরা সংস্কৃতি ক্লাব করার। পাড়ার কয়জন মিলে আমরা এক সংগঠন

করেছিলাম, এর নাম ছিল— আলোর পায়রা। আলোর পায়রার যাবতীয় মিটিং বসত আমার পাড়াতো বোন সেবাদের বাসায়। ফলে সেবাদের বাড়ি ব্যয়ভার করার সুবাদে আলোর পায়রা নামের সংগঠন আয়োজিত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বেশিরভাগ পুরস্কারই জিতে নিত সেবা। তখনই বুঝেছিলাম, যেকোনো পুরস্কারই হলো একপ্রকার পক্ষপাতিত্ব।

সে যা-ই হোক, প্যারিসে এমন অনেক জায়গা আছে, যেসবে আমার প্রিয় বিখ্যাতরা যেতেন। বসে বসে আড্ডা দিতেন। যেমন হ্যারিস বার— এটা ছিল হেমিংওয়ের প্রিয় বার। সম্ভবত তখন সস্তায় মদ পাওয়া যেত বলেই। আর কে না জানে, হেমিংওয়ে ছিলেন সেই রক্তগরম যুবক যিনি যুদ্ধ করেছেন, লিখেছেন, মদ খেয়ে বিবাদে জড়িয়েছেন, রেকর্ড সংখ্যক চার বিয়ে করেছেন, জীবনের অ্যাডভেঞ্চার পুরোদমে শুষে নিয়েছেন এবং মরেছেন খুব ট্র্যাজিক উপায়ে। তার জন্ম থেকে মৃত্যু, নিজেই যেন এক উপন্যাস।

এমন চরিত্র অবশ্য বিশ্বসাহিত্যে বিরল নয়। যেমন র‍্যাবোর কবিতার কথা পড়েছিলাম সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখায়। র‍্যাবোর নাটকীয় জীবন আমাকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করত। মাত্র আঠারো বছর বয়সে ফরাসি এই তরুণটি কবিতা লেখা ছেড়ে দেয় এবং হুলুস্থুল ফেলে দেয় ফ্রান্সে।

র‍্যাবো যেমন কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়ে আফ্রিকা চলে গিয়েছিল, যাওয়ার আগে আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছিল সমস্ত লেখাপত্র আমারও তেমন করতে ইচ্ছা করে। মনে হয়— কী হবে লিখে?

জগতের কী এমন বদলেছি আমি শুধু একের পর এক নিজে বিপদে পড়া ছাড়া?

এসব মনে হওয়ার কয়দিন খুব হতাশাগ্রস্ত ছিলাম। আবার সেই হতাশা থেকে পরিত্রাণের উদ্যোগ নিজেকেই নিতে হয়েছিল। আশিকের সাথে পরামর্শ করে টিকিট কেটেছিলাম জার্মানির ব্ল্যাক ফরেস্টের। আশিক আমার বন্ধু এদেশে আসার পর থেকেই। সেও এক নাটকীয় পরিচয়। নরওয়েতে থাকাকালীন এক রাতে বেশি করে মদ খেয়ে একজনকে জড়িয়ে ধরে হুলুস্থুল চুমু খাওয়া এবং তারপর সংবিৎ ফেরার পরের অদ্ভুত মনস্তত্ত্ব আর হ্যান্ডব্যাগের কাছের লুকোচুরি আর তার পরবর্তী ঘটনা প্রবাহে ওর সাথে আমার পরিচয়।

ওকে খুলে বলেছিলাম সেই চুমুর ইতিহাস আর ও হেসে কুটিকুটি হয়েছিল এই জেনে যে শতভাগ বাউন্ডুলে এই আমাকে কুঁড়ে খেতে একটা চুমুই যথেষ্ট। আমার সঙ্গীটি যখন জেনেছিল, সেও হেসে গড়িয়ে পড়ে

বলেছিল– একটা চুমু খেয়েই এমন কুঁকড়ে যাচ্ছ, তোমাকে দিয়ে তো পরকীয়া হবে না হে!

সে যা-ই হোক, জার্মানি মানে আমার কাছে আলব্রেখট ড্যুরার, পল ক্লীর মাস্টারপিস, এরিক মারিয়া রেমার্কের থ্রি কমরেডস বইয়ের সেই তিন বন্ধু আর আমার প্রিয় সেই ছোট্ট এনা ফ্র্যাংকের দেশ, যার কাছ থেকে দেশ কেড়ে নেওয়া হয়েছিল কেবল সে ইহুদি বলে।

মার্কস, হেগেল, নিতসের মতো গ্রেট দার্শনিকরা জন্মেছেন এই ভূমিতে। সেই দেশ নিয়ে উন্মাদনা একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু তাতে খড়কুটো জোগান দিল আমার বন্ধু আশিক। সে সাথে করে নিয়ে গেল তার বাড়ি মাইন্জ নামের শহরতলি থেকে ফ্যাংকফুর্ট শহরে। ফ্রাংকফুর্টের বিখ্যাত স্টেডেল মিউজিয়ামে ঘুরলাম তার সাথে। এক ইন্ডিয়ান রেস্তোরাঁয় তৃপ্তির সাথে খেয়ে, এক বাক্স জিলাপি কিনে খাঁটি বাঙালি কায়দায় এক চক্কর ঘুরে এলাম তারই সাথে। কারণ পরদিন যাব দূরের ব্ল্যাক ফরেস্ট নামের সেই বিখ্যাত বনের মধ্যে থাকা ফ্রয়ডেনস্টাট শহরে।

ফয়ডেনস্টাট এক ছোট্ট শহর। এই শহরের নাম জার্মান থেকে বাংলা করলে দাঁড়ায়– আনন্দনগর। এই আনন্দনগরে ত্রিশ বছরেরও অধিক সময় ধরে বাস করা তাসলিমা খানম আপার সাথে পরিচয় আরও অদ্ভুতভাবে। এক বইয়ের সূত্র ধরে। বইয়ের নাম– 'অন্য দ্য নাইট অফ সেভেন্থ মুন'। ব্রিটিশ লেখক ভিক্টোরিয়া হল্টের লেখা এই উপন্যাস কিশোরবেলায় এমন আচ্ছন্ন করে রেখেছিল যে ভাবতাম, কবে আমার দেখা হবে ম্যাক্সিমিলিয়নের মতো এক স্বপ্ন পুরুষের? সেই বইয়ে ব্ল্যাক ফরেস্ট নামের এই পর্বতের গায়ে পাইন গাছের বিশাল বনের যে রসহ্যময়তার দেখা পেয়েছিলাম, তা ভুলি কী করে? আপা এই এলাকায় থাকেন জেনেই বলেছিলাম এই বই পড়তে, আর সেই থেকেই বন্ধুত্ব।

মজার ব্যাপার হলো খুঁজে পেতে দেখি আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত এসেছেন এই ছোট্ট শহরে।

ব্ল্যাক ফরেস্টের এই দিন কয়টা ছিল কবিতার এত। জার্মান ভাষায় 'অটাম' অর্থাৎ হেমন্তকে বলে– হার্বস্ট। হার্বস্ট শব্দটা আমি আগেই শুনেছি। এর কারণ আমার জার্মান এক বন্ধুর নাম– টিমো হার্বস্ট। তো, সেই হার্বস্টে গাছের পাতা দেখে মনে হয় গাছে গাছে হলুদ আর লালের আগুন লেগেছে! সে এক অদ্ভুত আগুন সৌন্দর্য!

আপার আন্তরিকতায় সেই আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল সর্বত্র। ছোট্ট শহরের প্রধান জায়গাগুলো ঘুরে বেড়ালাম, দেখলাম প্রাচীন গির্জা আর বইয়ের দোকান, ঠান্ডা বাতাসে কফি কাপ হাতে নিয়ে কৃতজ্ঞ হলাম। মার্কপ্লাতস নামের এক দোকানপাট সমেত চত্বরে পার্কিং করার জায়গায় গিয়ে এক হেলে পড়া পাইন গাছ দেখে জানলাম সে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এক নির্জন স্বাক্ষর। বোমার আঘাতেও সে বেঁচে গেছে! হয়ে গেছে কালের কাজল।

আপা ড্রাইভ করে নিজের গাড়িতে করে আঁকাবাঁকা পথ ধরে নিয়ে গেলেন লেক মুমেলসি নামের পাহাড়ের ওপরের এক লেকের পাশে। কাঠের ব্রিজ তার ওপর। এই পাহাড়ের ওপর যে একখানা আস্ত হ্রদ থাকতে পারে তাই ছিল আমার কাছে এক বিস্ময়। সেই বিস্ময়কে আরও বাড়িয়ে দেয় লেকের মধ্যের এক মৎস্যকন্যার ভাস্কর্য।

তাসলিমা আপার জীবন সংগ্রামের, কিন্তু সেই জীবন চুম্বকের মতো টানে আমাকে। কারণ কখনো তিনি মাথা নোয়াননি নিজের আত্মসম্মানের কাছে। স্বামীর পরকীয়া জেনে নির্ভেজাল এই মানুষটি ডিভোর্সের আবেদন করেছেন, দুই সন্তানকে মানুষ করেছেন নিজের উপার্জনে। তাদের বিশ্ববিদ্যালয় জীবন শেষ হয়েছে। এই বিদেশ বিভুঁইয়ে ভিন্ন ভাষার জনপদে বরফের রাস্তা মাড়িয়ে কাজে গেছেন, চাকরি করেছেন। কিন্তু কখনো আপস করেননি, বাংলা ছবির নায়িকাদের মতো, দশটা মেয়ের মতো 'স্বামীর ভুল হয়েছে' ভেবে মাফ করে এক খাটে শোননি। এই সংগ্রামের কথা কোথাও লেখা হবে না, কোনো যুদ্ধবাজ কুখ্যাত নেতার মতো চাউর হবে না, কিন্তু আমি জানব– আমি তার সাথে দেখা করেছিলাম, যিনি নিজেকে নিজের কাছে ছোট হতে দেননি!

তার কাছে গিয়ে আমার পাওয়ার শেষ নেই। আমি যেমন বিয়ে করেও আর্টিস্ট রেসিডেন্সিতে একার শিল্প জীবন কাটাই, তিনিও তেমনি কাটান এক চমৎকার মুক্ত পাখির জীবন। একাই থাকেন, বাজার করেন, ড্রাইভ করেন। মাঝেমধ্যে জার্মানিরই অন্য দুই শহরে থাকা মেয়ের আর ছেলের বাড়িতে বেড়াতে যান। নিজের জীবনকে আবিষ্কার করেন নতুন উদ্যমে। বাড়ি ভরা গাছ আর ছোট ছোট জমানো স্মৃতির এক পাহাড় আছে তার কাছে। কে কবে একটি শোপিস, দুটি স্যুভেনির এনেছিল, তা গুছিয়ে রেখেছেন পরম আলিঙ্গনে। তার ব্যক্তিগত স্মৃতির সেই তল্লাটে গিয়ে স্মৃতি বাড়িয়ে দেওয়ার লোভ সামলাতে পারিনি বলেই হয়তো তার বাড়ির জানালা দিয়েই দূরের পাহাড় দেখতে দেখতে হুট করে ইচ্ছে হয়েছিল তাকে একটা ছবি এঁকে দিয়ে যাই!

অবাক হয়ে গিয়েছিলাম যে এই অতি শৌখিন নারীর কাছে এমনকি বিভিন্ন মাপের ক্যানভাস, তুলি আর রঙ আছে। তিনি রান্না করলেন, আশিক আর আমার সাথে রাজ্যের গল্প করতে করতে আর এই ফাঁকে আমি মনের মাধুরী মিশিয়ে আঁকলাম এলোচুলের এক মেয়ের ছবি। তিনি কী যত্নের সাথেই না সেই ক্যাভনাসের রঙ শুকানোর পর ঝুলিয়ে দিলেন বসার ঘরে! আন্তরিকতার চূড়া স্পর্শ করার সেই আনন্দ নিয়ে অলৌকিক সাক্ষাতের বিদ্যুতস্পর্শের মতো মনে হলো— এ জীবন অকিঞ্চিৎকর নয়!

আবিষ্কার করেছিলাম বিখ্যাত জার্মান লেখক হারম্যান হেসের নামে রাস্তা আছে তার বাসার পেছনেই। 'সিদ্ধার্থ' নামের বইটা লিখে তুমুল জনপ্রিয় এই লেখক কি জানতেন একদিন তিনি একটা রাস্তা হয়ে উঠবেন? দুই পাশে দাঁড়িয়ে থাকা অক্টোবরের হলুদ, লাল রঙে উদ্ভাসিত হবে সেই রাস্তার দুই ধার? কিন্তু কীসের আশায় তিনি লিখেছেন?

সম্ভবত না লিখে থাকতে পারেননি।

আমি তো নিজেই ঘর ছেড়েছি। কিন্তু আজও লেখা ছাড়তে পারলাম না কেন?

জানি না। কেবল প্যালেস্টাইন ছেড়ে আসা ক্রিস্টিন বলেছিল— না লিখলে তুমি বাঁচবে না। যেমন বাদ্যযন্ত্র না বাজালে আমি মরব! ও বলেছিল পৃথিবীর সবাই কথা বলতে জানে, কিন্তু কিছু মানুষ জানে তাদের কথা বলাই কেবল কথা বলা না! কথা বলার আরও মাধ্যম আছে। সেই মাধ্যমকেই সবাই আদর করে ডাকে— শিল্প!

শিল্পের একটা অদ্ভুত গুণ আছে। আমরা মারা যাব, সে মরবে না!

আমি এসব তাত্ত্বিক কথা সইতে পারি না সবসময়। কেবল যখন মনে পড়ে কিছু অপ্রিয় কথা যেগুলো সমাজের বেশিরভাগ লোকই ধর্মের কিংবা জাতীয়তার দোহাই দিয়ে মানে না— সেগুলো বলার কারণে প্রকাশ্যে কুপিয়ে মারা হয়েছিল অভিজিৎ রায়কে, অনন্ত বিজয় দাসকে, ওয়াশিকুর বাবুকে...এমনকি জেলে থাকা অবস্থায় মরতে হয়েছিল মোশতাক আহমেদকে সেইসব কথা কাউকে না কাউকে বলতেই হবে! যা বলা মানা, যা বলায় বাধা, সেকথাই বলতে হবে। হিন্দুর দেশে বলতে হবে মুসলমানের অধিকারের কথা, মুসলমানের দেশে বলতে হবে হিন্দুর ঘর পোড়ানোর কথা আর যার ঘর নেই, তাকে দিতে হবে সমগ্র আকাশের মালিকানা!

আমার এক বন্ধু বলে— সত্য কথা আপেক্ষিক না, সত্য নাকি নারীর যোনির মতো। সেখান থেকে মানুষ জন্মায়। জন্মে ভুলে যায় সেই জন্মকথা। মদ যেমন ভুলে যায় কে মাতাল হয় তার নেশায়।

আমি বলি— জন্মের দাগও কিন্তু যোনিতে থাকে।

আমার বন্ধু কথা শোনে না। নিজেই নিজেকে উৎসাহ দেয়, বলে মদের গ্লাসের ইংরেজি ভি অক্ষরের এত রূপ নাকি যোনির রূপ থেকেই প্রাণ পেয়েছে! আমি বিড়বিড় করে বলি— জন্ম ও যোনির ইতিহাস!

—কী বললে?

না, কিছু না।

আমার বন্ধু চুরুট ধরায়। সে বলে— দুই শতাব্দীরও বেশি সময় আগে অশ্লীলতার দায়ে খোদ ফ্রান্সেই আমাদের প্রিয় কবি বোদলেয়ারকে কাঠগড়ায় উঠতে হয়েছিল। বিচারক তাকে জরিমানা করেছিলেন প্রায় তিনশো ফ্রাঁ। সম্পূর্ণ বইটা বাজেয়াপ্ত হলো না, বাজেয়াপ্ত হলো ওই বইয়ের ছয়টি কবিতা। আদালতের রায়ের পর ওই ছয়টি পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে বই বিক্রি হতে লাগল। এ কালের কিংবদন্তি আর ও কালের কপর্দকহীন কবি বোদলেয়ার দেখেন সেই ছিন্নভিন্ন বই বিক্রি হচ্ছে, তখনও প্রকাশকের সাথে ঝগড়া করতে তার সাহস হয় না পরের বইগুলো আর ছাপা না হওয়ার আশঙ্কায়। আজ ওই কবিতার বই ওই ছয় কবিতাসহ বেরোয়, 'শেক্সপিয়ার অ্যান্ড কোম্পানি'র বইয়ের তাকে রাখা থাকে— শয়তানের ফুল, ফ্রেঞ্চ ভাষায় 'লে ফ্লুর দু মাল'!

আমার সেই আবেগি কণ্ঠের সিরিয়ান কবি বন্ধু জানায়— গতকাল আরবি ভাষায় সে নিজের দেশ সিরিয়ার কথা ভেবে একটা কবিতা লিখেছে। এরপর উচ্চৈঃস্বরে পড়ে শোনায় আমার তোয়াক্কা না করে।

আজকাল হাজার হাজার ভিন্ন ভাষার কবিতার মতো আমি যারপরনাই কবিতার নাম ভুলে যাই। যথারীতি এটিও ভুলেছি। কিন্তু বেলা করে ঘুম থেকে উঠে মনে পড়ে যায় পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে কবিতা পড়ে শোনানোর পর মদের ঘোরে তার বাঁধভাঙা আবেগের ভেলায় হুহু স্বরে কান্নার আওয়াজ।

এই কান্না শেষে সংবিৎ ফেরার পর সে বলেছিল—বোদলেয়ারের কবিতার বই থেকে যে ছয়টি পাতা অশ্লীলতার দায়ে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছিল, আমরা মূলত সেই ছিঁড়ে ফেলা পাতাগুলোকে জোড়া লাগাতেই প্রতিদিন পাতার পর পাতা লিখি! মূল সংগ্রাম পুরো বইটি নয়!

এমনকি এই শতাব্দীতেও সেই পাতাগুলো লেখাই একজন লেখকের মূল কাজ।

আসছে লক্ষ বছরেও তা একই থাকবে!

....